উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয় সমূহের নবম শ্রেণীর জন্য
১৯৫৮ সনের HS/1/58 নং সার্কুলার পাঠ-ক্রম অনুসারে লিখিত

---

# বিজ্ঞান সরণি

## ( General Science )

### প্রথম খণ্ড

( নবম শ্রেণীর জন্য )


**শিবতোষ মুখোপাধ্যায়,** এম. এস-সি., পি-এইচ. ডি ( এডিন ),
এফ. আর. এম. এস.
প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা
ও
**অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়,** এম. এস. সি.
বাইও-ফিজিক্স ডিভিসন, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা



আসাম বুক ডিপো
২১, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মা ও বাবাকে

# সূচীপত্র

**মিশরের মন্দিরের ছাদে পুরোহিতদের আকাশগণনা**

বিজ্ঞানের সূচনা বহু অতীতে। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে মিশরের মন্দিরের ছাদে বসিয়া পুরোহিতরা আকাশ গণনা করিত। তাহার বেশীর ভাগই ছিল অলীক জল্পনা মাত্র। প্রকৃতিকে আবিষ্কার এমনি করিয়াই আরম্ভ হয়।

অ্যারিসট্যটল্ গ্রীক সভ্যতায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার একজন পুরোধা ছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহার জীবজগৎ সম্বন্ধে গবেষণার কিছু কিছু অংশ আজও সুপরিচিত।

**অ্যারিসট্যটল্**

নিঃসন্দেহে বলা চলে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা গ্যালিলিও। সূর্য নয়, পৃথিবীই আকাশে ভ্রাম্যমাণ একথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। চন্দ্রে যে পর্বত আছে তাহাও তিনি দেখেন। গতিশক্তি সম্বন্ধে তিনি মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেন।

**গ্যালিলিও গ্যালিলি**

গ্যালিলিওর উত্তরসাধক নিউটন। পৃথিবী সম্পর্কে যে জ্ঞান এতদিন বিক্ষিপ্ত ছিল তিনি তাহাকে সুসম্বদ্ধ করেন। তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর অবিনশ্বর। উত্তরকালের বহুজন তাঁহার গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন।

**আইজাক নিউটন**

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ক্যাভেন-ডিশের অবদান সুপরিচিত। তিনি পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ সম্পর্কে মূল্যবান আবিষ্কার করেন। নিজের পরিকল্পিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি হাইড্রোজেনকে সবকিছু হইতে আলাদা ( isolate ) করিতে সক্ষম হন।

**হেনরি ক্যাভেনডিশ**

**লাভোয়াসিয়ের**

রসায়ন বিজ্ঞানের বনিয়াদ স্থাপন করিতে লাভোয়াসিয়ের সার্থক হন। মানুষের দেহও যে একটি রাসায়নিক পরিবর্তনের কারখানা এমন নির্ভুল মনোভাব তিনি বহুপূর্বে ঘোষণা করেন।

ভলটা তড়িৎ-কোষ উদ্ভাবন ও তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তড়িৎ প্রবাহের দরুণ মৃত ব্যাঙের পা সঞ্চালনের তথ্য জানান তিনি। ইলেক্‌ট্রোস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্রের তিনি আবিষ্কর্তা।
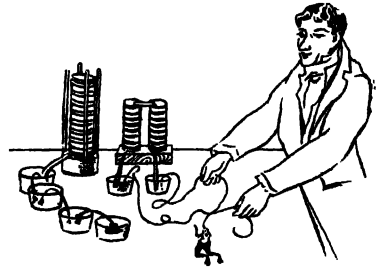
আলেকজান্দ্রা ভলটা
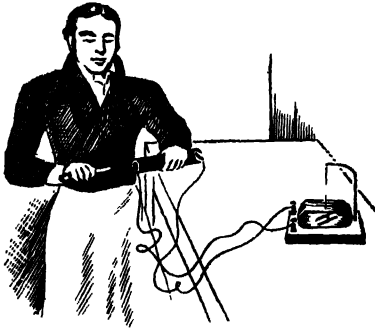
মাইকেল ফারাডে

ফারাডের তড়িৎ-চুম্বকীয় গবেষণা সুদূরপ্রসারী হয়। এমন কি আধুনিক কালে আইনস্টাইন পর্যন্ত তাহার গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন।

আমাদের চারিপাশের যে জীবাণু জগৎ আছে তাহার সংবাদ লুই পাস্তুর ভালভাবে প্রথম বুঝাইয়া দেন। এই সব অদৃশ্য জীবাণু মানুষের ক্ষতিকারক, তাহাদের হাত হইতে বাঁচিবার উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করেন।
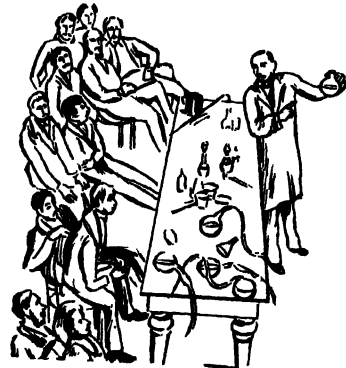
লুই পাস্তুর

কালের সহিত জীবজীবনের যে বিবর্তন হইয়াছে তাহা ডারউইন প্রথম প্রমাণ সহকারে দেখান। তাঁহার মতে মানুষ যে উন্নত ধরনের জীবন পাইয়াছে তাহা নিম্নতর জীবের ক্রমবিকাশের ফলে সম্ভব হইয়াছে।
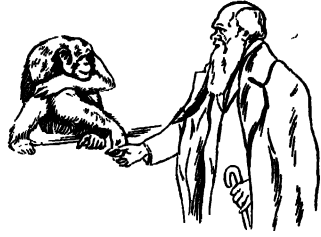
চার্লস ডারউইন

মাদাম কুরী

মাদাম কুরী তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করেন। তিনি রেডিয়াম পদার্থের আবিষ্কার করেন। ক্যানসার রোগ চিকিৎসায় বর্তমানে রেডিয়ামের ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী, মহাকাল, দূরত্ব, অবস্থান, এই সম্পর্কে তাঁহার রিলেটিভিটি থিয়োরী মানুষের প্রজ্ঞার এক অদ্ভুত নিদর্শন। তিনি বলিয়াছেন যে বস্তু ও শক্তি অভিন্ন। এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ হইল যেদিন বস্তু ভাঙ্গিয়া অ্যাটম বমের শক্তি ছাড়া পাইল।
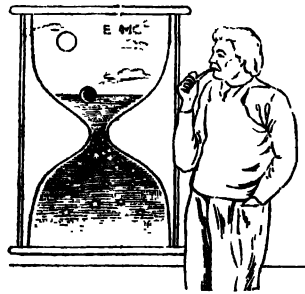
আলবার্ট আইনস্টাইন

**জগদীশচন্দ্র বসু**

পদার্থবিদ্যায় জগদীশচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। নির্বাক উদ্ভিদ জগতে যে প্রাণের স্পন্দন আছে, তাহার সুন্দর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জগদীশচন্দ্র করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের বাসভবন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' হইয়াছে। তিনি 'রয়েল সোসাইটির ফেলো' ছিলেন।

নব্যভারতে রসায়নশাস্ত্রের ঋষি প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁহার বৈজ্ঞানিক অবদান ছাড়া তিনি বিজ্ঞানের অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র তৈরী করিয়াছিলেন —মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। প্রফুল্লচন্দ্র 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন।

**প্রফুল্লচন্দ্র রায়**

**সি. ভি. রমন**

সি. ভি. রমন একমাত্র ভারতীয় বৈজ্ঞানিক যিনি বিজ্ঞান জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন। এই কলিকাতায় বসিয়াই তিনি 'রমন রশ্মি' আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

মেঘনাদ সাহা পৃথিবীর সবাইকে জানাইলেন বর্ণালী পরীক্ষা করিয়া দূর আকাশের তারার উত্তাপ নির্ণয় করা যায়। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে নানা অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃজনীশক্তির আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহারই পরিগঠিত 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। তিনি 'রয়েল সোসাইটির ফেলো' ছিলেন।

**মেঘনাদ সাহা**

**সত্যেন বসু**

বস্তুর কণিকারূপ সম্পর্কে সত্যেন বসু অসামান্য গবেষণা করিয়াছেন। যে কণিকাগুলি তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়ম মানিয়া চলে তাহাদের তাঁহার নামানুসারে 'বোসন' বলা হয়। বোস-আইনস্টাইন মতবাদ সর্বজনগ্রাহ্য। সম্প্রতি তিনি জাতীয় অধ্যাপক হইয়াছেন। তিনি 'রয়েল সোসাইটির ফেলো' নির্বাচিত হইয়াছেন।

বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে তরঙ্গ নিক্ষেপ সম্বন্ধে শিশিরকুমার মিত্র মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। তিনি রেডিও ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'রয়েল সোসাইটির ফেলো' হইয়াছেন।

**শিশিরকুমার মিত্র**

# A. Mechanics—Syllabus

*The portions in the Syllabus underlined are optional and may be omitted until further notice*

| Course Content | Demonstration & Experiments |
|---|---|
| A1. Work and energy as illustrated by activities in man and animals. | |
| A2. What makes work hard : force of gravitation, friction, inertia. | |
| A3. Simple machine to make work easier : inclined plane, lever, wheel and axle : pulleys ; simple & double pulley gears, cranks (Ex. : bicycle). | Demonstration, experiments with wheel and axle pulleys, gears and cranks. |

## সারাংশ

A1 ·1 **বল** ( **Force** ): যাহা কোন অচল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে বস্তুটি সচল হইয়া ওঠে অথবা, গতিশীল বস্তু হইলে উহার গতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে

·2 **বিভিন্নপ্রকার বল** : (Different kinds of Force) :

(*i*) মহাকর্ষ বল ( Force of Gravitation )

(*ii*) অভিকর্ষ বল ( Force of Gravity )

(*iii*) ঘর্ষণ বল (Frictional Force)

(*iv*) চৌম্বক বল ( Magnetic Force)

(*v*) অভিকেন্দ্র বল (Centripetal Force)

(*vi*) অপকেন্দ্র বল (Centrifugal Force)

·3 **কার্য (Work)** : কোন বলের বিরুদ্ধে কোন বস্তুকে সরাইলে কার্য করা হয়। বস্তুটি যতটা সরিয়া গিয়াছে (displaced), সেই দূরত্বের সহিত যতটা বল প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা গুণ করিলে **কার্যের পরিমাণ** জানা যাইবে। কার্যের হারকে (Rate) **ক্ষমতা** (Power) বলা হয়

·4 **মানুষ ও জীবজন্তুর বাঁচিয়া থাকার জন্য কার্যের প্রয়োজন**

·5 **শক্তি (Energy)** : কার্য করিবার ক্ষমতা :

·6 **শক্তির বিভিন্ন রূপ :**

(*i*) যান্ত্রিক (Mechanical)

(*ii*) তাপ (Heat)

(*iii*) শব্দ (Sound)

(*iv*) আলোক (Light)

(*v*) তড়িৎ (Electric)

(*vi*) চুম্বক (Magnetic).

(*vii*) রাসায়নিক (Chemical) শক্তি
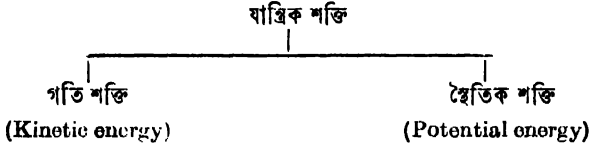
**A2 ·1 কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন** (what makes work hard) ? কোন বাধাকে অতিক্রম করিলে কার্য করা হয় : এই বাধা হইল **:**

(*i*) জাড্য জনিত বাধা (inertia)

(*ii*) ঘর্ষণ (friction)

(*iii*) মহাকর্ষ (gravitation)

**·2 জাড্য সূত্র** (Laws of Inertia) **:**

(*i*) বস্তু যদি সরলরেখা বরাবর গতিযুক্ত হয়, তাহা হইলে বাহিরের বলবিমুক্ত অবস্থায় তাহা চিরকালই সমগতিতে চলিতে থাকিবে। ইহাকে **গতির জাড্য** (Inertia of Motion) বলে।

(*ii*) বস্তু স্থির অবস্থায় থাকিলে এবং বাহির হইতে প্রযুক্ত কোন বলের প্রভাব না থাকিলে, চিরকালই ঐ বস্তু স্থির হইয়া থাকিবে। ইহাকে **স্থিতির জাড্য** (Inertia of Rest) বলে।

**·3 ঘর্ষণের প্রকার :**

(*i*) সীমাস্থ ঘর্ষণ (limiting friction)

(*ii*) গতীয় ঘর্ষণ (dynamic friction)

(*iii*) আবর্ত ঘর্ষণ (rolling friction)

**A3 ·1 সাধারণ যন্ত্র (Simple Machines) :**

**·2 নততল (inclined plane)**—ভারি মাল সহজে তোলা যায়

**·3 লিভার (Lever) :**

(*i*) প্রথম শ্রেণী **:** বল এবং ওজনের মাঝে খুঁটি

(*ii*) দ্বিতীয় শ্রেণী **:** খুঁটি এবং বলের মাঝে ওজন

(*iii*) তৃতীয় শ্রেণী **:** ওজন এবং খুঁটির মাঝে বল

**·4 চাকা এবং অক্ষদণ্ড (Wheel and axle)**

**·5 কপিকল (Pulleys)**

# A

## A1 ·1 বল ( Force )

**বল** বলিতে আমরা তাহাই বুঝি যাহা কোন অচল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে বস্তুটি সচল হইয়া ওঠে ( নড়িয়া যায় বা সরিয়া যায় )। অথবা, বস্তুটি যদি গতিশীল হয়, তাহা হইলে ইহার গতির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। একটি ঠেলাগাড়ী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেটিকে ধাক্কা দিলে (মানে বল প্রয়োগ
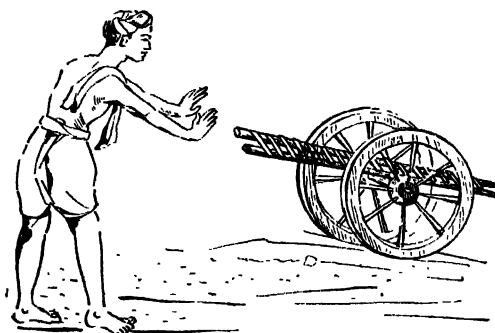
Fig. 1 ধাক্কা দিলে ( মানে বল প্রয়োগ করিলে ) গড়াইয়া যায়

করিলে ) গড়াইয়া যাইবে Fig. 1। একটি গোল বল গড়াইয়া যাইতেছে। সেই গড়ান অবস্থায় ধাক্কা দিলে বলটির গতি বদলাইয়া যাইবে, দিকেরও পরিবর্তন ঘটিবে।

## A1 ·2 বলের বিভিন্ন রূপঃ

(i) এই মহাজগতের প্রতিটি পদার্থ প্রতিটি পদার্থকে **মহাকর্ষ** ( Gravitation ) বলের দ্বারা আকর্ষণ করে।

(ii) পৃথিবী এবং পৃথিবীর উপরের সকল পদার্থের মাঝে যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করে. তাহার বিশেষ নাম হইল **অভিকর্ষ** বল ( gravity )। এই বলের দ্বারা পৃথিবী সকল বস্তুকে নিজের দিকে টানে।

(iii) ঘর্ষণ বল ( frictional force )—আমরা যখন চলিতেছি, তখন ভূমি এবং আমাদের পায়ের তলার মাঝে ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়।

(iv) অভিকেন্দ্র বল ( centripetal force, Fig. 2 )

(v) অপকেন্দ্র বল ( centrifugal force, Fig. 2 )
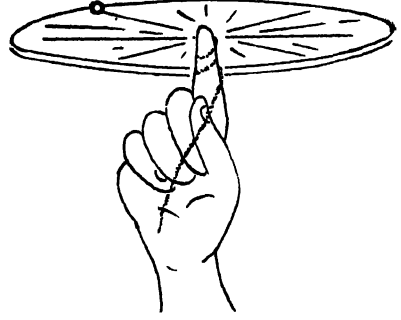
Fig. 2 অপকেন্দ্র বল ও অভিকেন্দ্র বল

(vi) চৌম্বক বল ( magnetic force, Fig. 3 )
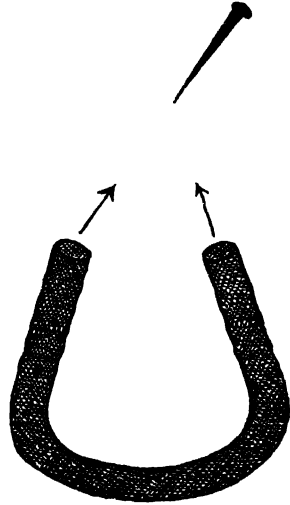
Fig. 3 চৌম্বক বল

## A1 ·3 কার্য ( Work )

যাহা করা হয়, তাহাই কার্য। কিছু করা মানে নড়া চড়া করা। কোন কিছু না নড়িলে কোন কার্য করা হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় না। একটি নির্দিষ্ট জায়গা হইতে অপর একটি নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত কোন বস্তু যখন সরিয়া যাইবে, তখন উহাকে সরাইবার জন্য বস্তুটির আয়তন এবং ওজন অনুপাতে বল প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে, কোন বলের বিরুদ্ধে কোন বস্তুকে সরাইলে কার্য করা হইবে।

একতলা হইতে তিনতলায় বালতি করিয়া জল তুলিতে গেলে, ধোপা কাপড়ের গাঁটরী মাথায় তুলিলে, অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কার্য করা হয় (Fig. 4)।

বল প্রয়োগ করিয়াও যদি প্রয়োগ বিন্দুকে ( point of application ) না নড়ান যায় অথবা যদি লম্বভাবে (perpendicularly ) বল প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে কোন কার্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয় না। ধরা যাক একটি বিরাট ভারী লোহার সিন্দুক আছে, সেটিকে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও নড়াইতে পারা গেল না। এক্ষেত্রে কোন কার্য করা হয় নাই বলিতে হইবে।

Fig. 4 কাপড়ের গাঁটরী মাথায় তোলা অর্থাৎ অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কার্য করা

কতটা কার্য হইয়াছে তাহা মাপিতে হইলে, যতটা বল প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বস্তুটি কতটা সরিয়া গিয়াছে সেই দূরত্বের ( স্থানচ্যুতি বা displacement ) গুণ করিতে হইবে।

*প্রথমে যদি বস্তুটি* A *অবস্থায় থাকে ও পরে* B অবস্থায় তাহাকে সরান হয়, এবং সেটির ওজন যদি হয় ৫ সের তাহা হইলে কার্যের পরিমাণ=প্রযুক্ত বল × বস্তুর স্থানচ্যুতি=৫ সের × AB (Fig. 5)

Fig. 5 প্রযুক্ত বল × বস্তুর স্থানচ্যুতি

কার্যের হারকে ( rate ) ক্ষমতা ( power ) বলা হয়।

## A1·4 মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনধারা ও কার্য :

জীবনের লক্ষণ হইল কার্য। আমরা যদি হাত পা নাড়া বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়াও থাকি, তাহা হইলেও আমাদের শরীরের ভিতরের কলকব্জা আপন আপন কার্য করিয়া যাইতেছে। নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসের বিশ্রাম নাই (Fig. 6)।

Fig. 6 নিদ্রিত অবস্থায় দেহ কাজ করে

আমাদের খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, লেখাপড়া সকলই কার্যের লক্ষণ। মানুষ মাটি চষিতেছে শস্যকণার জন্য, হাতুড়ি পিটাইতেছে যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্য, ছবি আঁকিতেছে মনের শিল্পক্ষুধা মিটাইবার জন্য। অন্য প্রাণীরাও আপন আপন জীবন ধারণের জন্য কার্য করিতেছে। মৌমাছিকে মধু আহরণ করিতে হয়, বেড়ালে ইঁদুর ধরিয়া বেড়ায়, পিঁপড়েরা সারি বাঁধিয়া খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য ঘোরাঘুরি করে। ছাগলে ঘাস খায়, বাঘ ছাগল খাইয়া থাকে (Fig. 7)।

Fig. 7 কার্যের নানান নিদর্শন

## A1 ·5 শক্তি (Energy) কার্য করিবার ক্ষমতা

ভারি মাল মাথায় লইয়া স্টেশনের মজুরটি ওভার ব্রিজের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হাঁপাইয়া যায় ; ছেকরা গাড়ীর ঘোড়াটার অগুনতি যাত্রীভরা গাড়ীখানা টানিতে যাইয়া জিভ বাহির হইয়া পড়ে। এই ক্লান্তি বা অবসাদ আসে কেন? কারণ কার্য করিলে শক্তির ক্ষয় হয়। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা আমাদের শরীরের ভিতর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা হজম হইয়া আমাদের শক্তি দেয়। শক্তি আছে বলিয়াই কার্য করা সম্ভব। যাহার শক্তি যত কম, সে তত কম কার্য করিতে পারিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কার্য করিবার ক্ষমতাকে শক্তি বলা হয়।

যখনই কোন কার্য করা হয়, তখনই কোন না কোন বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্যই শক্তির ক্ষয় হইয়া থাকে। কোন ভারি বস্তু নীচু জায়গা হইতে উঁচু জায়গায় তুলিতে হইলে, পৃথিবীর অভিকর্ষের

বাধা অতিক্রম করিতে হয়। ঘোড়া যখন গাড়ী টানিতে থাকে, তখন মাটি আর চাকার মধ্যে যে ঘর্ষণজনিত বাধার সৃষ্টি হয়, তাহা অতিক্রম করিতে হয়।

শক্তি অথবা বস্তু আপনা হইতে কোন কার্য করিতে পারে না—বস্তুতে শক্তির সংযোগ হইলে কার্য করিবার ক্ষমতা হয়। কোন বস্তুর দ্বারা কতখানি কার্য হইতে পারে, উহার উপর নির্ভর করিয়াই তাহার শক্তির পরিমাণ ধার্য করা হয়। এই কারণে শক্তির একক ( unit ) এবং কার্যের একক একই।

**A1 ·6** বলের মতই **শক্তিরও বিভিন্ন রূপ** আমরা দেখিতে পাই ঃ

১। যান্ত্রিক শক্তি ( Mechanical Energy )
২। তাপ শক্তি ( Heat Energy )
৩। শব্দ শক্তি ( Sound Energy )
৪। আলোক শক্তি ( Light Energy )
৫। তড়িৎ শক্তি ( Electric Energy )
৬। চৌম্বক শক্তি ( Magnetic Energy )
৭। রাসায়নিক শক্তি ( Chemical Energy )
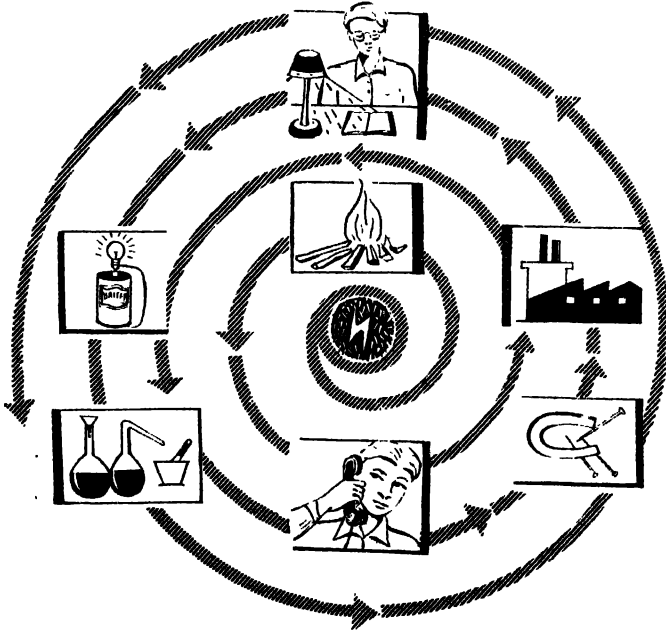
Fig. 8 শক্তির বিভিন্ন রূপ

**প্রধানতঃ যান্ত্রিক শক্তি সম্বন্ধেই এখানে বলা হইয়াছে।**

## A1 ·7 যান্ত্রিক শক্তি দুই প্রকারের থাকে ঃ

(i) গতি-শক্তি ( Kinetic Energy )

(ii) স্থৈতিক শক্তি ( Potential Energy )

(i) **গতি-শক্তি ঃ** (ক) শিশুর হাতে যতক্ষণ ক্রিকেট বলটি রহিয়াছে, ততক্ষণ উহার কার্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই। ঐটি ছুঁড়িয়া কাহাকেও মারিলে প্রচণ্ড আঘাত লাগিবে। গতির জন্যই বলটির শক্তি জন্মিল।

(খ) বাতাস যখন স্থির হইয়া থাকে, তখন তাহার কোন কিছু নড়াইবার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু সেই বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে উহার শক্তির প্রভাবে জাহাজ এবং নৌকা জলে ভাসিয়া যায় এবং হাওয়া-কল (wind mill ) চলিয়া থাকে।

(গ) হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে যে ঝরনার জল সজোরে নিম্নের বিরাট বিরাট পাথরের উপর পড়িতে থাকে. তাহার প্রচণ্ড শক্তি পাথরগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয় (Fig. 9)।

Fig. 9 ঝরনার জলে গতি শক্তির প্রকাশ

(ii) **স্থৈতিক শক্তি** ( Potential Energy ) :

(ক) কোনও একটি বিশেষভাবে বা বিশেষ অবস্থায় থাকার দরুণ নিশ্চল বস্তুরও কার্যক্ষমতা উহার ভিতর নিহিত থাকে। একখানি বড় ইঁট ছাদের উপর তুলিয়া রাখিলে নিশ্চল অবস্থায় উহার কতখানি কার্যক্ষমতা আছে উহা বোঝা যাইবে না বটে, কিন্তু ইঁটটিকে এখন যদি নীচে ফেলা যায় এবং কাহারও গায়ে লাগে, তাহা হইলে প্রচণ্ড আঘাত পাইবে। অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কার্য করিয়া ইঁটখানি ছাদে তোলা হইয়াছিল বলিয়া উহার মধ্যে ঐ শক্তি নিহিত ছিল। এখন যত উঁচুতে ইঁটটিকে তোলা হইবে, উহার আঘাত করিবার শক্তি তত বেশী হইবে।

(খ) লোহার খোটা মাটিতে পুঁতিবার সময় একটি ভারি লোহার মুগুর দিয়া আঘাত করা হয়। এই মুগুরটি কপিকলের সাহায্যে উপরে তুলিয়া তাহার পর

ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে সবেগে নামিয়া সেটি খোঁটার উপর আঘাত করিতে পারে ( Fig. 10 )।
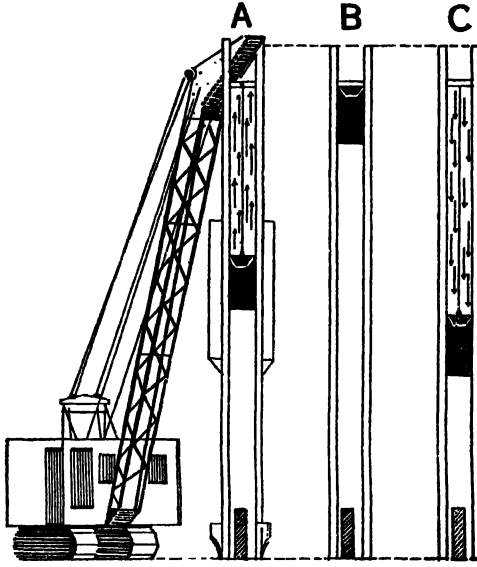
Fig. 10 লোহার ভারি মুগুর দিয়া উপর হইতে নীচে আঘাত করা স্থৈতিক শক্তির নিদর্শন

(গ) পাহাড়ের চড়াই ভাঙ্গিয়া উঠিবার সময় হাঁফ ধরিয়া যায়, উঠিতে কষ্ট হয়, কিন্তু নামিবার সময় অতি সহজেই নামিতে পারা যায়। চড়াই ভাঙ্গিবার সময় যে কায করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা স্থৈতিক শক্তি অর্জিত হইয়াছে। পরে নামিবার সময় ঐ শক্তির সাহায্যে অত সহজে নামিয়া আসা যায়।

এই যে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন প্রকার শক্তির প্রকাশ আমরা দেখিতেছি এই শক্তির কোন ক্ষয় নাই, শক্তির শুধু রূপান্তর সম্ভব। আগুন জলকে তপ্ত করিয়া বাষ্প করিতেছে, বাষ্পের জোরে স্টীম এন্‌জিন চলিতেছে। এই ক্ষেত্রে তাপ-শক্তি গতি-শক্তিতে পরিণত হইতেছে।

বৈদ্যুতিক শক্তি রূপান্তরিত হইতেছে, কিছু গতি-শক্তি, কিছু আলোক-শক্তি কিছু বা তাপ-শক্তিতে। শক্তিকে বাড়ান, কমান বা সৃষ্টি করা যায় না, তাহা কোন না কোন রূপে সকল সময়ই বর্তমান।

প্রচণ্ড তাপের আকর সূর্য। গাছপালা এই তাপ শোষণ করিয়া থাকে ও সময়ের সঙ্গে পৃথিবীর আলোড়নের ফলে মাটির নীচে চলিয়া যায়। পরে ইহারাই কয়লায় রূপান্তরিত হয়। শুকনা গাছের কাঠ এবং কয়লা জ্বালাইয়া আমরা

আবার তাপ ফিরিয়া পাই, সেই তাপের সাহায্যে উনুনে রান্না হয়, বয়লারে জল ফোটে।

## A2·1 কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন ( What makes work hard ) :

জাড্য ( Inertia ), ঘর্ষণ ( Friction ) ও মহাকর্ষ ( Gravitation )

আমরা দেখিয়াছি কোন কার্য করিতে হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হয়। তাহার কারণ কায তখনই করা হয়, যখন আমরা কোন একটা বাধাকে অতিক্রম করিয়া থাকি। এই বাধা বস্তুর স্বাভাবিক জাড্য-জনিত বাধা অথবা ঘর্ষণ বল, অভিকর্ষ বল বা মহাকর্ষ বল হইতে পারে।

## A2·2 জাড্য : বাহিরের বল বিমুক্ত অবস্থা

বস্তুর স্বাভাবিক প্রবণতা হইল অচল হইয়া থাকা। আপনা হইতে উহা নড়িবে না। এই অচলতা দুই প্রকারের হইতে পারে।

**জাড্য সূত্র** ( Laws of Inertia )

(১) বস্তু স্থির অবস্থায় থাকিলে এবং বাহির হইতে প্রযুক্ত কোন বলের প্রভাব না থাকিলে চিরকালই ঐ বস্তু স্থির হইয়া থাকিবে। এই জাড্যকে **স্থিতির জাড্য** ( Inertia of Rest ) বলা হয়।

(২) বস্তু যদি সরলরেখা বরাবর গতিযুক্ত হয়, তাহা হইলে বাহিরের বল বিমুক্ত অবস্থায় তাহা চিরকালই সমগতিতে চলিতে থাকিবে। এই জাড্যকে বলা হইয়াছে, **গতির জাড্য** ( Inertia of Motion )

স্যার আইজাক নিউটন ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া'তে বস্তুর গতি সম্পর্কে তিনটি সূত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রথম সূত্রই হইল উপরে উল্লিখিত 'জাড্য সূত্র' , অপর সূত্র দুইটি মহাকর্ষ সম্বন্ধে বলিবার সময় বিবৃত করা হইবে।

জাড্য সূত্র হইতে দুইটি বিষয় বুঝিতে পারা যায় :

(ক) বস্তুর একটি স্বাভাবিক গুণ হইল জাড্য। উহা স্থিরই হউক বা গতিশীল হউক নিজ হইতে উহা আপন অবস্থার কোন পরিবর্তন করিতে পারে না।

(খ) বলের স্বরূপ আমরা এই সূত্র হইতে জানিতে পারি। ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য কোন বস্তুই সম্পূর্ণভাবে বাহিরের বল বিমুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারে না। সেই কারণেই স্থাণু অবস্থা হইতে বস্তু সচল হইয়া থাকে আবার কোন বস্তুই চিরকাল সম-গতিশীল থাকিতে পারে না।

## স্থিতির জাড্যের নিদর্শন :

(ক) একটি বড় মুখওলা কাঁচের বোতল অথবা জারের উপর একটি কার্ড বোর্ড ও তাহার উপর একটি পয়সা ( বা যে কোন মুদ্রা ) রাখ। এখন যদি হঠাৎ খুব জোরে কার্ড বোর্ডটি ঠেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, পয়সাটি জারের মধ্যে পড়িয়াছে। ইহার কারণ এখানে হঠাৎ ধাক্কা দেওয়ার ফলে কার্ড বোর্ডটি পড়িয়া গেলেও পয়সাটির স্থির অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না। ( Fig. 11 )
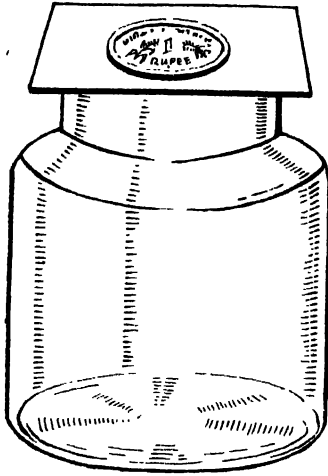
Fig. 11 স্থিতির জাড্যের নিদর্শন

(খ) ক্যারম খেলিবার সময় অনেক সময় তুইটি বা তাহার অধিক ঘুঁটি উপর উপর থাকিয়া যায়। তখন যদি স্ট্রাইকার দিয়া সবচেয়ে তলার ঘুঁটিটিকে আঘাত করা হয়, তাহা হইলে সেই ঘুঁটিখানি সবেগে বাহির হইয়া আসিবে, কিন্তু অন্যগুলি একইভাবে থাকিবে।

## গতির জাড্যের নিদর্শন :

(ক) চলন্ত ট্রেনের কামরার ভিতরে একটি বলকে যদি উপর দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বলটি একেবারে সোজা উপর দিকে যাইয়া সোজাই নীচের দিকে নামিবে। ইহার কারণ বলটি শূন্যে থাকার সময়ও আগের মতই ট্রেনের সমান গতিবেগে চলিবে। বলটি কামরার বাহিরে ছুঁড়িলেও একই ফল হইবে।

Fig. 12 চলন্ত ট্রাম হইতে নামিবার সময় সম্মুখে আগাইয়া যাওয়া গতির জাড্যের নিদর্শন

(খ) যখন আমরা চলন্ত ট্রামে বা বাসে চড়িয়া থাকি, তখন আমাদের সমস্ত শরীর বাসের সম্মুখ-গতিযুক্ত হইয়া থাকে। এখন

নামিবার সময় আমরা যদি হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমরা হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া যাইব, কারণ আমাদের পা স্থির হইয়া থাকিলেও সমস্ত শরীর তখনও সামনের দিকে চলিবার গতিযুক্ত হইয়া আছে। এই জন্যই চলন্ত ট্রাম-বাস হইতে নামিয়াই যে দিকে ট্রাম চলিতেছে, সেইদিকে দুই-চার পা আগাইয়া যাইতে হয় ( Fig. 12 )।

## A2·3 ঘর্ষণ ( Friction )

কোন বস্তু যে চিরকাল একভাবে সমগতিতে চলিতে পারে না তাহার একটি কারণ হইল ঘর্ষণ জনিত বাধা। রবার অথবা কাঠের একটি বল যদি মসৃণ পাথরের মেঝে অথবা আরও মসৃণ বরফের উপর গড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বহুক্ষণ গড়াইতে থাকিবে। ঐ বলটিই যদি এবড়োথেবড়ো মাটির উপরে গড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঘর্ষণ বলের প্রভাবে উহা শীঘ্রই থামিয়া যাইবে।

নতুন জুতা পরিয়া পাথরের মেঝের উপর দিয়া চলিতে গেলে পা পিছলাইয়া যায়। পাথরের শিল এবং নোড়া দিয়া হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি মশলা বাটা হইয়া থাকে। এই শিল এবং নোড়ার গায়ে ছোট ছোট গর্ত করা থাকে, তাহা না হইলে মশলা সব পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবে। কিছুদিন ব্যবহার করিতে করিতে এই গর্তগুলির ক্ষয় হয়, সেইজন্য আবার শিলকাটা ডাকাইয়া গর্ত করাইতে হয়। এই বল এবং বরফ, জুতা এবং মেঝে, শিল এবং নোড়া যে জায়গায় পরস্পরকে স্পর্শ করে, সেই স্পর্শতলে ( surface of contact ) ঘর্ষণ বলের উদ্ভব হয়। এই বল গতির বিপরীত মুখী এবং স্পর্শতলের সমান্তরাল হয়। পদার্থ যত মসৃণ বা চকচকে হইবে ঘর্ষণ বল ততই কম হইবে। একেবারে নিখুঁত মসৃণ বলিয়া কিছু নাই। সেইজন্য সকল বস্তুরই গতি কমিতে কমিতে শেষে থামিয়া যায়। জাহাজ জলে ভাসে এবং জল হইতে ঘর্ষণজনিত বাধা পায়। এয়ারোপ্লেনকে বায়ুর ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে চলিতে হয়, এই কারণে উহাদের গঠন এমনভাবে করা হয়, যাহাতে বায়ুর ঘর্ষণ বল খুব অল্প পরিমাণে কার্যকরী হইতে পারে।

**ঘর্ষণের প্রকার** :—ঘর্ষণ তিন প্রকারের হইয়া থাকে :

(i) সীমাস্থ ঘর্ষণ ( limiting friction ), (ii) গতীয় ঘর্ষণ ( dynamic or sliding friction ), ও (iii) আবর্ত ঘর্ষণ ( rolling friction )।

(i) **সীমাস্থ ঘর্ষণ**: মনে কর একটি ১ মণ ওজনের চালের বস্তা একঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। প্রথমে অল্প জোর দিয়া সেটিকে ঠেলিতে আরম্ভ করিলে সেটি নড়িবে না। এখন আস্তে আস্তে জোর বাড়াইতে থাকিলে যখন বস্তার ওজনের চেয়ে জোরের পরিমাণ বেশী হইবে, তখন এক সময় বস্তাটি নড়িতে সুরু করিবে। বস্তাটি নড়িবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে যে ঘর্ষণ বল দেখা দেয়, তাহাকেই সীমাস্থ ঘর্ষণ বা limiting friction বলে।

(ii) **গতীয় ঘর্ষণ**: বস্তাটিকে একবার যখন সরাইতে পারা গেল, তখন সেটিকে আরও টানিবার জন্য যে ঘর্ষণ বলের প্রয়োজন হয়, তাহাকে গতীয় ঘর্ষণ বলে। এই বল সীমাস্থ ঘর্ষণের চেয়ে কিছু কম হইয়া থাকে।

(iii) **আবর্ত ঘর্ষণ**: কোন গোলাকার বস্তু অন্য কিছুর উপর দিয়া গড়াইতে থাকিলে আবর্ত ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। এই ঘর্ষণ বল অন্য ঘর্ষণ বলের অপেক্ষা অনেক কম হয়। এই কারণে যে কোন ভারি জিনিস সাধারণতঃ চাকার সাহায্যে নড়ান হয়। বড় বড় কৌচ কেদারার তলায় বা পিয়ানো বাজনার তলায় চাকা দেওয়া থাকে, যাহার ফলে ঘরের মধ্যে সেগুলি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় নড়ান অনেক সহজ হয়।

ভারি মাল বহন করার জন্য চাকা দেওয়া ঠেলাগাড়ী ব্যবহার করা হয়। মোটরগাড়ী, বাস, ট্রেন ইত্যাদি সবই চাকায় চলে।

## A3·1 সাধারণ যন্ত্র

আমরা আমাদের কার্যের সুবিধার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। চাষের জন্য কোদাল দিয়া মাটি কোপাইতে একটি লোকের যে সময় লাগিবে, ট্রাক্টার যন্ত্রের সাহায্যে বহু কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশী জমি কোপান হইবে।

একটি পাঁচমণী বোঝা তুলিতে পাঁচটি জোয়ান লোক হিমসিম খাইবে, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে (ক্রেন বা পুলি) সেই মাল অতি সহজেই তোলা যাইবে।

এইভাবে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এবং অন্য ক্ষেত্রেও আমরা যন্ত্রের সাহায্য লইয়া থাকি।

## A3·2 যে সকল যন্ত্র আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি

**নততল** (inclined plane): কোন ঢালু জায়গাই হইল নততল। ভারি মাল সোজা তুলিতে যে পরিমাণ জোর লাগে গড়ানে জায়গার

উপর দিয়া মালটি টানিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে অনেক কম জোরের প্রয়োজন হয়। ( Fig. 13 )

পাহাড়ে রাস্তায় মোটর বাস উঠিবার সময় ধীরে ধীরে চড়াই ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারে। সেই রাস্তায় খাড়া উঠিতে পারা অত্যন্ত কষ্টকর বা অসম্ভব। দার্জিলিং-এর রাস্তায় যে রেললাইন আছে তাহা অমনি ধীরে ধীরে চড়াই উঠিয়াছে।
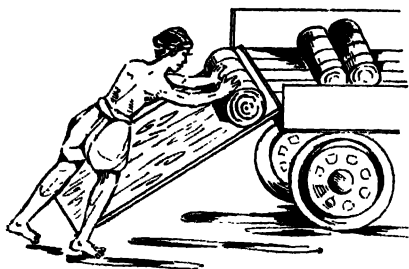
Fig. 13 ঢালু জায়গা হইল নততল

উঁচু নীচু করা যায় প্যাচ-লাগান যে টুল বা চেয়ার, ছিপি খুলিবার যে প্যাঁচান কর্ক স্ক্রু বা এমনি স্ক্রু এ সকলই আসলে নততলের কাজ করিয়া থাকে। মনে কর, একটি ছোট পাহাড় আছে যাহার মাথায় উঠিতে গেলে সহজ উপায় হইল উহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া একটি রাস্তা ধরিয়া যাওয়া। স্ক্রু বা প্যাচের সহিত নততলের মিল কোথায় এইবার তাহা বোঝা যাইবে ( Fig. 14 )। অজন্তা-ইলোরা, পুরী ও কোনারকের মন্দির, মিশরের পিরামিড তৈরী করিবার সময় বড় বড় ভারি পাথরগুলি এই নততলের সাহায্যেই তোলা হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

Fig. 14 স্ক্রুর নততলের সহিত পাহাড়ের ঘোরান রাস্তার তুলনা

**A3 3 লিভার** (Lever) : কোন একটি স্থির বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতে পারে এমন একটি কঠিন অনমনীয় দণ্ডকে (সোজা বা বেঁকা) লিভার বলা হয়। এই স্থির বিন্দুটিকে খুঁটি ( Fulcrum ) বলে। লিভারের কোন একটি অংশে বলপ্রয়োগ করিয়া উহার অপর কোন অংশে আরও বেশী বল প্রয়োগ করা যায়।

ছবিতে E হইল বল বা চেষ্টা, F ফালক্রাম এবং L হইল ভার (Fig. 15 )। EF এবং LF-কে লিভারের দুই বাহু ( arm ) বলা হয়; প্রথমটি বলবাহু এবং দ্বিতীয়টি ওজন বাহু। কোন যন্ত্রের দ্বারা কাজের যে সুবিধা হয়,
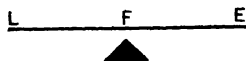
Fig. 15

তাহাকে বলে যান্ত্রিক সুবিধা ( mechanical advantage )। লিভারের বেলায় ইহার পরিমাণ হইল

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{L}{E} = \frac{\text{বল বাহু}}{\text{ওজন বাহু}}$$

(i) **লিভার কয় প্রকার :** লিভারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

**প্রথম শ্রেণী :** ইহার বেলায় বল এবং ওজনের মাঝে খুঁটি থাকে। যেহেতু ওজনবাহু অপেক্ষা বলবাহু অনেক বড়, E হইতে L অনেক বেশী হইবে। তাহা হইলে অল্প বলপ্রয়োগে বেশী ওজন তোলা যাইবে। কেবল দাঁড়িপাল্লার বেলায় F ঠিক মাঝখানে থাকে এবং বলবাহু ও ওজনবাহু সমান হইয়া থাকে।

**নিদর্শন :**
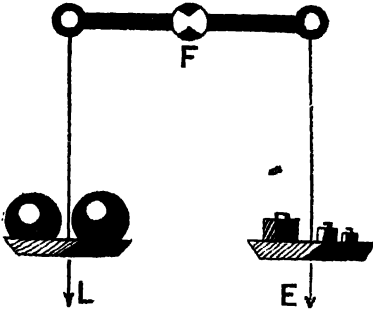
Fig. 16 দাঁড়িপাল্লা
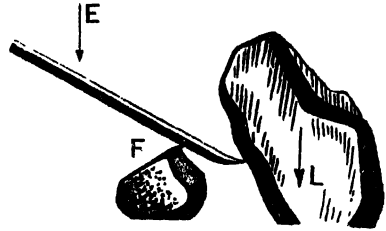
Fig. 17 ক্রোবার
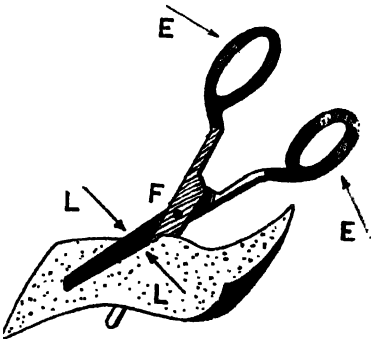
Fig. 18 কাঁচি
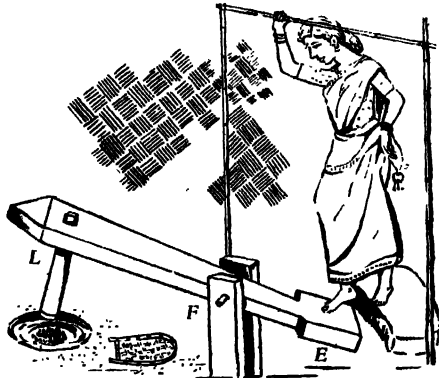
Fig. 19 ঢেঁকি

(ii) **দ্বিতীয় শ্রেণী:** এই ক্ষেত্রে খুঁটি এবং বলের মাঝে ন থাকে। এখানেও অল্প বল প্রয়োগ করিয়া অনেক বেশী ওজন তুলিতে পারা যায়। ( Fig. 20 )

F F
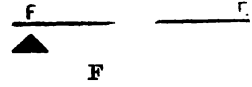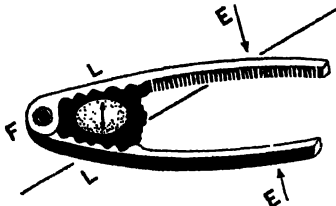
**নিদর্শন:**

Fig. 21 বাদামভাঙ্গা জাঁতি
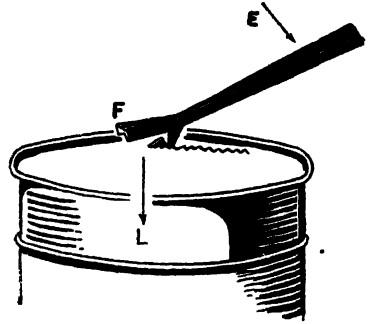
Fig. 22 টিন কাটার যন্ত্র

(iii) **তৃতীয় শ্রেণী:** এর বেলায় ওজন এবং খুঁটির মাঝে বল থাকে। এক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা কিছু নাই, কিন্তু কতকগুলি সাধারণ সুবিধা আছে।

L E F
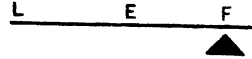
**নিদর্শন:**
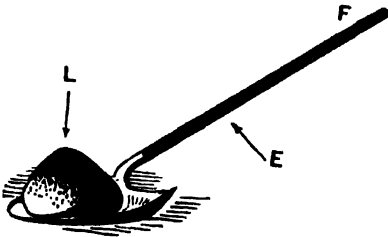
Fig. 23 কয়লা তোলা খোন্তা
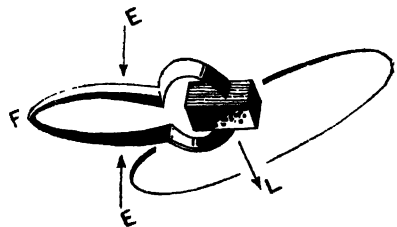
Fig. 24 চিমটে

**A3 ·4 চাকা এবং অক্ষদণ্ড:** (Wheel and Axle) ইহা সাধারণতঃ দুইটি সিলিণ্ডার ( cylinder ) দিয়া তৈরী হয়, যে দুইটি একটি সাধারণ অক্ষের চারিপাশে ঘুরিতে পারে। বাহিরেরটি একটি বড় চাকার মত এবং তাহাতে খাঁজ কাটা থাকে। এইটিকে চাকা বলা হয়। অপরটির অনেক কম ব্যাসার্ধ ( radius )

হয় এবং বড় চাকাটির মাঝে থাকে। এটিকে অক্ষ দণ্ড বলা হয়। এই অক্ষদণ্ডে একটি দড়ি জড়ান থাকে, যাহার একপ্রান্ত অক্ষদণ্ডে আটকান থাকে এবং অপর প্রান্তে যে মাল তুলিতে হইবে তাহা আটকান থাকে।

আর একটি দড়ি বড় চাকাটিকে ঘিরিয়া প্রথমটির উল্টা পাকে জড়ান থাকে। ইহার এক প্রান্ত চাকার গায়ে আটকান থাকে, অপর প্রান্ত খোলা থাকে এবং প্রয়োজনমত সেখানে বল প্রয়োগ করা যায় ( Fig. 25 )।
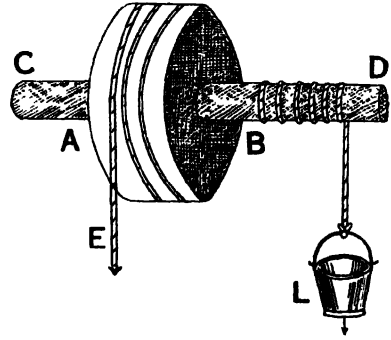
Fig. 25 জল তুলিবার কল

মোটর, বাস, সাইক্‌ল্ ইত্যাদিতেও চাকা এবং অক্ষদণ্ডের ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় ঘর্ষণ বল খুব কম করিবার জন্য অক্ষদণ্ডের উপর ছোট ছোট ইস্পাতের বল সাজান থাকে।

## নিদর্শন
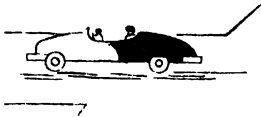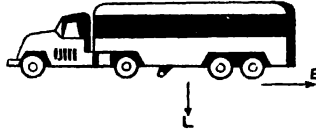
Fig. 26 মোটর Fig. 27 বাস Fig. 28 সাইক্‌ল্

**A3 ·5 কপিকল** ( Pulleys ) : ইহাতে একটি পাতলা খাঁজ-কাটা চাকা এবং দড়ি বা চেন থাকে। চাকার পরিধিতে খাঁজকাটা থাকে এবং সেই খাঁজের উপরে দড়ি বা চেনটি ফেলা থাকে। সাধারণতঃ একটি কাঠামতে কপিকলটি লাগান থাকে এবং চাকার মাঝে একটি অক্ষের চারিপাশে চাকাটি স্বচ্ছন্দে ঘুরিতে পারে। কাঠামটি যদি আটকান থাকে, তাহা হইলে আটকান-পুলি ( fixed pulley, Fig. 29 ) বলে,
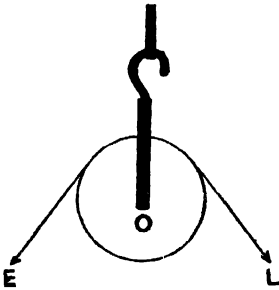
Fig. 29 কপিকল

এবং কাঠামটি যদি নড়ান যায় তাহা হইলে নড়ান-পুলি ( movable pulley, Fig. 30 ) বলা হয়। কপিকলকে একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার বলা হয়। ভারি মাল তুলিবার সময় অনেকগুলি কপিকল একসঙ্গে সাজাইয়া কাজ করিলে সুবিধা হয়।
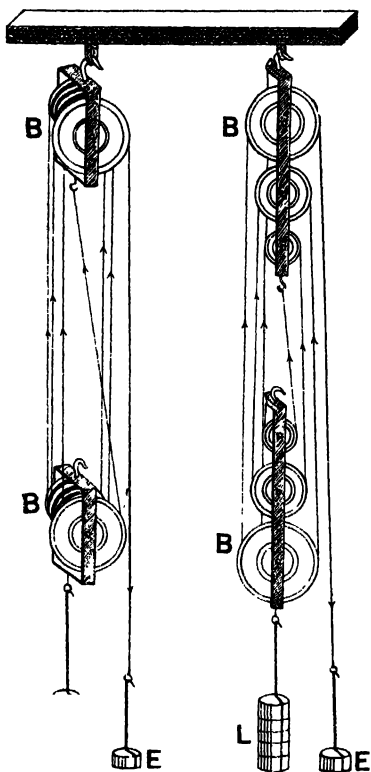
Fig. 30 একত্রিত পুলি

কূয়া থেকে জল তুলিবার সময় আমরা কপিকল ব্যবহার করিয়া থাকি। কপিকলে যান্ত্রিক সুবিধা নাই কেননা যতটা বল প্রয়োগ করা হইবে ততটা ওজনই তোলা যাইবে। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে মালটি সোজা টানিয়া তুলিতে গেলে কষ্ট বেশী হয়, সেই ক্ষেত্রে কপিকল ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়। কপিকলের আরও সুবিধা আছে। ইহার সাহায্যে নীচু জায়গায় দাঁড়াইয়া উঁচু জায়গায় মাল তুলিতে পারা যায় এবং নীচের দিকে বল প্রয়োগ করিতে পারা যায় বলিয়া দেহের ওজনকেও কাজে লাগাইতে পারা যায়।

**নিদর্শন**

(ক) কূয়া থেকে জল তোলা

(খ) কাপড় শুখাইবার দড়ি টাঙ্গান
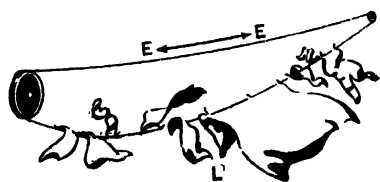
Fig. 31 কাপড় শুখাইবার দড়ি

## প্রশ্নাবলী

1. বল বলিতে কি বুঝায় তাহা সহজ ভাষায় কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বিবৃত কর।
2. কার্যের সহিত বলের সম্বন্ধ কি? মানুষ ও জীবজন্তুকে কার্য করিতে হয় কেন?
3. শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং রূপান্তরের উদাহরণ দাও।
4. কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন? যে ব্যক্তি যত শক্তিমান সে তত বেশী কার্য করিতে পারে—ইহা বলিলে কি বুঝায়?
5. আমাদের কার্যের সুবিধার জন্য যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় (পাঠ্য তালিকায় যেগুলি আছে), তাহাদের নাম এবং সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।
6. লিভার কয় শ্রেণীর হইয়া থাকে লিখ। প্রতি শ্রেণীর তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও। কপিকলের সাহায্যে কার্যের কি সুবিধা হয়?
7. নিউটনের জাড্যসূত্র লিখ। কার্য করিতে গেলে আমাদের কি কি বাধা অতিক্রম করিতে হয়?
8. চাকা এবং অক্ষদণ্ডের যান্ত্রিক সুবিধা কি? নততলের উদাহরণ দাও। ইহার দ্বারা আমরা কি সুবিধা পাইয়া থাকি?

# B. Gravitation-Syllabus

*The portions in the syllabus underlined are optional and may be omitted until further notice*

| Course Content | Demonstration & Experiments |
|---|---|
| **B1.** Why stones roll down and in doing so gather speed ; motion or velocity and acceleration related to force. | |
| **B2.** Galileo and the constant acceleration of gravity. | Coin and feather expt. |
| **B3.** The simple pendulum | Experiments with simple pendulum. |
| **B4.** The centre of gravity of a body : states of equilibrium. | |
| **B5.** The balance : spring balance, beam balance. | Use of a balance. |
| **B6.** Newton and the law of gravitation. | |
| **B7.** The Solar system according to Newton's law. Simple explana tion of the tides, artificial satellites weightless—state. | Appropriate illustrations and slides. |
| **B8.** Elementary ideas about the Milky way. Nebulae, the Universe. | |

## সারাংশ

**B1 মহাকর্ষীয় সূত্র** ( **Law of Gravitation** ) ঃ মহাজগতের সকল পদার্থই অন্য সকল পদার্থকে তাহাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একটি বলের দ্বারা আকর্ষণ করে। এই বল পদার্থ দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ( directly proportional ) এবং তাহাদের মাঝের সরলরৈখিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক. ( inversely proportional ) ।

$$F = G\frac{M_1 M_2}{d^2}$$

**অভিকর্ষ** ( **Gravity** ) ঃ পৃথিবীর উপর বর্তমান যাবতীয় পদার্থ এবং পৃথিবীর মধ্যে যে আকর্ষণ আছে তাহার বিশেষ নাম হইল অভিকর্ষ (g)

**বলের ক্রিয়া** ঃ বেগ ( **Velocity** ) ঃ কোন নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর গতি। ত্বরণ (accelera tion) ঃ ক্রমবর্ধমান বেগের পরিবর্তনের হার

**B2 গ্যালিলিও এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ, পড়ন্ত বস্তুর সূত্র** ( Laws of Falling Bodies ) । গিনি পালক পরীক্ষা

B3 **সরল দোলক** ( **Simple Pendulum** ) ঃ চারিটি দোলক সূত্র ; যথা—

(*i*) সমকাল সূত্র

(*ii*) দৈর্ঘ্যের সূত্র

(*iii*) ত্বরণ সূত্র

(*iv*) ভরের সূত্র। দোলন কাল T

B4·1 **ভার কেন্দ্র** ( **Centre of gravity** ) ঃ বস্তুর ওজনের ক্রিয়া রেখা যে নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইল ভার কেন্দ্র

·2 **সাম্য অবস্থা** ( **States of Equilibrium** ) ঃ গতি-সাম্য ( Equilibrium of Motion ) ; স্থিতি-সাম্য ( Equilibrium of Rest ) :

(*i*) সুস্থিত (Stable equilibrium)

(*ii*) দুঃস্থিত ( unstable equilibrium )

(*iii*) নিরপেক্ষ ( neutral equilibrium ) অবস্থা

B5·1 **দণ্ডতুলা** ( **Beam Balance** ) ঃ প্রথম শ্রেণীর লিভার। দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে দুইটি পদার্থের ভরের তুলনা। দাঁড়িপাল্লার বিভিন্ন অংশ

·2 **স্প্রিং তুলা** ; স্প্রিং এর বৃদ্ধি ওজনের সমানুপাতিক

B6·1 **নিউটন এবং মহাকর্ষ সূত্র** (**Newton and the Law of Gravitation**)

B7·1 **সৌরজগৎ ও নিউটনের মহাকর্ষের নিয়ম** ( **Solar System according to Newton's Law of Gravitation** )

·2 **সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে পর-পর প্রধান গ্রহগুলির নাম** ঃ বুধ (Mercury), শুক্র ( Venus ), পৃথিবী ( Earth ), মঙ্গল ( Mars ), বৃহস্পতি ( Jupiter ), শনি (Saturn), অরুণ (Uranus—ইউরেনাস), বরুণ ( Neptune—নেপচুন ), ও কুবের ( Pluto--প্লুটো )। গ্রহের উপগ্রহ : পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। গ্রহাণুপুঞ্জ (asteroids)। কেপলারের নিয়ম ও মহাকর্ষ সূত্র মিলাইয়া বহু অজানা গ্রহের আবিষ্কার

·3 **সৌরজগতের বিস্তার**—প্রতি গ্রহনক্ষত্রের উপর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ক্রিয়া

·4 **জোয়ার-ভাঁটা** (**tides**) : পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের ফল ; অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ভরা কটাল, অষ্টমী তিথিতে মরা কটাল ; মুখ্য জোয়ার পৃথিবী পৃষ্ঠ চন্দ্রের নিকটে। গৌণ জোয়ার—পৃথিবী পৃষ্ঠ চন্দ্র হইতে দূরে

·5 **কৃত্রিম উপগ্রহ ও ওজনশূন্য অবস্থা** (**Artificial Satellites and weightless state**) : হাউই-এর নিয়মে কৃত্রিম উপগ্রহ ওড়ান—প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক (Sputnik) ১৯৫৭ সালের 4th October সোভিয়েট ইউনিয়নে ছাড়া হয়। নিউটনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিয়মের ভিত্তিতে রকেটের কার্যক্রম। ভারশূন্য বা ওজনশূন্য অবস্থা ; পৃথিবীর আকর্ষণ ও অপকেন্দ্র বলের বিপরীতমুখী সমান বলের প্রভাব

B8·1 **ছায়াপথ, বিশ্ব এবং নীহারিকা** (**Milky way, Universe, Nebulae**)

(*i*) ছায়াপথ ঃ সূর্যের মত কোটি কোটি নক্ষত্রের সমাবেশ

(*ii*) উল্কা (meteor) : মহাশূন্য হইতে খসিয়া-পড়া পদার্থ খণ্ড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সহিত ঘর্ষণের ফলে জ্বলিয়া উঠে

(*iii*) ধূমকেতু ঃ ধূলিকণা ও বাষ্প মিলিয়া ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়

(*iv*) নীহারিকা ; মহাশূন্যে ঘন গ্যাসীয় মেঘ—ইহারা জমাট বাঁধিয়া নক্ষত্রের সৃষ্টি করে।

(*v*) মহাবিশ্ব (universe)

# B

## B1 পদার্থের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ

মহাজগতের সকল পদার্থই অন্য সকল পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে পদার্থ দুইটির ভর (mass) এবং তাহাদের মধ্যে যে দূরত্ব তাহার বর্গের উপরে। মহাজগতের প্রতিটি তারায় তারায় আকর্ষণ আছে, প্রতিটি অণুতে অণুতে আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ (gravitation)। যে সরল রেখা পদার্থ দুইটিকে যুক্ত করে, ইহা সেই সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে এবং ইহার পরিমাণ ভর দুইটির গুণফলের সমানুপাতিক ও উহাদের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতিক।

F যদি বল হয়, $M_1$ এবং $M_2$ যদি দুইটি বস্তুর ভর হয় এবং d তাহাদের মাঝের দূরত্ব হয়, তাহা হইলে $F = G\frac{M_1M_2}{d^2}$

G হইল মহাকর্ষীয় নিত্যসংখ্যা (gravitational constant)। পৃথিবীর উপর বর্তমান যাবতীয় পদার্থ এবং পৃথিবীর মধ্যে যে আকর্ষণ আছে তাহার বিশেষ নাম হইল অভিকর্ষ বল। যেমন সব মানুষই মানুষ, কিন্তু বাঙ্গলার মানুষ বাঙ্গালী, আসামের মানুষ আসামী, ঠিক তেমনই মহাকর্ষ আর অভিকর্ষের মধ্যে তফাৎ। বিজ্ঞানী নিউটন মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ বলের আবিষ্কার করেন আপেল ফলের মাটিতে পড়া দেখিয়া। আপেল ফলটিত আকাশের দিকে উঠিতে পারিত, কিন্তু তাহা না হইয়া সেটি মাটিতে পড়িল কেন, এই চিন্তা হইতেই তিনি ধীরে ধীরে মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ বলের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

কোনও বস্তুকে শূন্যে ছাড়িয়া দিলে অথবা একটি পাথরকে পাহাড়ের গায়ে গড়াইয়া দিলে সেটি ক্রমবর্ধমান বেগের সহিত পৃথিবী অভিমুখে পড়িতে থাকে।

বেগ ( velocity ) বলিতে কোন নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর গতিকে বোঝায়। যেমন, কালবৈশাখী ঝড় উত্তর-পূর্ব দিকে ঘণ্টায় ৩০ মাইল হিসাবে বহিতেছে। সেই ঝড় যদি ৩০ মাইল হিসাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বেগ আলাদা হইবে, কিন্তু তাহাদের গতি ( speed, ঘণ্টায় ৩০ মাইল ) এক হইবে। ক্রমবর্ধমান বেগের যে পরিবর্তনের হার তাহাকে বলে ত্বরণ ( acceleration ) আর ক্রমহ্রাসমান বেগের যে পরিবর্তনের হার তাহাকে বলে মন্দন ( retardation)। উপরে দেখিতেছি একটি পাথরকে পাহাড়ের গায়ে গড়াইয়া দিলে সেটি ক্রমবর্ধমান বেগের সহিত পৃথিবীর অভিমুখে পড়িতে থাকে। বেগ বাড়িবার কারণ হইল কোন বলের ক্রিয়া। এই বল হইল অভিকর্ষজ বল এবং এই ত্বরণ হইল অভিকর্ষজ ত্বরণ ( acceleration due to gravity )। ইহাকে 'g' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

$$g = G.\frac{M}{R^2},$$

M = পৃথিবীর ভর
R = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ
G = মহাকর্ষীয় নিত্য সংখ্যা

পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার না হইলেও প্রায় গোলাকার। সেইজন্য অভিকর্ষ-বল সকল সময় পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে অন্য বস্তুর উপর ক্রিয়া করে বলিয়া ধরা হয়। এখন পৃথিবী যদি সম্পূর্ণ গোলাকার হইত, তাহা হইলে এই অভিকর্ষ বল পৃথিবীর সর্বত্র সমান হইত। তাহা নয় বলিয়া উত্তর মেরু (NP) আর দক্ষিণ মেরুতে (SP) অভিকর্ষ বলের ক্রিয়া কম এবং নিরক্ষরেখা (E) বরাবর অভিকর্ষ বলের ক্রিয়া বেশী।
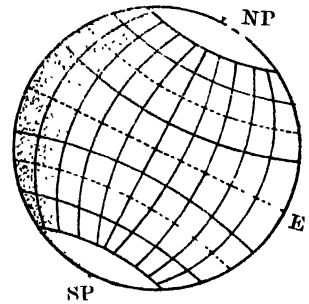
Fig 1. প্রায় গোলাকার পৃথিবী

কোনও বস্তুর ওজন নির্ভর করে তাহার ভর ( mass ) এবং অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর। তাহা হইলে কোন বস্তুকে যদি উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু হইতে নিরক্ষরেখায় ( equator-এ ) লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে উহার ওজন বেশী হইবে কারণ নিরক্ষরেখাতে 'g'র পরিমাপ বেশী এবং ভরের বদল হয় না। কোন বস্তুকে যদি একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে উহার ভরের কোন পরিবর্তন হইবে না, কিন্তু উহা ওজন শূন্য হইয়া যাইবে, কারণ বস্তুটি এবং কেন্দ্রের মধ্যের দূরত্ব শূন্য হইয়া যাইবে।

## B2 গ্যালিলিও এবং অভিকর্ষজত্বরণ ( g )

সাধারণতঃ আমরা মনে করিয়া থাকি যে, কোন সমান উঁচু জায়গা হইতে মাটির উপর যদি একই সময় একটি ভারি এবং একটি হালকা জিনিস ফেলা হয়, তাহা হইলে ভারি বস্তুটি আগে এবং হাল্কাটি পরে মাটিতে পড়িবে। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও দেখাইয়াছিলেন যে এই ধারণা ভুল। তিনি বিভিন্ন পদার্থের তৈরী বিভিন্ন আকারের বল এবং একই ওজনের অথচ বিভিন্ন পদার্থের খণ্ড এক রকম বাক্সের ভিতর ভরিয়া পিসার হেলান মিনারের উপর হইতে নীচে ফেলিয়াছিলেন। প্রায় সম-সময়ে সবগুলি ভূমিস্পর্শ করিয়াছিল। যেটুকু তফাৎ ছিল তাহা বায়ুর ঘর্ষণজনিত বলের বাধার দরুণ। বস্তুটি বড় হইলে ঘর্ষণজনিত বাধাও বেশী হইবে। গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন যে কোন বায়ুশূন্য স্থানে ছোট-বড়, হালকা-ভারি সকল বস্তুই একই সময়ে ভূমি স্পর্শ করিবে। পড়ন্ত বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য তিনটি সূত্র আছে. ( Laws of Falling Bodies ) :

(1) স্থির অবস্থা হইতে সুরু করিলে বায়ুশূন্য স্থানে সকল বস্তুই সমান দ্রুততায় পড়িতে থাকিবে।

(2) কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি পড়ন্ত জিনিস যে বেগ অর্জন করিবে, তাহা, ঐ সময়ের সমানুপাতিক।

(3) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি পড়ন্ত বস্তু যে স্থান অতিক্রম করিবে, তাহা সময়ের বর্গের সহিত সমানুপাতিক।

বায়ু-পাম্প আবিষ্কৃত হইবার পর গ্যালিলিওর কথার সত্যতা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। নিউটন ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত গিনি ও পালক পরীক্ষার দ্বারা এই সত্য স্থাপিত করেন।

**১নং পরীক্ষা**—গিনি ও পালক ( Guinea & Feather ) পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** বায়ুশূন্য স্থানে (vacuum) সকল বস্তু স্থির অবস্থা হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলে সমান দ্রুততায় পড়িবে।

**পরীক্ষার উপকরণ :**

(ক) প্রায় এক মিটার ( ১০০ সেন্টিমিটার ) লম্বা কাঁচের একটি ফাঁপা নল যাহার একমুখে একটি মুটকী এবং অন্য মুখটি প্যাচ্‌ওলা ঢাকনি দিয়া বন্ধ।

(খ) একটি পালক ও একটি ছোট মুদ্রা ( পয়সা বা আনি ) ইত্যাদি।

(গ) বায়ু নিষ্কাশক যন্ত্র ( air pump )

(ঘ) একটি কাগজের চাকতি যাহা মুদ্রাটি অপেক্ষা মাপে ঈষৎ ছোট হইবে।

## প্রণালী :

(১) পালক এবং মুদ্রাটি কাঁচের নলের ভিতর রাখা হইলে, প্যাঁচটি আঁটিয়া দিতে হইবে।

Fig. 2 গিনি ও পালক পরীক্ষা

(২) ইহার পর পাম্প করিয়া বাতাস বাহির করিয়া দিয়া মুটকীর প্যাচটি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(৩) এখন হঠাৎ নলটি উল্টাইয়া দিলে দেখা যাইবে পালকটি ও মুদ্রাটি একসঙ্গেই অপর প্রান্তে পৌঁছিয়াছে।

(৪) এখন প্যাঁচ খুলিয়া দিলে হাওয়া আসিবে এবং নলটি এবার উল্টাইলে দেখা যাইবে মুদ্রাটি আগে অন্য প্রান্তে পৌঁছিয়াছে। এইরূপ কাগজের চাকতিটি মুদ্রার উপর রাখিয়া উঁচু জায়গা হইতে নীচে ফেলিলে দুইটি একই সময়ে মাটিতে পড়িবে। কারণ মুদ্রাটির উপর কাগজ থাকায়, বায়ুর প্রতিরোধ মুদ্রা অতিক্রম করিবে। এখন যদি পাশাপাশি কাগজের চাকতি আর মুদ্রাটি ফেলা যায়, তাহা হইলে মুদ্রাটি আগে মাটি স্পর্শ করিবে এবং কাগজ-চাকতি পরে।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, **বায়ুহীন স্থানে স্থির অবস্থা হইতে সকল বস্তু সমান দ্রুততায় পড়িবে।**

**B3 সরল দোলক** ( simple pendulum ) **:** একটি ভারি ভর-বিন্দু ( point mass ) যদি ওজনহীন ( weightless ), টানিলে বাড়ে না ( inextensible ), যেমন ভাবে ইচ্ছা মুড়িতে পারা যায় ( perfectly flexible ) এমন একটি দড়িতে ঝোলান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে সরল দোলক বলে। দড়িটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আটকান থাকে এবং দোলকটি এই বিন্দুর চারিদিকে বিনা ঘর্ষণে দুলিতে পারে। দড়ির পরিবর্তে তার হইলেও চলে। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে ঠিক এই রকম নিয়ম মানিয়া চলা সম্ভব হয় না এবং সরল দোলক হিসাবে যাহা ব্যবহার করা হয়, তাহার বিভিন্ন অংশ হইল :
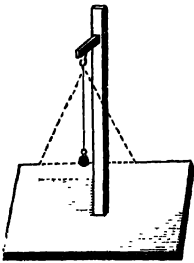
Fig. 3 সরল দোলক

(i) ধাতু ( অথবা যে কোন ভারি জিনিস ) নির্মিত একটি ছোট গোলক

(ii) ঝুলাইবার জন্য খুব সরু এবং টানিলে বাড়েনা এমন দড়ি।

[ বড় ঘড়িতে যে দোলক থাকে, তাহাকে যৌগিক দোলক ( compound pendulum ) বলে। ]

**কার্যকরী দৈর্ঘ্য** (effective length) :

যদি O বিন্দু হইতে দোলকটি ঝোলান থাকে, তাহা হইলে O এবং গোলকের ভার কেন্দ্রের ( centre of gravity ) মধ্যে যে দৈর্ঘ্য তাহাকে **কার্যকরী দৈর্ঘ্য** ( effective length ) বলা হয়।

**দোলন** ( oscillation ) : দোলকের স্থির অবস্থা যদি OA হয় তাহা হইলে একটি সম্পূর্ণ দোলন ( complete oscillation ) হইল A হইতে B, B হইতে A আবার A হইতে C এবং C হইতে A-তে ফিরিয়া আসা।
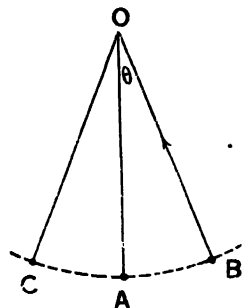
Fig. 4a দোলন

**কম্পন** ( vibration ) : A হইতে B এবং B হইতে A-তে ফিরিয়া আসা হইল একটি কম্পন।

**বিস্তার** ( amplitude ) : কম্পনের সময় A হইতে যে সর্বাধিক দূরত্ব AB অথবা AC, হইল বিস্তার।

**দোলন কাল** (period) : একটি সম্পূর্ণ দোলনের জন্য যে সময় লাগে, তাহাকে দোলন কাল বলা হয়।

**আবৃত্তি** (frequency) : এক সেকেণ্ডে যতগুলি সম্পূর্ণ দোলন হইবে, তাহাকে ঐ দোলকের আবৃত্তি বলা হয়।

n যদি আবৃত্তি হয় এবং T হয় দোলন কাল তাহা হইলে $nT=1$ অথবা

$$n=\frac{1}{T}$$

কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি $l$ হয় তাহা হইলে T, g এবং $l$-এর মধ্যে সম্পর্ক হইল

$$T=2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$$

**দোলক সূত্র** ( Laws of Pendulum ) : দোলকের চারিটি সূত্র আছে—

(i) **প্রথম সূত্র : সমকাল সূত্র** ( Law of Isochronism )। দোলকের মাধ্যম অবস্থান হইতে দুইদিকে বিস্তার যদি 4° মধ্যে থাকে, তাহা হইলে এই সূত্র

অনুসারে দোলনকাল বিস্তার নিরপেক্ষ হইবে। 4° মধ্যে বিস্তার যাহাই হউক দোলনকাল একই থাকিবে।

(ii) **দ্বিতীয় সূত্র : দৈর্ঘ্যের সূত্র :** ( Law of Length )। দোলনকাল T কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক হইবে। কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি 25, 36 বা 49 হয়, তাহা হইলে T হইবে 5, 6, বা 7।

$$T \propto \sqrt{l}$$

(iii) **তৃতীয় সূত্র : ত্বরণ সূত্র** (Law of Gravity)। দোলনকাল T সেই **স্থানের** 'g'-র বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক হইবে।

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$$

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় 'g'র তফাৎ অনুসারে T-রও তফাৎ হয়।

(iv) **চতুর্থ সূত্র : ভরের সূত্র** (Law of Mass)। কার্যকরী দৈর্ঘ্য সমান থাকিলে, দোলনকাল গোলকের ভর বা পদার্থের ( কাঠ, ধাতু, পাথর ইত্যাদি ) উপর নির্ভর করিবে না।

## ২নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** দোলক সূত্রগুলির সত্যতা প্রমাণ।

**পরীক্ষার উপকরণ :** (i) একটি হুক-লাগান কাঠের স্ট্যাণ্ড।

(ii) একটি ছোট ধাতব গোলক যাহাতে সুতা লাগাইবার ব্যবস্থা আছে।

(iii) মিহি শক্ত সুতা। ইহাতে গোলকটি বাঁধিয়া স্ট্যাণ্ডের হুকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

(iv) স্লাইড ক্যালিপার ( slide callipers )

(v) মাপিবার স্কেল—সেন্টিমিটার স্কেল।

**প্রথম সূত্রের প্রমাণ :**

**প্রণালী :**

(i) গোলকটি একপাশে সরাইয়া খুব আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দাও যাহাতে বিস্তার 4° ভিতর থাকে।

(ii) এখন একটি স্টপ-ঘড়ির ( stop watch ) সাহায্যে কয়েকটি (মনে করা যাক 25) সম্পূর্ণ দোলনের সময় দেখিয়া রাখ।

ধরা যাক 25-টি দোলনের জন্য 30 সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছে। তাহা হইলে দোলনকাল হইল $\frac{30}{25}$।

(iii) এমনি করিয়া 4°-র ভিতর বিভিন্ন বিস্তারে গোলকটি দুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে দোলনকাল প্রত্যেকবারই এক হইবে। অতএব প্রমাণিত হইল যে, **দোলনকাল বিস্তার নিরপেক্ষ।**

## দ্বিতীয় সূত্রের প্রমাণ :

প্রণালী :

(i) স্লাইড ক্যালিপারের সাহায্যে গোলকটির বিভিন্ন জায়গার ব্যাস মাপিয়া রাখ। ব্যাস হইতে ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য লিখিয়া রাখ।

(ii) যে দড়িটিতে গোলকটি বাঁধা আছে, তাহার দৈর্ঘ্য মাপিয়া রাখ। ইহার সহিত ব্যাসার্ধ যোগ করিলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য পাওয়া যাইবে।

(iii) কয়েকটি সম্পূর্ণ দোলনের সময়ও দেখিয়া রাখ এবং তাহা হইতে দোলনকাল বাহির কর।

(iv) এবার সুতার দৈর্ঘ্য কিছু কমাইয়া পুনরায় উহার কার্যকরী দৈর্ঘ্য বাহির কর।

(v) বিভিন্ন কার্যকরী দৈর্ঘ্যের জন্য বিভিন্ন দোলনকাল T নির্ধারণ কর।

(vi) প্রতিবারের কার্যকরী দৈর্ঘ্য দিয়া T-র বর্গকে ভাগ করিলে নিত্যসংখ্যা হইবে।

$$\frac{T^2}{l} = \text{নিত্যসংখ্যা}$$

$$\text{অথবা } T \propto \sqrt{l}$$

অতএব প্রমাণিত হইল যে, **দোলনকাল T কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক।**

## তৃতীয় সূত্রের প্রমাণ :

প্রণালী :

(i) পৃথিবীর উপর বিভিন্ন জায়গায় অথবা একই জায়গায় বিভিন্ন উচ্চতায় দোলকটির দোলন-কাল নিরূপণ কর।

(ii) সেই জায়গার $\sqrt{g}$-র সহিত T গুণ কর
দেখা যাইবে যে $T \times \sqrt{g}$ = নিত্যসংখ্যা

অতএব প্রমাণিত হইল যে, $T \propto \frac{1}{\sqrt{g}}$ ।

## চতুর্থ সূত্রের প্রমাণ

প্রণালী :

( i ) ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গোলক নাও।

( ii ) ভিন্ন ভিন্ন মাপের গোলক নাও।

( iii ) এখন কার্যকরী দৈর্ঘ্য প্রতিবার সমান রাখিয়া এক একটি গোলকের সাহায্যে দোলনকাল T বাহির কর। দেখা যাইবে T প্রতিবারই সমান হইতেছে।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, **দোলন কাল** T

( i ) **গোলকের পদার্থ-নিরপেক্ষ**

( ii ) **গোলকের আকার-নিরপেক্ষ।**

৩নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** সরল দোলকের সাহায্যে কোন জায়গার **অভিকর্ষজাত ত্বরণ** 'g'-র পরিমাণ নির্ধারণ করা, এবং একই জায়গায় বিভিন্ন বস্তুর 'g' এক তাহা প্রমাণ করা।

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$$

**পরীক্ষার উপকরণ :** ২নং পরীক্ষার সমস্ত উপকরণ।

**প্রণালী :**
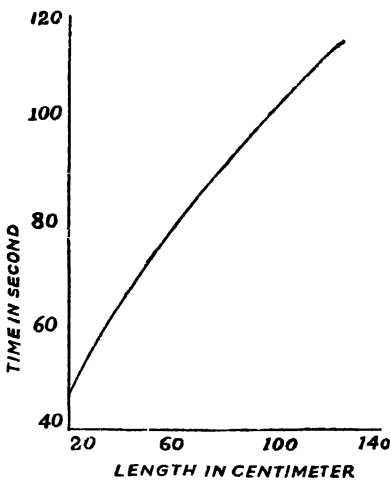
Fig. 4b গ্রাফ হইতে 'g'-র মূল্য

( i ) যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে গোলকের ব্যাসার্ধ এবং সূতার দৈর্ঘ্য মাপিয়া 'l' বাহির করিতে হইবে।

( ii ) এখন স্টপ ঘড়ির সাহায্যে পূর্বের মত T বাহির করিবে।

( iii ) উপরে $\frac{l}{T^2}$ এই জায়গায় $l$ এবং T-র মূল্য বসাইয়া, এবং $\pi$ = 3·14 ধরিলে 'g'-র মূল্য বাহির করা যাইবে।

( iv ) আমরা ২নং পরীক্ষায় দেখিয়াছি যে $\frac{l}{T^2}$ নিত্যসংখ্যা।

একটি গ্রাফ কাগজে বিভিন্ন l এবং T-র মূল্য বসাইলে যে কোন $\frac{l}{T^2}$ ধরিয়া 'g'-র মূল্য বাহির করা যাইবে (Fig. 4)।

(v) বিভিন্ন পদার্থের কিন্তু একই মাপের গোলক লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে '$l$' সমান থাকিলে T সমান থাকিবে, অতএব 'g'-র কোন পরিবর্তন হইবে না।

অতএব প্রমাণিত হইল যে,

(i) $g=4\pi^2\frac{l}{T^2}$ **এবং (ii) $l$ ও T সমান থাকিলে গোলকের পদার্থের উপর 'g' নির্ভর করিবে না।**

মোটামুটি ভাবে 'g' র মূল্য ধরা হয় 981 প্রতি (সেকেণ্ড)²

**B4·1 ভারকেন্দ্র** (Centre of Gravity), **সাম্য অবস্থা** (States of equilibrium) :

কোন একটি বস্তুকে বহু বস্তুকণার সমষ্টি বলা যাইতে পারে। ঠিক যেমন মিহিদানা কি দরবেশের গোল্লাটি ভাঙ্গিলে ছোট ছোট দানা পাওয়া যায় প্রায় তেমনি। পৃথিবীর অভিকর্ষ বল যখন কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে, তখন প্রতিটি বস্তুকণার উপর এই বলের ক্রিয়া হয়। আমরা যখন কোন বস্তুর ওজন লইয়া থাকি, তখন আসলে প্রতিটি বস্তুকণার উপর অভিকর্ষ বলের ক্রিয়ার দরুণ যে লব্ধি (resultant) বল দেখা দেয়, তাহাই লই (Fig. 5)।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 4000 মাইল। সেই কারণে পৃথিবীর উপরের কোন বস্তুর কণাগুলি ও পৃথিবীর মাঝে যে আকর্ষণ বল আছে, তাহারা পরস্পরের সমান্তরাল এবং বস্তুকণার ভরের সমানুপাতিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।
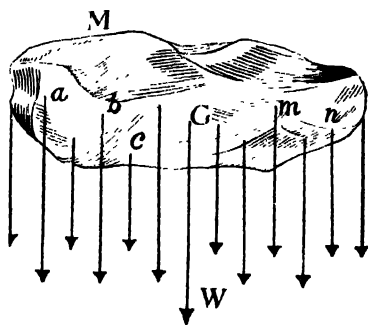
Fig. 5 বস্তুকণার সমষ্টি

এই বল পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী অর্থাৎ সোজা নিম্নমুখী।

বস্তুর ওজনের ক্রিয়া রেখা (line of action) বস্তুর ভিতরে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর ভিতর দিয়া অতিক্রম করে। এই বিন্দুকে (G) ভারকেন্দ্র (centre of gravity : c. g.) বলে। ধর একখানি পাতলা বই একটি টেবিলের ধারে রাখা হইয়াছে। বইখানি ঠেলিতে থাকিলে কোন এক সময় সেটি পড়িয়া যাইবে। পড়িয়া

যাইবার ঠিক পূর্বে যে অবস্থা, সেই অবস্থায় বই আর টেবিলের স্পর্শের জায়গা বরাবর একটি সরল রেখা টানিলে সেই রেখাটি ক্রিয়া-রেখা ( line of action ) হইবে। এখন অন্য ভাবে বইটি ঘুরাইয়া লইলে পূর্বের মত আর একটি রেখা টানিতে পারা যাইবে। এই দুইটি সরল রেখা যেখানে পরস্পরকে স্পর্শ করিবে, সেইটি হইল ভার কেন্দ্র। বস্তুর ওজনের ক্রিয়া রেখা যে নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়া গিয়া থাকে তাহাই হইল ভার-কেন্দ্র। সাধারণতঃ বস্তুর ভার কেন্দ্র বস্তুর ভিতরেই থাকে। কিন্তু ফাঁপা জিনিস—যেমন ফাঁপা বল, রিং,—হইলে উহা বস্তুর বাহিরেও থাকে।

**সাম্য ( equilibrium )।** দুইটি বা তাহার অধিক বল যখন পরস্পরকে প্রশমিত ( balance ) করে, তখন কোন বস্তু সাম্য ( equilibrium ) অবস্থায় থাকে। একটি বাক্স যখন টেবিলের উপর স্থির হইয়া রহিয়াছে, তখন বাক্সটির ওজন এবং টেবিলের প্রতিক্রিয়া পরস্পরকে প্রশমিত করিতেছে। বাক্সের ওজন বাক্সের ভার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া নিম্নমুখে ক্রিয়া করিতেছে এবং টেবিলের প্রতিক্রিয়া ভার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বমুখে ক্রিয়া করিতেছে।

ভার কেন্দ্রের ঠিক নীচে যদি অবলম্বন ( Support ) দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে কোন বস্তু স্থির থাকিবে।

দুইটি বিন্দুতে অবলম্বন দিলে যদি কোন বস্তু সাম্য অবস্থা পায়, তাহা হইলে ভারকেন্দ্রের ভিতর দিয়া যে লম্বরেখা আঁকিতে পারা যাইবে, তাহার উপর বিন্দু দুইটি পড়িবে।

এইরূপ যদি তিনটি বিন্দুতে অবলম্বন দিলে কোন পদার্থ সাম্য অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ঐ তিনটি বিন্দুকে পরস্পর যুক্ত করিলে যে ত্রিভুজ (BAC) হইবে ভারকেন্দ্রের মধ্য দিয়া আঁকা লম্বরেখা ঐ ত্রিভুজের ভিতর দিয়া যাইবে। তিনের অধিক বিন্দু হইলে বিন্দুগুলিকে যোগ করিয়া যে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাইবে, তাহার ভিতর দিয়া লম্বরেখাটি যাইবে। এই ক্ষেত্রফলকে ( বা ত্রিভুজকে ) পদার্থের ভূমি ( base ) বলা হয়। লম্বরেখা এই ভূমির বাহিরে পড়িলে পদার্থের সাম্য অবস্থা নষ্ট হইয়া যায়।
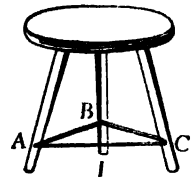
*Fig.* 6 ত্রিভুজ

**B4·2 সাম্য অবস্থা দুই প্রকারের হইতে পারে ঃ** গতি সাম্য এবং স্থিতি সাম্য।

**গতি সাম্য ঃ** ( Equilibrium of Motion ) : একটি গোল চাকা ( ring ) গড়াইয়া দিলে ঠিক চলিতে থাকে, কিন্তু থামিলেই পড়িয়া যায়। লাট্টু যখন ঘোরে, তখন দাঁড়াইয়া থাকে, থামিলে কাত হইয়া পড়ে।

**স্থিতি সাম্য :** ( Equilibrium of rest ) স্থিতি সাম্যের আবার তিন প্রকার অবস্থা হইতে পারে। (i) সুস্থিত ( stable equilibrium ), (ii) দুঃস্থিত ( unstable equilibrium ), (iii) নিরপেক্ষ ( neutral equilibrium)।

ছবিতে ( Fig. 7 ) একটি চোঙার তিন রকম অবস্থা দেখান হইয়াছে।
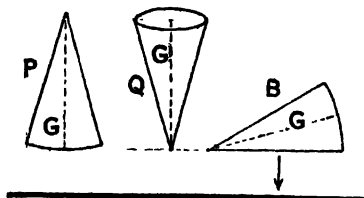
Fig. 7 তিন প্রকার সাম্য

(i) সুস্থিত অবস্থায় চোঙাটি সহজে পড়িতে চাহিবে না। নাড়া দিলেও পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

(ii) দুঃস্থিত অবস্থায় সামান্য নাড়া দিলেই চোঙাটি পড়িয়া যাইবে, পূর্বের অবস্থায় ফিরিবে না।

(iii) নিরপেক্ষ অবস্থায় চোঙাটি গড়াইয়া তাহার পূর্বের অবস্থায় ফিরিবে না বটে, কিন্তু প্রায় আগের জায়গাতেই নূতন অবস্থায় স্থির হইয়া থাকিবে।

## B5·1 দণ্ড তুলা ( Beam Balance )

**ভরের পরিমাণ** ( Measurement of Mass ) কোন পদার্থের ভর কতটা তাহা তুলার ( balance, দাঁড়িপাল্লা ) সাহায্যে স্থির করা যায়। মুদিখানায় হাটে বাজারে সর্বত্রই দাঁড়ি পাল্লা ব্যবহার করা হয়। একই জায়গায় অভিকর্ষজ ত্বরণ সমান বলিয়া দুইটি বস্তুর ভর সমান হইলে, উহাদের ওজনও সমান হইবে। কোন জিনিস কিনিবার সময় বা বিক্রী করিবার সময় তাহার ওজন অজানা হইলে জানা কোন নির্দিষ্ট ওজন দাঁড়ি-পাল্লায় রাখিয়া তাহার সহিত তুলনা রাখিয়া অজানা বস্তুর ওজন বাহির করা হয়।

**দণ্ডতুলা** ( beam balance ) : দাঁড়ি পাল্লায় নিম্নলিখিত অংশগুলি প্রধান : একটি অনুভূমিক দণ্ড যাহার দুই প্রান্ত হইতে দড়ি বা চেনের সাহায্য দুইটি পাত্র ( থালার মত বা বাটির মত ) ঝোলান থাকে। দণ্ডটি মাঝখানে একটি গোঁটার দুইপাশে ঘুরিতে পারে এবং এই জায়গায় একটি কাঁটা (pointer) থাকে, কোন জিনিস না থাকিলে দণ্ডটি ভূমির সমান্তরাল হইবে। একটি পাত্রে ( বামদিকে ) যে বস্তুটির ওজন বাহির করিতে হইবে সেইটি রাখিতে হইবে, অন্য পাত্রে একে একে জানা ওজনগুলি এক এক করিয়া রাখিতে হইবে। যখন দণ্ডটি অনুভূমিক হইবে, তখন দুই দিকের ওজন সমান হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

দাঁড়ি পাল্লা একটি প্রথম শ্রেণীর লিভার। মাঝের খুঁটি হইল আলম্ব ( fulcrum ) এবং তাহার দুই পাশের দণ্ড হইল দুই বাহু। দুইদিকের ওজন সমান হইলে একদিকের বাহু দৈর্ঘ্য × সেইদিকের ভর = অন্যদিকের বাহু দৈর্ঘ্য এবং সেইদিকের ভর। দুইদিকের দড়ি বা চেন ঝোলান পাত্র দুইটি সমান ওজনের থাকে। এবং দণ্ডের মাঝখানে আলম্ব থাকায় বাহু দৈর্ঘ্য দুইদিকে সমান, অতএব একদিকে পাত্রের উপর রাখা বস্তুর ওজন = অন্যদিকে পাত্রের উপর রাখা বাটখারার ওজন

নির্ভুল ওজনের জন্য ব্যবহৃত ভাল দাঁড়ি পাল্লায় নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে : ·

(1) **দাঁড়ি (Beam)**—সাধারণতঃ এটি একটি অনুভূমিক দণ্ড (B), ধাতু নির্মিত হয়। দাঁড়ির মাঝখানে ইস্পাত বা আগেট ( agate ) দিয়ে তৈরী একটি ক্ষুরধার ( knife edge ) আছে। এইটি আলম্ব ( fulcrum ) এবং দাঁড়িটি এই আসনে বসান থাকে। একটি লম্ব থামের ( vertical pillar ) উপর একটি ছোট ইস্পাতের পাতের উপর আবার এই ক্ষুরধার বসান থাকে। দাঁড়ির দুই প্রান্তে আবার আর দুইটি agate নির্মিত ক্ষুরধার থাকে।

(2) **স্টিরাপ ( Stirrup )**—দাঁড়ির দুই প্রান্তের ক্ষুরধারের উপর দুই উল্টান Λ র মত স্টিরাপ থাকে। ইহা হইতে পাল্লা ঝোলান হয়।

(3) **পাল্লা (scalepans)**—ওজন করিবার জিনিস এবং বাটখারা যে দুইটি পাত্রে রাখা হয়, সেই দুইটিকে পাল্লা (S,S) বলে। এই দুইটির ওজন সমান থাকে, যাহাতে কোন জিনিস না থাকা অবস্থায় দুই দিকের পাল্লা সমান ভাবে থাকে।

Fig. ৪ দণ্ডতুলা

(4) **নির্দেশক কাঁটা (pointed )**—কাঁটার উঁচু দিকটি দণ্ডের ঠিক মাঝখানে আটকান থাকে এবং তলার দিকটি বিনা বাধায় দুলিতে পারে। লম্ব থামের গোড়ায় একটি স্কেলের ( scale ) ঠিক উপরে কাঁটাটি এদিক ওদিক নড়িতে পারে।
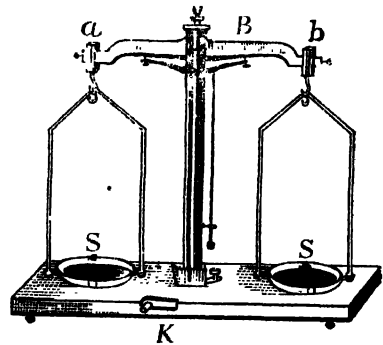
(5) **হাতল ( handle ) :** সাধারণতঃ একটি কাঠের পাটাতনের উপর থাম সমেত দাঁড়ি পাল্লাটি বসান থাকে। একটি হাতল (K) এই পাটাতনের গায়ে লাগান

থাকে এবং থামের সঙ্গে ইহার যোগ থাকে। হাতল ঘুরাইলে থামটি ওঠে এবং নামে। উঠিলে দাঁড়ি পাল্লা বিনা বাধায় দুলিতে থাকে, এবং নামিলে থামিয়া যায়।

Fig. 9 ওজনের বাক্স

(6) **ওলনদড়ি** (plumb line) থামটি ঠিক লম্ব আছে কিনা দেখিবার জন্যে একটি ওলনদড়ি উহার পাশে ঝোলান থাকে।
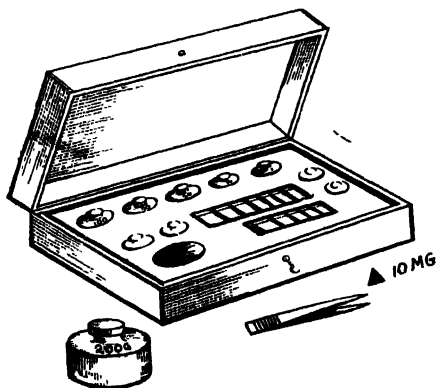
(7) **রোহী** ( rider ) 10 miligram ওজনের একটি সরু তারের প্যাঁচান টুকরাকে রোহী বলে। আলম্বের দুই পাশে দণ্ডের দুইভাগকে বাহু ( arm ) বলে। এই বাহু দুইটির প্রতিটি 1, 2, 3, 4 সমান করিয়া দশ ভাগে ভাগ করা থাকে। এই ভাগের যে দাগটির উপর রোহীকে বসান হইবে, সেই দিকের ওজনের 10 miligram যোগ করিতে হইবে। যদি 5 দাগের উপর রোহীকে বসান হয়, তাহা হইলে 5 mgm যোগ হইবে।

(8) **ওজনের বাক্স** ( weight box ) যদিও ইহা দাঁড়ি পাল্লার সহিত যুক্ত নহে তবুও ইহাকে দাঁড়ি পাল্লার অংশ হিসাবেই ধরিতে হয়। সাধারণতঃ একটি কাঠের বাক্সে ছোট বড় নানা রকম খোপ খোপ করা থাকে। বাটখারাগুলি গ্রাম এবং গ্রামের ভগ্নাংশে ভাগ করা থাকে। গ্রামের বাটখারাগুলি পিতলের এবং ভগ্নাংশগুলি এলুমিনিয়ামের হয়। ( অবশ্য অন্য ধাতুরও হইতে পারে )। বাটখারা গুলি তোলার জন্যে একটি চিমটে দেওয়া থাকে, কারণ অনবরত হাত দিয়া তুলিলে ঘাম ময়লা ইত্যাদি লাগিলে ওজনের তারতম্য হইয়া যাইবে। তাছাড়া ছোট বাটখারাগুলি হাত দিয়া তুলিবার অসুবিধাও আছে।

(9) **ওজন করিবার পদ্ধতি :** লম্ব থামের নীচে যে স্কেল আছে তাহার মধ্য-বিন্দু শূন্য চিহ্নিত থাকে এবং শূন্যের দুই পাশে 1, 2, 3, 4, করিয়া সমান সংখ্যায় ভাগ করা থাকে। কাঁটা না দুলিলে এবং দাঁড়ি পাল্লা ঠিক থাকিলে কাঁটার মুখ ঠিক শূন্যে থাকিবে। এখন, ওজন করিবার সময় বামদিকের পাত্রে ওজন করিবার বস্তুটি রাখিতে হইবে এবং অন্য পাত্রে বাটখারা রাখিতে হইবে। এখন হাতল ঘুরাইয়া থামটি তুলিলে কাঁটা দুলিতে থাকিবে। যদি দুই পাত্রের ওজন সমান হইয়া থাকে

তাহা হইলে কাঁটা শূন্যের দুইপাশে সমান ভাগ অতিক্রম করিয়া দুলিবে। ওজন কম বেশী হইলে **যেদিকের ওজন বেশী হইয়াছে কাঁটা তাহার উল্টা দিকে বেশী 'ভাগ' অতিক্রম করিবে।** যদি বাটখারার দিক বেশী হয় তাহা হইলে বাটখারা কমাইতে হইবে, যদি জিনিসের দিক বেশী হয়, তাহা হইলে বাটখারা আরও লাগিবে।

**B5·2 স্প্রিং তুলা** ( spring balance ) **:** একটি স্প্রিংকে টানিলে বাড়ে। এই বৃদ্ধি বলের ( বা ওজনের ) সমানুপাতিক হয়। স্প্রিং তুলার সাহায্যে এই নিয়মের উপর ভিত্তি করিয়া পদার্থের ওজন নির্ধারণ করা হয়।

**স্প্রিং তুলার অংশ :**—একটি ধাতুনির্মিত খাপের মধ্যে একটি পাক-দেওয়া স্প্রিং থাকে (S)। খাপটির পেছন দিকটা একটি নলকে লম্বা দিকে কাটলে যেমন হয় তেমনি গোল আর সামনে একটি পাতলা ঢাকা দেওয়া। এই ঢাকার মাঝখান বরাবর লম্বা করে চেরা আছে।

ঢাকনার উপর দিকে একটি আংটায় স্প্রিংটি টাঙান থাকে এবং স্প্রিংটির নীচে একটি হুক একটি লম্বদণ্ড থেকে ঝুলান হয়। একটি কাঁটা স্প্রিংএর উপর দিকে লাগান আছে এবং স্প্রিং নড়িলে উহা নড়িতে পারে। যাহা ওজন করিতে হইবে তাহা ঐ হুকে আটকাইয়া দেওয়া হয়। লম্বা চেরা ছিদ্রটির পাশে উপরের ঢাকনার গায়ে একটি স্কেল আছে।
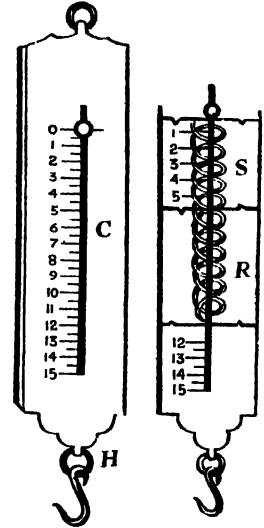
Fig. 10 স্প্রিং তুলা

**ওজন করিবার পদ্ধতি :** জানা ওজন হুকে ঝুলাইয়া কাঁটার সাহায্যে নির্দিষ্ট জায়গায় দাগ দিয়া স্কেলটিকে ঠিক করা হয়। পরে অজানা ওজন মাপিবার সময় কাঁটার সাহায্যে স্কেল হইতে জানা যায় জিনিসটি কয় সের বা কয় গ্রাম বা কয় পাউণ্ড।

## B6 নিউটন এবং মহাকর্ষ-সূত্র
## (Newton and the Law of Gravitation)

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই সূত্র অনুসারে 'মহাজগতের প্রতিটি পদার্থকণা অপর পদার্থকণাকে তাহাদের সংযোজক সরল-

রেখা বরাবর একটি বলের দ্বারা আকর্ষণ করে। এই বলের পরিমাণ হইল পদার্থ দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাহাদের মধ্যে যে সরলরৈখিক দূরত্ব উহার বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।' এই সূত্রের বিশেষ তাৎপর্য আছে। মহাকর্ষ এই মহাজগতের প্রতিটি পদার্থের মাঝে বর্তমান। যেমন পৃথিবীর বুকের উপর সবুজ ফলটি গাছ থেকে মহাকর্ষের দরুণ খসিয়া পড়িল, তেমনি ঐ ছোট্ট ফলটিও পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিল। কিন্তু পৃথিবীর ভর বহুগুণ বেশী হওয়ায় তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ, আর ফলের ভর কম হওয়ায় মহাকর্ষের প্রভাব বুঝিতে পারা গেল না। তেমনি পৃথিবী, সূর্য, সকল গ্রহ উপগ্রহ, তারা নক্ষত্র সকলের মাঝেই এই মহাকর্ষ অহরহঃ ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে। সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে আবার পৃথিবী করিতেছে সূর্যকে। সুদূর নীহারিকা আর সূর্যের মাঝেও বর্তমান মহাকর্ষের বিপুল আকর্ষণ।
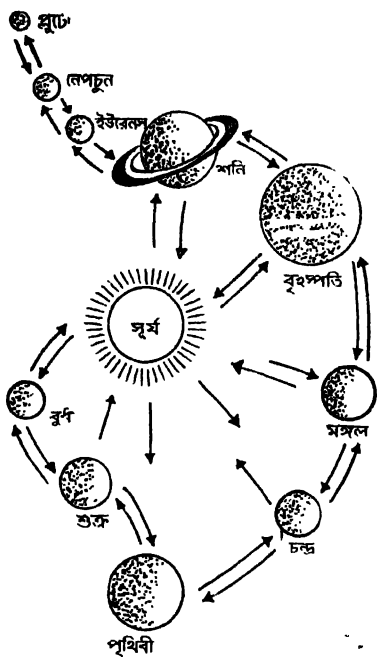
Fig. 11 মহাকর্ষের ক্রিয়া

## B7·1 সৌরজগৎ ও নিউটনের নিয়ম

### ( Solar System according to Newton's law )

**সৌরজগৎ :** রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—

'তোমাতে রয়েছে কত শশী-ভানু
হারায় না কভু অণু পরমাণু।'

আমরা ভাবিয়া থাকি আমাদের নীল আকাশের একটি সূর্য আর একটি চন্দ্রই সব। কিন্তু আসলে কবির গানের কথাই সত্য—এই মহাকাশে

কত চন্দ্র সূর্য যে আছে তা আমরা সঠিক আজও জানি না, অনুমান করা হয় মাত্র।

যে সূর্যকে আমরা দেখি তাহার আলোতেই আমাদের পৃথিবী আলোকিত হয়। আমাদের পৃথিবী হইল সূর্যের (star) একটি গ্রহ (planet) আর চন্দ্র হইল একটি উপগ্রহ (satellite)।

সূর্যের তাপ এবং আলোক দেবার শক্তি থাকে। সূর্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসা অংশ হইল গ্রহ। ইহারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং আলোক ও তাপ দেবার ইহাদের নিজস্ব কোন শক্তি থাকে না। গ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে উপগ্রহ—যেমন চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছে পৃথিবীকে। হাদেরও তাপ এবং আলোক দেবার শক্তি থাকে না।

একটি সূর্যকে ঘিরিয়া বহু গ্রহ এবং উপগ্রহ থাকে। এই সমস্ত মিলাইয়া একটি সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়।

**7·2 সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহবৃন্দ**—ছোট বড় মিলাইয়া প্রায় একহাজার গ্রহ বিভিন্ন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সূর্যের পর পর প্রধানগুলি হইল **বুধ** (Mercury), **শুক্র** (Venus), **পৃথিবী** ( Earth ), **মঙ্গল** (Mars), **বৃহস্পতি** (Jupiter ), **শনি** ( Saturn ), **অরুণ** ( Uranus ইউরেনাস ), **বরুণ** ( Neptune ) ও **কুবের** ( Pluto প্লুটো )।
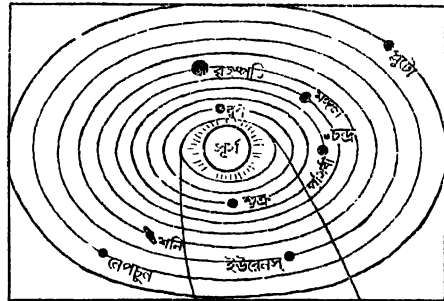
Fig. 12 সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহবৃন্দ

পৃথিবী ও নেপচুনের উপগ্রহের সংখ্যা এক, মঙ্গলের দুইটি, ইউরেনাসের চারিটি, বৃহস্পতি ও শনির যথাক্রমে নয় ও দশটি করিয়া উপগ্রহ আছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে প্রায় ছয়শত ক্ষুদ্র গ্রহ একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের গ্রহাণুপুঞ্জ ( Asteroid ) বলা হয়।

**গ্রহের গ্রহণীয় তথ্য :** i. দেখা গিয়াছে যে সকল গ্রহ সূর্যকে একই দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

ii. গ্রহগুলি একই স্তরে ( সমান স্তরে ) ঘুরিতেছে যদিও উহাদের কক্ষপথ ( Orbit ) বিভিন্ন।

iii. গ্রহগুলির কক্ষপথ প্রায় বৃত্তাকার, কিন্তু সম্পূর্ণ বৃত্তাকার নয়। উহা ডিমের মত ( oval ) বা ইলিপ্‌টিকাল ( elliptical )।

iv. আপন অক্ষের চারিদিকে সূর্যের গতির যে দিক তাহা গ্রহগুলির প্রদক্ষিণ দিকের সহিত সমান।

v. গ্রহগুলি আবার আপন অক্ষের চারিদিকে এবং উপগ্রহগুলি গ্রহের চারিদিকে ঐ একই দিকে ঘুরিয়া চলিয়াছে।

vi. বিশাল সৌরজগতের অংশ প্রতিটি গ্রহ তাহার উপগ্রহের সহিত মিলিয়া যেন একটি ছোট সৌরজগতের সৃষ্টি করে।

বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহগুলির চালচলনের এত মিল দেখিয়া মনে করেন যে, গ্রহগুলি একই সময়ে একই ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্যও এর মাঝেই আছে।

**B7·3 সৌরজগতের বিস্তার :** সৌরজগতের বিস্তার কতখানি তাহা প্রায় আমাদের কল্পনার অতীত। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব 93,০০০০০০ মাইল।

সূর্যকে যদি মনে করা যায় 6 ইঞ্চি ব্যাসের একটি বল তাহা হইলে সূর্য হইতে বুধ ( Mercury ), শুক্র ( Venus ), পৃথিবী ( Earth ) এবং মঙ্গলের ( Mars ) দূরত্ব হইল যথাক্রমে 7, 13, 18, 27 গজ এবং ঠিক একটা আলপিনের মাথার মত ইহাদের দেখিতে লাগিবে। বড় বড় গ্রহ বৃহস্পতি ( Jupiter ), শনি ( Saturn ), অরুণ ( Uranus ), বরুণ ( Neptune ), ইহাদের কড়াইশুঁটির দানার মত দেখিতে লাগিবে এবং ইহাদের দূরত্ব হইল 90, 170, 350, এবং 540 গজ। কুবের ( Pluto ) থাকিবে 700 গজ দূরে এক বিন্দু রূপার মত।

কেপ্‌লার নামে একজন জার্মান জ্যোতির্বিদ্‌ 1571 খৃষ্টাব্দে গ্রহ উপগ্রহের গতির প্রতি প্রযোজ্য কতকগুলি নিয়ম স্থির করেন। নিয়মগুলি হইল :

i. গ্রহগুলির কক্ষপথ বৃত্তাকার নয়, ইলিপ্‌টিকাল (elliptical) এবং দুইটি ফোসাই (focii)-এর একটিতে আছে সূর্য।

ii. যখন সূর্যকে ঘিরিয়া একটি গ্রহ ঘুরিতে থাকে, তখন তাহাদের যুক্ত করে যে সরলরেখা তাহা সম-সময়ে সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করিবে। তাহার মানে সূর্যের কাছাকাছি অবস্থানের সময় গ্রহগুলিকে দ্রুততর বেগে ঘুরিতে হইবে।

iii. সূর্য হইতে একটি গ্রহের যে দূরত্ব এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে গ্রহটির যে সময় লাগে উভয়ের মধ্যে একটি নিত্য সম্পর্ক (constant relation) আছে।

এখন এই তিনটি নিয়ম হইতে বোঝা যায় যে, সৌরজগতে আকর্ষণের কেন্দ্র হিসাবে সূর্যকেই ধরা হইয়াছে। কিন্তু মহাকর্ষ সূত্রের আবিষ্কারের পর দেখা যাইতেছে যে কেপ্‌লারের নিয়মগুলির কিছু অদলবদল হইবে, কারণ মহাকর্ষ সূত্র বলিতেছে প্রতিটি পদার্থ অপর পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহার ফলে নিয়মগুলি আর অত সরল থাকিবে না; কারণ গ্রহগুলির উপর গ্রহান্তরের প্রভাবও ধরিতে হইবে।

কেপ্‌লারের নিয়ম এবং মহাকর্ষ সূত্র একত্র করিবার ফলে বহু অজানা গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে।

**নেপচুনের সন্ধান :** ইউরেনাস আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তখনও নেপচুনের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। দেখা গেল, কেপলারের নিয়ম অনুসারে ইউরেনাসের যে ভাবে চলা উচিত ছিল ঠিক সে ভাবে চলে না। তখন মনে করা হইল যে অন্য কোন গ্রহের উপস্থিতির জন্যই এইরূপ ঘটিতেছে। দুইজন জ্যোতিবিদ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া অনেক অঙ্ক কষিয়া অজানা গ্রহ নেপচুনকে আবিষ্কার কবিলেন এবং আরও পরে 1930 খৃষ্টাব্দে মহাকাশে প্লুটোর সন্ধান পাওয়া যায়।

**B7·4 জোয়ার ভাঁটা :** প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মধ্যে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সমুদ্রজলের বাড়া-কমাও একটি বিস্ময়কর জিনিস। জল যখন বাড়িয়া থাকে, তখন জোয়ার বলা হয় এবং জল কমিয়া যাওয়াকে ভাঁটা বলে।

মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে সকল পদার্থ অন্য সকল পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। যদিও সূর্য চন্দ্র হইতে বিশাল, তথাপি চন্দ্রের আকর্ষণই প্রবল হইয়া থাকে।

চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যখন পৃথিবীর যে অংশটি চন্দ্রের মুখোমুখি হইতেছে সেই অংশের যাবতীয় পদার্থ চন্দ্রের বিপুল আকর্ষণ অনুভব করিতেছে। এখন কঠিন পদার্থের অণুগুলি খুব শক্ত করিয়া পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা বলিয়া মাটি উঁচু হইয়া ওঠে না, কিন্তু জল ফুলিয়া ওঠে। মহাসমুদ্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তাই যে অংশে চন্দ্র আকষণ করিতেছে, (Fig. 13a) পৃথিবীর সেই অংশে অন্য জলরাশি ছুটিয়া আসে ও জল বৃদ্ধি হয়। ইহাকে **জোয়ার** বলে। যে অংশের জলরাশি ছুটিয়া আসিল সেই অংশে তখন **ভাঁটা** হয়। **অমাবস্যার সময়** সূর্য ও

চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে থাকে (Fig. 13b)। ইহার ফলে চন্দ্র ও সূর্যের মিলিত আকর্ষণ পৃথিবীর সেই অংশের উপর ক্রিয়া করে। এই জোয়ারকে **ভরা কটাল**
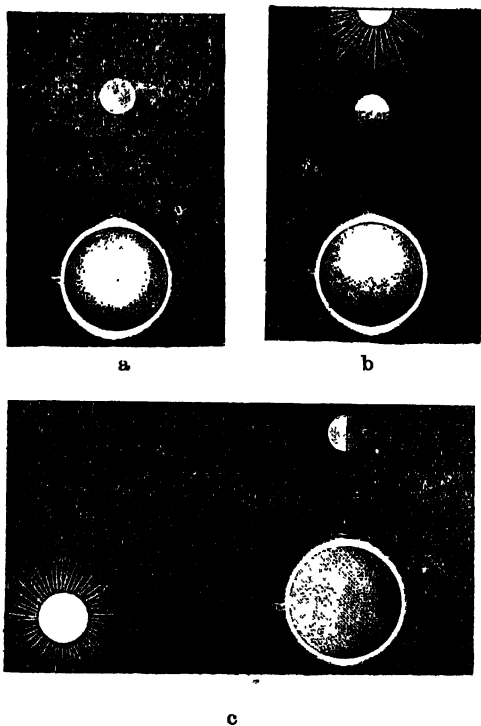
Fig. 13 জোয়ার-ভাটা

বা তেজ কটাল ( spring-tide ) বলে। **পূর্ণিমার** সময়ে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর দুই দিকে থাকিয়া জলরাশিকে আকর্ষণ করে, এই সময়ও ভরা কটাল হয়।

**অষ্টমী** তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র পরস্পরের সহিত লম্ব থাকে বলিয়া জোয়ারের তেজ কম হয় এবং ইহাকে মরা কটাল (neap tide) বলে (Fig. 13c)। পৃথিবীর যে পৃষ্ঠ চন্দ্রের সামনে থাকিতেছে সেই অংশের জোয়ারকে **মুখ্য জোয়ার** বলে। পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের জলরাশির ব্যবধান হইল ৪০০০ মাইল ( পৃথিবীর ব্যাস ) সেইজন্য জলরাশির নিম্নের যে স্থল তাহাতে চন্দ্রের আকর্ষণ এবং ক্রিয়া করিলেও এই জলরাশির উপর বিশেষ ক্রিয়া করে না। এইজন্য এই স্থানেও জোয়ার হইয়া থাকে, তাহাকে বলে **গৌণ জোয়ার**।

পৃথিবী যে তাহার অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতেছে ইহাতে একটি অপকেন্দ্র বলের (centrifugal force) সৃষ্টি হইতেছে। ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশির উপর এই বলের ক্রিয়ার দরুণ জলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে চায় এবং জোয়ার সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

## B7·5 কৃত্রিম উপগ্রহ ও ওজন শূন্য অবস্থা

### (Artificial Satellites and Weightless State)

অজানা মহাশূন্যের রহস্য জানিবার ইচ্ছা মানুষের চিরদিনের। রামায়ণের পুষ্পক রথ আর আমাদের বেলুন, এয়ারোপ্লেন, রকেট ( হাউই )-- এদের সব কিছুরই পিছনের ইচ্ছাটা কিন্তু একই—উঁচুতে ওঠা, আরও উঁচুতে। গ্রহ গ্রহান্তরের খবর পাইতে আমরা উৎসুক। নক্ষত্রলোকের বহু তথ্য সঠিক জানিবার পথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বাধা সৃষ্টি করিয়া আছে, তাহাকে ভেদ করিবার জন্য আমরা ব্যস্ত।

রাশিয়া এবং আমেরিকা কৃত্রিম উপগ্রহ (artificial satellite) বা কৃত্রিম চন্দ্র শূন্যে পাঠাইবার তোড়জোড় বহুদিন হইতেই করিতেছিল। 1957 জুলাই মাস হইতে 1958 ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক বৎসরের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল এই কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপার। 1957 সালের 4th অক্টোবর রুশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশে 'স্পুটনিক' ( Sputnik = traveller = যাত্রী ) উড়াইয়া মানুষের বহু যুগের স্বপ্নকে সত্য করিল।

রুশদের ছাড়া প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (Sputnik I) একটি ফাঁপা গোলক যাহার ওজন হইল 83·6 kg, ব্যাস হইল 58 cm। ইহার কক্ষপথ ইলিপ্‌টিকাল (elliptical) এবং পৃথিবী একটি ফোসাই (focii)-এ আছে। পৃথিবী হইতে ইহার কক্ষপথের কাছাকাছি দূরত্ব হইল 229 km এবং দূরের ব্যবধান হইল 933 km ( মোটামুটি 560 মাইল ) এবং নিরক্ষরেখা ও কক্ষপথের মাঝে কোণের পরিমাপ হইল 66°। স্পুটনিকের গতিবেগ হইল প্রতি সেকেণ্ডে 8 km ( ঘণ্টায় 17000-1800 মাইল ) এবং পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে উহার 96 min. লাগিয়াছিল। গোলকটির অভ্যন্তর নানারকম যন্ত্রপাতি দিয়া সজ্জিত যেমন বেতার-প্রেরক যন্ত্র, ফটোক্যামেরা, মহাজাগতিক রশ্মি, অতি বেগুনী রশ্মি প্রভৃতি মাপিবার যন্ত্র ইত্যাদি।

রুশ বিজ্ঞানীরা প্রথম স্পুটনিক ছাড়িবার কিছুদিন পরে 2nd নভেম্বর দ্বিতীয় স্পুটনিক ( Sputnik II ) ছাড়েন এবং ইহার ভিতরে 'লাইকা' নামক কুকুরটিকে দেওয়া হইয়াছিল; দ্বিতীয় স্পুটনিক প্রথমটির চেয়ে আরও অনেক বড় ছিল এবং পৃথিবী হইতে 1500 km ঊর্ধ্ব দিয়া ইহার কক্ষপথ ছিল। তৃতীয় স্পুটনিকও 1958

সালের 15th মে আকাশে উঠিয়াছে। প্রথমটির গতিবেগ কয়েকমাস পরে কমিয়া আশায় উহা পৃথিবীর উপর নামিয়া আসে। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে 'শূন্যের মানমন্দির' বলা চলে।

**উপগ্রহের উর্ধ্বগমন কাহিনী:** কৃত্রিম উপগ্রহকে অত উচুঁতে পাঠান সম্ভব হইয়াছে রকেটের সাহায্যে। উপগ্রহের পূর্বে একমাত্র রকেটের সাহায্যে 200 km-এর উপরে 750 lbs ওজন পাঠান সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্য উপরে থাকিতে পারিত। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, একটি ঢিল বা পাথরের টুকরা কিম্বা যে কোন ভারি বস্তুর টুকরাকে দড়ি বাঁধিয়া আঙ্গুলে জড়াইয়া যদি ঘোরান যায়, তাহা হইলে ঐ টুকরার উপর অভিকেন্দ্র এবং অপকেন্দ্র এই দুইটি বল ক্রিয়া করে।

বৈজ্ঞানিকরা গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে যদি কোন বস্তুকে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে 560 মাইল উচ্চে তুলিয়া তাহাকে পার্শ্বে ধাক্কা দিয়া বৃত্তাকার পথে 17000-
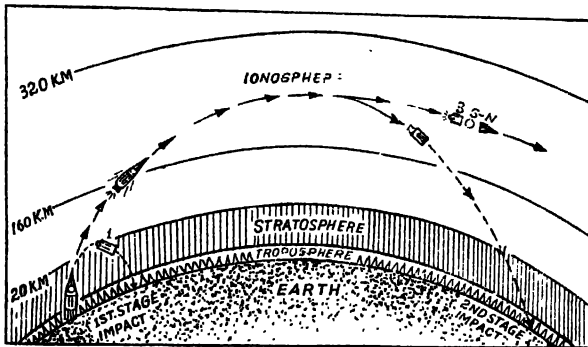
Fig. 14 উপগ্রহের গতিপথ

18000 মাইল বেগে ঘোরান যায় তাহা হইলে উহার অবস্থা দড়ি বাঁধা ঢিলের মত হইবে (Fig. 14)। পৃথিবীর আকর্ষণ উহাকে টানিবে কেন্দ্রের দিকে আর অপকেন্দ্র বল উহাকে শূন্যলোকে আকর্ষণ করিবে। এই দুইটি বিপরীত মুখী অথচ সমান বলের প্রভাবে বস্তুটির ভারশূন্য বা ওজনশূন্য অবস্থা হইবে। কৃত্রিম উপগ্রহটির বেলাতে এই গণনা অনুসারে কার্য করা হইয়াছে।

**রকেটের সাহায্যে উপগ্রহের উর্ধ্বলোকে যাত্রা:** রকেটের কার্যক্রম নিউটনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিয়মের উপর নির্ভর করে। রকেট চালাইবার জন্য জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। উহা জ্বলিলে প্রবল বেগে নিম্নমুখে গ্যাস বাহির হইতে থাকে এবং উর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়ার ফলে রকেট উপরে উঠিতে

থাকে। পৃথিবীর আকর্ষণ বলের ক্রিয়ার বাহিরে যাইতে হইলে রকেটের বেগ সেকেণ্ডে 7 মাইল অথবা ঘণ্টায় প্রায় 25,000 মাইল হওয়া প্রয়োজন। নিম্নের ঘনতর বায়ুস্তর অতিক্রম করিবার সময় অত প্রবল বেগ থাকিলে প্রচণ্ড ঘর্ষণ এবং তাহা হইতে তাপের সৃষ্টি হইবে। রকেট যে পদার্থ দিয়া তৈরী হইবে তাহা ঐ তাপ সহ্য করিতে পারিবে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্তরে স্তরে সজ্জিত তিনটি রকেটের দ্বারা সম্পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করাইবার ব্যবস্থা হয় (Fig. 15)।

সবার উপরের স্তরের রকেটটি চোঙার মত এবং তাহার ভিতরে কৃত্রিম উপগ্রহটি রাখার জায়গা। প্রথম রকেট কৃত্রিম উপগ্রহ ও অন্য রকেট দুটি লইয়া 36 মাইল উপরে উঠে এবং উহার বেগ তখন ঘণ্টায় 1700 মাইল। ইহার পর প্রথম রকেট খসিয়া যায় এবং দ্বিতীয় রকেটটি 140 মাইল উপরে উপগ্রহপূর্ণ তৃতীয় রকেট পৌঁছাইয়া দেয়। বায়ুর ঘনত্ব এখানে অনেক কম বলিয়া দ্বিতীয় রকেটের বেগ খসিয়া যাইবার পূর্বে ঘণ্টায় প্রায় 10,000 মাইল হইলেও তাপ সৃষ্টি খুব বেশী হয় না।

বাকি দূরত্ব তৃতীয় রকেট অতিক্রম করে। রকেট খুলিয়া উপগ্রহটি বাহির হইয়া আসে এবং ইহাকে রকেটটির পার্শ্বে ধাক্কা দিয়া বৃত্তাকার কক্ষপথে চালু করিয়া দেয়। উপগ্রহের বেগ তখন ঘণ্টায় 17,000-18.000 মাইল এবং নিরক্ষরেখার সহিত কক্ষপথের কোণ হইল 66°।

Fig. 15 পৃথিবী, রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ

আমেরিকা কৃত্রিম উপগ্রহ শূন্যে পাঠাইবার জন্য উপরের বর্ণনা মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। রুশ বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক ঐ নিয়মই অনুসরণ করিয়াছেন কিনা, বা কি জ্বালানী তাহারা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সঠিক জানা যায় নাই।

**ভারশূন্য বা ওজন শূন্য অবস্থাঃ** কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজনশূন্য অবস্থা হইলে তাহার ভিতরে যদি কোন প্রাণী পৃথিবীর মত স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করিতে যায়, তাহা হইলে মহা অসুবিধায় পড়িবে। উঁচু-নীচু বলিয়া কিছু থাকিবে না। কোন মানুষ স্বচ্ছন্দে দেওয়াল ও ঘরের ভিতরে ছাদের কড়িকাঠে বেড়াইতে পারিবে। যদি

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার সময় একটু ঝাঁকানি দিয়া ওঠে তাহা হইলে উপগ্রহের ভিতরে শূন্য স্থানের বায়ুতে ভাসিতে থাকিবে। একটি পাত্র হইতে অপর পাত্রে জল বা অন্য কোনও তরল পদার্থ ঢালিতে পারা যাইবে না, সে পদার্থ ছিটকাইয়া হাওয়ায় ভাসিবে। গিলিয়া কিছু খাইতে পারা যাইবে না, পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাবার ভয় থাকিবে না।

অবশ্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন অভ্যাস করিলে সকল রকম অবস্থাতেই মানুষ খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে এবং রাশিয়াতে ষোলজন লোক ভারশূন্য অবস্থায় প্রায় 40 সেকেণ্ড কাটাইয়াছেন।

## B8 ছায়াপথ, বিশ্ব এবং নীহারিকা (Milky Way, Universe, Nebulae)

### প্রাথমিক পরিচয় (Elementary Ideas) :

মেঘবিহীন রাত্রির অন্ধকার আকাশের দিকে যদি চাহিয়া থাকা যায় তাহা হইলে চিকমিকে হীরার কুঁচির মত কত সহস্র তারা আমাদের চোখে পড়িয়া থাকে। আমরা এক চাঁদ ছাড়া আর সবাইকেই তারা বলি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু ভেদ আছে।

**উল্কা বা খসে-যাওয়া তারা :** আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি একটি তারা দ্রুত বেগে আকাশ থেকে নামিয়া দিগ্বলয়ে মিলাইয়া গেল। ইহাদের বলে উল্কা ( Meteor )। এগুলি হইল মহাশূন্য হইতে খসিয়া-পড়া পদার্থখণ্ড যেগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সহিত ঘর্ষণের ফলে জ্বলিয়া ওঠে।

**ছায়াপথ ( Milky Way )** বহু, বহু দূরে, আমাদের সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ পার হইয়া আরও দূরে, আকাশকে বেষ্টন করিয়া আছে এক অপূর্ব সুন্দর আলোক-পথ। যদিও ইহা দূর হইতে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায় আসলে উহা আমাদের সূর্যের মত কোটি কোটি নক্ষত্রের সমাবেশ। এইভাবে বলা আরও ঠিক হইবে যে ছায়াপথের ঐ নক্ষত্র লোকের একটি অধিবাসী হইল আমাদের সূর্য, যাহার চেয়ে বহু হোমরা-চোমরা অধিবাসীর সংখ্যাই ওখানে বেশী। আকাশে আরও যে সকল তারা দেখিয়া থাকি তাহারাও ঐ নক্ষত্রলোকের অংশ।

সূর্যের পর যে নক্ষত্র আমাদের নিকটতম প্রতিবাসী তাহার দূরত্ব হইল প্রায় 26,000000000000 মাইল। জ্যোতির্বিদরা এত অধিক দূরত্বকে মাপিবার জন্য অন্য মান গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাকে বলিয়াছেন আলোক-বর্ষ ( Light Year ) প্রতি সেকেণ্ডে আলোকের গতি হইল 18,6,000 মাইল। তাহা হইলে এক বৎসরে আলোক 6,000000000000 মাইল অতিক্রম করিবে। তাহার মানে উপরের সংখ্যাটি হইল আলোক-বর্ষের মাপ। তাহা হইলে সূর্যের নিকটতম তারার দূরত্ব হইল $\frac{26 \times 10^{12}}{6 \times 10^{12}} = 4\frac{1}{3}$ ( light year ) সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌছাতে ৪ মিনিট ১৯ সেকেণ্ড সময় লাগে।

**ধূমকেতু** ( **Comet** ) : ধূলিকণা ও বাষ্প মিলিয়া ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়। ইহাদের গতিপথ সূর্যকে ঘিরিয়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সেই পথে ইহারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাদের নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে এবং রাত্রির আকাশে কখনও পর পর অনেক রাত্রি ধরিয়া বা মাস ধরিয়াও ইহাদের দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহারা সৌর-জগতের অংশ বিশেষ হইয়া থাকে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহাদের কাহারও লাগে কয়েক বৎসর আবার কাহারও লাগে কয়েক শতাব্দী। সূর্যের কাছাকাছি আসিলে ধূমকেতুর হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত উজ্জ্বল বাষ্পময় পুচ্ছের সৃষ্টি হয়।

**নীহারিকা** ( **Nebulae** ) : নীহারিকা হইতে নক্ষত্রের জন্ম। আমাদের সূর্য এবং সূর্যের চেয়ে ছোট-বড় আরও লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের সৃষ্টি নীহারিকা হইতে। মহাশূন্যে ঘন গ্যাসীয় মেঘ আছে, ইহারা জমাট বাঁধিয়া নক্ষত্রের সৃষ্টি করে। এক একটি এমনি নীহারিকার বিস্তার বহু যোজন ব্যাপ্ত। অরিয়ন ( Orion ) এবং ক্র্যাব ( Crab ) দুইটি বিখ্যাত নীহারিকার নাম।

**মহাবিশ্ব** ( **Universe** ) : আমরা যাহা কিছু বিরাট, বিশাল, তাহা বুঝাইতে হইলে মহৎ-শব্দ যোগ করিয়া থাকি। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করিয়াও হাজার হাজার সূর্য, চন্দ্র, নীহারিকায় নির্মিত এই যে মহাবিশ্ব তাহার অতি সামান্য অংশই মানুষের জ্ঞানায়ত্ত হইয়াছে। আমরা গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে পাড়ি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু এমন কত নক্ষত্র আছে যাহাদের আলো আজিও পৃথিবীতে পৌছিতে পারে নাই।

## প্রশ্নাবলী

1. মহাকর্ষ সূত্র কোন্ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছিলেন? সূত্রটি বিবৃত কর। মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষের মাঝে কি প্রভেদ এবং কি মিল আছে তাহা লিখ।

2. উদাহরণ দ্বারা বেগ, গতি এবং ত্বরণ বুঝাও। পড়ন্ত বস্তুর সূত্র (Laws of Falling Bodies) লিখ। গিনি ও পালক পরীক্ষা হইতে কি প্রমাণিত হইয়াছিল?

3. সরল দোলক ব্যাখ্যা কর। দোলক সূত্র চারিটি বিবৃত কর এবং উহা হইতে কি কি প্রমাণিত হইয়াছে তাহা লিখ।

4. বস্তুর ভারকেন্দ্র কাহাকে বলে? সাম্য অবস্থা কয় প্রকারের হয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাও।

5. দণ্ডতুলা কোন শ্রেণীর লিভার? দণ্ডতুলার বিভিন্ন অংশ ও উহার ব্যবহার প্রণালী বিশদভাবে লিখ।

6. সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এমন প্রধান গ্রহগুলির নাম লিখ। উহাদের মধ্যে আমাদের পৃথিবীর স্থান কোথায়? পৃথিবীর উপগ্রহ কি? আর কোন্ কোন্ গ্রহের উপগ্রহ আছে? কেপ্‌লারের নিয়ম এবং মহাকর্ষ সূত্র মিলাইয়া কোন্ আবিষ্কারের সুবিধা হইয়াছে?

7. জোয়ার ভাঁটা কেন হয়? মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার বলিতে কি বুঝায়?

8. কৃত্রিম উপগ্রহ ও ওজনশূন্য অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

9. নিম্নের যে কোন চারিটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যাহা জান লিখ:

(i) ছায়াপথ, (ii) উল্কা, (iii) ধূমকেতু, (iv) নীহারিকা, (v) মহাবিশ্ব।

---

# C. Light—Syllabus

*The portions in the Syllabus underlined are optional and may be omitted until further notice*

| Course Content | Demonstration & Experiments |
|---|---|
| C1. Light travels in a straight line; shadows, eclipses. | Construction of a pinhole camera. |
| C2. Light travels with finite velocity. Light from the sun takes 8 mins. to reach us. | |
| C3. Reflection of light at plane and spherical mirrors (concave & <u>convex</u>) (no mathematical formulae). | Construction of a periscope, formation of images by mirror. |
| C4. Refraction; <u>convex</u> and concave lenses (no mathematical formulae). | Experiments on refraction through glass and water. Formation of images by lenses. |
| C5. The eye as a lens; corrections for defective eyesight (simple explanation). | |
| C6. The prism, dispersion of colours. | Use a prism to show formation of spectrum. |
| C7. Optical instruments; magnifying glass, <u>compound microscope, telescope</u>, camera, magic lantern. Description and simple explanation of its working. | |

## সারাংশ

·1 **সমসত্ব মাধ্যমে** ( homogeneous medium ) **আলোর গতি পথ সরল।** আলোর তরঙ্গময় রূপ ( বৈদ্যুত-চুম্বক-তরঙ্গ ) এবং কণিকাময় রূপ দুই সত্য। আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 16000 মাইল বা $3 \times 10^{10}$ সেঃ মিঃ। সূচি-ছিদ্র ক্যামেরা

·2 **ছায়া :** আলোর গমনপথে কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখিলে তাহার পশ্চাতে ছায়ার সৃষ্টি হইবে। উৎস এবং গতিরোধকারী অস্বচ্ছ বস্তুর আকারের উপর ছায়ার রকমারিত্ব নির্ভর করে

(i) বিন্দু উৎস – অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা ছোট

(ii) বিস্তৃত উৎস - অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা ছোট

(iii) বিস্তৃত উৎস · অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা আকারে বড়

·3 **গ্রহণ :**
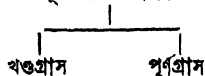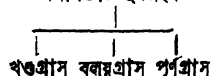
C2 **আলোকের গতিবেগ সসীম :** পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব 9,30,00000 মাইল, সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাইতে আট মিনিট সময় লাগে

C3 **আলোকের প্রতিফলন :** প্রতিফলনের নিয়ম :

(i) আপতিত রশ্মি, অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি সমতলে অবস্থান করে

(ii) আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান

C4·1 **দর্পণে প্রতিবিম্ব :**

(i) সমতল দর্পণে অসদ্‌বিম্ব

(ii) পার্শ্বীয় পরিবর্তন lateral inversion)

(iii) গোলীয় দর্পণ—অবতল ( concave ) এবং উত্তল ( convex ) : গোলীয় দর্পণে প্রতিবিম্ব। পেরিস্কোপ

·2 **আলোকের প্রতিসরণ :** স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো প্রতিসৃত হয়। প্রতিসরণের নিয়ম :

(i) আপতিত রশ্মি, অভিলম্ব এবং প্রতিসৃত রশ্মি একই সমতলে অবস্থান করে

(ii) কোন এক নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মির এবং বিশেষ দুইটি মাধ্যমের বেলায় আপতিত কোণের sine এর অনুপাত একটি ধ্রুবক। অথবা স্নেলের নিয়ম (Snell's Law) অনুসারে $\frac{\text{Sin i}}{\text{Sin t}} = a^n g$ ( a=air বায়ু g=glass কাচ )। এই ধ্রুবক=প্রতিসরনাঙ্ক=u। প্রতিসরণের ফল

·3 **লেন্সের প্রকার :**

(i) অভিসারী অথবা উত্তল ( convergent or concave )

(ii) অপসারী অথবা অবতল ( divergent or convex )। লেন্সের দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

C5 **চক্ষু :** চোখের গঠন : চোখের 'লেন্স' একটি অভিসারী লেন্স। চোখের দোষ :

(i) স্বল্প দৃষ্টি

(ii) দীর্ঘ দৃষ্টি

(iii) ক্ষীণ দৃষ্টি

(iv) বিষম দৃষ্টি

C6 **প্রিজম্ :** আলোকের বিচ্ছুরণ; বর্ণালি ( spectrum ), বিচ্যুতি ( deviation )—একই মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের বিভিন্ন বিচ্যুতি

C7 **আলোকীয় যন্ত্রপাতি :**

(i) বিবর্ধক কাচ

(ii) ম্যাজিক লণ্ঠন

(iii) ক্যামেরা

(iv) যৌগিক অণুবীক্ষণ

(v) দূরবীক্ষণ

# C
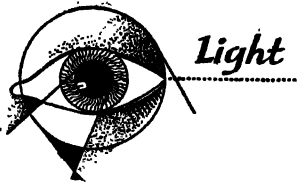
## C1·1 আলোকের রীতি ও প্রকৃতি

প্রকৃতি আমাদের কাছে বিস্ময়ের এক অনন্ত ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের একটি অন্যতম বিস্ময় হইল আলো। আমরা যে নীল, লাল, রোগা, মোটা, কাল, ফরসা দেখিতে পাই তাহা—আলোর জন্যই সম্ভব হইয়াছে। আমাদের চোখে আলোর অভাবে সকলই অন্ধকার।

যেমন তাপ, বিদ্যুৎ, শব্দ সমস্তই এক প্রকার শক্তি, তেমনি আলোকও আর একপ্রকার শক্তি। চোখের 'রেটিনা' নামে পর্দায় এই আলোক-শক্তি আঘাত করিলে আমরা দেখিতে পাই।

**সমসত্ব মাধ্যমে (Homogeneous medium)** কোন আলোক কেন্দ্র (Light source) হইতে আলোকতরঙ্গ চারিদিকে সরল রেখায় গমন করে এবং শূন্য জায়গায় আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 186000 মাইল। কিম্বা $3 \times 10^{10}$ সেঃ মিঃ। এই তরঙ্গগুলি বৈদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ ( Electromagnetic waves )। একটি পুকুরের মাঝে টুপ করিয়া একটি ব্যাঙ্ লাফাইয়া পড়িলে বা একটি ঢিল ছুঁড়িলে যেমন ছোট বৃত্ত হইতে বড় বৃত্তাকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, আলোক কেন্দ্র হইতে আলোকও ঠিক ঐ ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অপর এক মতে আলোক কেন্দ্র হইতে অতি ক্ষুদ্র আলোর কণিকা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে এবং সেগুলি অন্য বস্তুতে পড়িয়া প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত হয়। দুইটি মতেরই সত্যতা আছে।

হুইজেনস্, নিউটন, ফেরমা, রোমার, ফ্রেনেল, ফ্রাউনহোফার, ইয়ঙ্গ প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলোকের উপর আলোকপাত করিয়াছেন।

**আলোকের গতিপথ সরল :** কোন বন্ধ ঘরে দিনের বেলা ঢুকিলে দেখা যায় যে, জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া আলোক-রশ্মি ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সকল সময়ই এই আলোক-রশ্মির পথ সরল হইয়া থাকে। কতকগুলি পিসবোর্ড একসঙ্গে ধরিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম ফুটা করিতে হইবে। এখন একটি টেবিলের

উপর একটি মোমবাতি বা প্রদীপ জ্বালাইয়া বসাইতে হইবে। এইবার ঐ বোর্ডগুলি এক লাইনে ফাঁক ফাঁক করিয়া এমন ভাবে সাজাইতে হইবে, যাহাতে শেষ বোর্ডখানির ফুটায় চোখ রাখিলে আলোক-শিখাটি দেখা যায় (Fig. 1)। এখন যে কোন একটি বোর্ডকে অল্প সরাইয়া লাইনের বাহির করিয়া দিলেই আলোক শিখাটি দেখা যাইবে না। ইহা হইতে বোঝা যায় আলোর গমনপথ সরল।
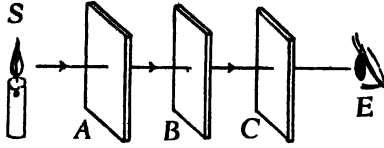
Fig. 1 আলোর গতিপথ সরল

**C1·2 ছায়া :** ভাল থাকিলেই যেমন মন্দ থাকে, তেমনি আলো থাকিলেই আছে কাল, বা ছায়া। আলোর গমনপথে কোন অস্বচ্ছ (opaque) জিনিস রাখিলে তাহার পশ্চাতে ছায়ার সৃষ্টি হইবে। আলোকের গতিপথ সরল বলিয়াই ছায়ার সৃষ্টি হয়, তাহা না হইলে আলোক-রশ্মি অস্বচ্ছ বস্তুটিকে পার হইয়া তাহার পিছনের স্থানও আলোকিত করিতে পারিত।

**রকমারি ছায়া :** আলোর উৎস এবং আলোকের গতিরোধকারী অস্বচ্ছ বস্তুর আকারের উপর ছায়ার রকমারিত্ব নির্ভর করে।

(i) **বিন্দু-উৎস** (Point Sou·ce) **:** ছবিতে (Fig. 2) L হইল বিন্দু উৎস, AB হইল অস্বচ্ছ বস্তু। S একটি পর্দা, উহার উপর AB-র ছায়া A´B´ পড়িয়াছে। L হইতে একটি আলোর শঙ্কুকে ( Cone ) AB অবরোধ করিতেছে, ইহার ফলে A´B´ ছায়ার সৃষ্টি হইতেছে। S কে পিছনে সরাইতে থাকিলে ছায়াটি আকারে বাড়িতে থাকিবে।
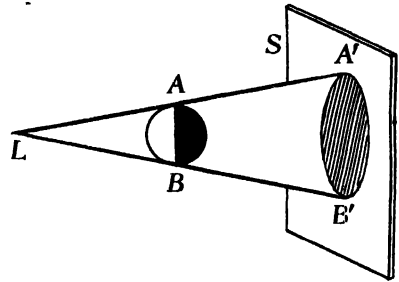
Fig. 2 বিন্দু উৎস

**(ii) বিস্তৃত উৎস কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা আকারে ছোট** (Extended source but smaller than the opaque object) **:** ছবিতে (Fig. 3) LL´ হইল বিস্তৃত উৎস, AB অস্বচ্ছ পদার্থ, S পর্দা। বিস্তৃত উৎসকে অনেকগুলি বিন্দু-উৎসের সমাহার বলিয়া ধরা যাইতে পারে। L´ প্রান্ত হইতে একটি আলোর শঙ্কু AB-কে স্পর্শ করিয়া OP-তে ছায়া ফেলিতেছে। তেমনি L প্রান্ত হইতে একটি আলোর শঙ্কু

QR-এ ছায়া ফেলিতেছে। দেখা যাইতেছে যে PQ জায়গাটি LL′ হইতে কোন সময়েই আলো পাইবে না, উহা পুরা অন্ধকার হইবে। কিন্তু OQ বা PR, LL′-এর কোন কোন অংশ হইতে আলো পাইবে, ইহা পুরা অন্ধকার হইবে না। ছায়ার PQ অংশটিকে বলা হয় প্রচ্ছায়া (umbra) এবং OQ ও PR অংশকে বলা হয় উপচ্ছায়া (penumbra)। পর্দাটি দূরে সরাইলে প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া দুইটিই আকারে বাড়িতে থাকিবে।
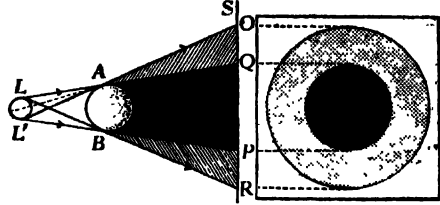
Fig. 3 বিস্তৃত উৎস

**(iii) বিস্তৃত উৎস, অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা আকারে বড় ( Extended source, bigger than the opaque object ) :**

ছবিতে (Fig. 4) LL′ হইল বিস্তৃত উৎস, AB অস্বচ্ছ বস্তু, $S_1$, $S_2$, $S_3$ হইল পর্দার বিভিন্ন অবস্থান।

$S_1$ অবস্থানে দেখা যাইতেছে যে C D হইল প্রচ্ছায়া এবং E D ও C F হইল উপচ্ছায়া। ED ও CF, LL′-এর কিছু অংশ হইতে আলো পাইয়া থাকে। $S_1$ কে সরাইতে থাকিলে প্রচ্ছায়া ছোট হইতে থাকে এবং উপচ্ছায়া বাড়িতে থাকে কেন না আলোক শঙ্কু এখানে অভিসারী (convergent)। $S_2$ অবস্থান হইতে আলোক শঙ্কু প্রতিসারী হইতে আরম্ভ করে। $S_3$ অবস্থানে C′D′-এর মধ্যের যে কোন জায়গা L′ অথবা L প্রান্ত হইতে আলোক পাইয়া থাকে। এই কারণে C′D′ এ উপচ্ছায়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। C′D′ হইতে LL′-এর দিকে দেখিলে M চিত্রের মত দেখিতে লাগিবে। P বা Q হইতে দেখিলে N চিত্রের মত লাগিবে।
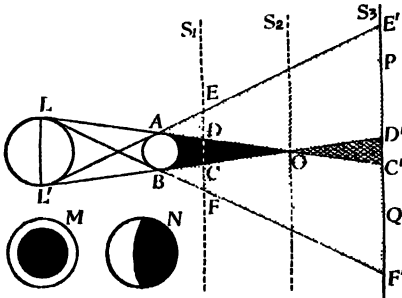
Fig. 4 বিস্তৃত উৎস অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা আকারে বড়

পর্দাটি পিছনে সরাইতে থাকিলে উপচ্ছায়াটি বাড়িতে থাকিলেও ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিবে এবং শেষ পর্যন্ত ছায়া এত হালকা হইয়া আসিবে যে আলোকিত

অংশ হইতে আর পৃথক করা যাইবে না। এই কারণেই আকাশচারী পক্ষী বা উড়োজাহাজের কোন ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে না।

**C1·3 গ্রহণ :** গ্রহণ বা চলতি ভাষায় 'গেরন' বহু যুগ ধরিয়া মানুষের মনে একটা অজানা ভয়ের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। আগেকার মানুষ বুঝিতে পারিত না কোন্ সে অন্ধকার রাক্ষস যাহা চন্দ্র-সূর্যকে সাময়িক ভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

এখনকার বিজ্ঞান সাধক মানুষ ধরিয়া ফেলিয়াছে যে ইহা শুধুই আলোছায়ার জাদুকরি। আমাদের পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে আর চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবী এবং চন্দ্র দুইটি অস্বচ্ছ বস্তু অতএব তাহাদের বিশাল ছায়ার দ্বারাই গ্রহণের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী এবং চন্দ্র, সূর্যের আলোকে আলোকিত হইলে সূর্য হইতে দূরে মহাশূন্যে উহাদের ছায়া পড়ে। এখন চন্দ্র এবং পৃথিবী দুই-ই সূর্য হইতে বহুগুণে ছোট ( বিস্তৃত উৎস, অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা আকারে বড় ) হওয়ায় উহাদের ছায়া শঙ্কুর আকারে ক্রমশঃ সরু হইতে হইতে মহাশূন্যে একটি বিন্দুতে বিলীন হইয়া যায়।

**(i) সূর্য গ্রহণ :** পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে চন্দ্রের প্রায় এক মাস সময় লাগিয়া থাকে। এই সময় যখন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবী চন্দ্রের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সূর্যগ্রহণ ঘটিয়া থাকে। ইহা কেবল মাত্র অমাবস্যার সময় সম্ভব।
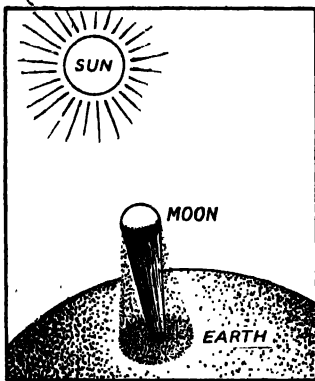
Fig. 5 গ্রহণ

**(ii) চন্দ্রগ্রহণ :** আবার এমনও হয় যে পৃথিবী সূর্য এবং চন্দ্রের মাঝে আসিয়া থাকে এবং পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে চন্দ্র গ্রহণ ঘটিয়া থাকে। ইহা কেবল মাত্র পূর্ণিমার সময় সম্ভব।

**(iii) প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কেন গ্রহণ হয় না :** উপরের লেখা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ এবং প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্র-গ্রহণ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। সূর্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবীর যে প্রদক্ষিণ পথ (orbit) তাহার তল (plane) এবং পৃথিবীকে যে পথে চন্দ্র পরিক্রমা করিয়া

থাকে তাহার তল ( plane ) এক নয়। শেষেরটি প্রথমটির সহিত প্রায় $5^{\circ}$ কোণ ( angle ) সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই কারণে যদিও চন্দ্র পৃথিবীর কক্ষ পথকে মাসে দুইবার করিয়া অতিক্রম করিয়া থাকে সাধারণতঃ পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় চন্দ্র পৃথিবীর কক্ষপথের যে তল তাহার যে কোন একদিকে থাকে এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর দিয়া বা নীচে দিয়া চলিয়া যায়। গ্রহণ হয় না। কিন্তু কোন সময় পৃথিবীর কক্ষপথের তল অতিক্রম করিবার কালেই অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ঘটিয়া থাকে এবং তখনই গ্রহণ হয়।

(iv) **গ্রহণের বিভিন্ন প্রকার :** চন্দ্র যখন সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার ভিতর পড়িয়া যায়, তখন **পূর্ণগ্রাস** ($L_2$) গ্রহণ হয়, এবং চন্দ্রের কতকাংশ প্রচ্ছায়ায় এবং কিছু উপচ্ছায়ায় থাকিলে **খণ্ডগ্রাস** ($L_3$) গ্রহণ হয় (Fig. 6)। চন্দ্রের সকল অংশই ( $L_1$ ) যদি উপচ্ছায়ায় থাকে তখন গ্রহণ হয় না। শুধু চন্দ্রের দীপ্তি একটু ম্লান হয়।
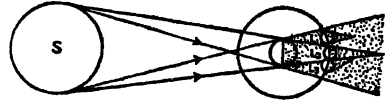
Fig. 6 বিভিন্ন প্রকার চন্দ্রগ্রহণ

**সূর্যের তিন প্রকার গ্রহণ হইতে পারে :** (i) **পূর্ণগ্রাস,** (i) **বলয়গ্রাস** ( Fig. 4 M ) এবং (ii) **খণ্ডগ্রাস** ( Fig. 4 N )। চন্দ্রের বলয়গ্রাস হয় না, কারণ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার যে শঙ্কু তাহার অগ্রভাগ সকল সময়ই চন্দ্রের কক্ষপথের বাহিরে থাকে।

**C2 আলোকের গতিবেগ সসীম : সূর্যের আলোক আমাদের কাছে পৌঁছিতে আট মিনিট সময় লাগে : ( Light travels with finite velocity. Light from the sun takes 8 minutes to reach us.)**

খেলার মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়াছে, কিম্বা শীতের দিন স্কুলের ছুটি হইয়াছে দেরীতে, বাড়ী ফিরিয়া অন্ধকার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া প্রথমেই দেওয়ালের আলোর সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালা হইল। ঘরটি নিমেষে আলোকিত হইল। আলোর বলটি জ্বালিবার পর আর আমাদের চোখে আলো আসিয়া পড়ার মধ্যে কোন সময়ের ব্যবধান আছে বলিয়া মনে হয় না। আসলে এই ব্যবধান হইল মাত্র 0.0000054 ($5.4 \times 10^{-6}$) সেকেণ্ডের, যাহা আমাদের চোখ ধরিতে

পারেনা। এই জন্যই আকাশে বাজ পড়িলে আমরা তৎক্ষণাৎ আলো দেখিতে পাই —আলোর গতিবেগ হইল সেকেণ্ডে 186000 মাইল—কিন্তু শব্দ শুনি আরও অনেক পরে কেননা শব্দের গতিবেগ অনেক কম।

পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব হইল 9,30,00000 মাইল, আর আলোর গতিবেগ হইল সেকেণ্ডে 186000 মাইল। তাই সূর্যের আলো পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে আট মিনিট সময় লাগে। সূর্য একটি জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড, প্রতি মুহূর্তে সূর্য হইতে আলোর কণিকা বা তরঙ্গ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা যে আলোক এই মুহূর্তে দেখিতেছি আসলে তাহা আট মিনিট পূর্বে সূর্য হইতে পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ডেনমার্কের অধিবাসী জ্যোতির্বিদ ওলাফ রোমার 1676 খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, আলোকের গতিবেগ সসীম। তাহা না হইলে সূর্যের আলোক পৃথিবীতে আসিতে কোন সময় লাগিত না।

**পরীক্ষা :**

**সূচিছিদ্র ক্যামেরা** ( **Pinhole Camera** )

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** আলোর সরল রেখায় গমন।

**পরীক্ষার উপকরণ :** (i) একটি কার্ডবোর্ডের অথবা যে কোন বাক্স যাহার ভিতরটা আলোর প্রতিফলন এড়াইবার জন্য কালো রঙ করা থাকিবে। বাক্সের চারিদিক বন্ধ থাকিবে শুধু একদিকে একটি ছিদ্র থাকিবে।
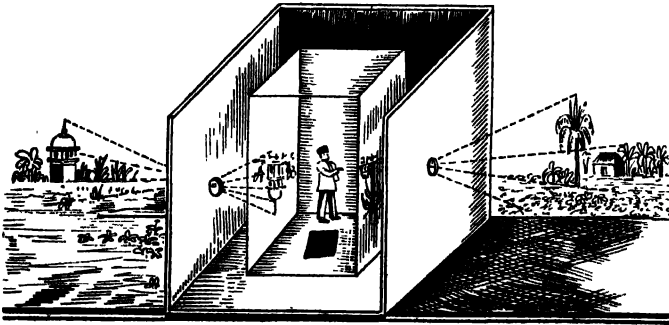
**Fig. 7** সূচিছিদ্র ক্যামেরা

(ii) যদি আলোকচিত্র গ্রহণের প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে রাসায়নিক পদার্থ-যুক্ত কাঁচের প্লেট বা ফিল্ম।

(iii) যাহার ছবি লওয়া হইবে সেই বস্তু এবং আলোক উৎস।

**প্রণালী:** বাক্সের ছিদ্রটি যেদিকে তাহার অপরদিকে বাক্সের ভিতরে প্লেটটি রাখিতে হইবে। এখন আলোকের উৎসের দিকে অথবা ধরা যাউক একটি গাছের ছবি লওয়া হইবে তাহার দিকে ক্যামেরার ছিদ্রমুখ ঘোরান থাকিলে তাহার প্রতিটি অংশ হইতে আলোক রশ্মি প্লেটের উপর আসিয়া পড়িবে। আলোকের ঋজু গমনের জন্য প্লেটের উপর একটি উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হইবে।

অতএব প্রমাণিত হইল যে **আলোকের গতিপথ সরল**।

এই ক্যামেরা একটি ছোট বাক্সের সাইজ হইতে সুরু করিয়া একটি ঘরের আকারেরও হইতে পারে। এই ক্যামেরা বহুদিন হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। যখন আলোকচিত্র স্থায়ী করিবার জন্য রাসায়নিক প্লেটের উদ্ভব হয় নাই, তখনও প্লেটের জায়গায় ঘসা কাচ অথবা কাগজ রাখিয়া প্রতিবিম্বটি আঁকিয়া লওয়া হইত।

## C3 আলোকের প্রতিফলন ( Reflection of Light )

সমতল এবং গোলীয় ( অবতল এবং উত্তল ) দর্পণে আলোকের প্রতিফলন [ Reflection of light at plane and spherical ( concave & convex ) mirrors ]।

### প্রতিফলন

দুইটি মাধ্যমের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টিকারী যে পৃষ্ঠ বা তল ( Surface ) উহার উপর যখন একটি আলোকরশ্মি আসিয়া পড়ে তখন আলোর কিছুটা অংশ সেই তলে প্রতিফলিত হইয়া প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে, এবং কিছুটা অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করে। তেমন স্বচ্ছ মাধ্যম হইলে অপর কিছু অংশ দ্বিতীয় মাধ্যম ভেদ করিয়া প্রতিসৃত (refracted ) হয়। ব্যবধান সৃষ্টিকারী এই তল যত মসৃণ এবং পালিস করা চকচকে হইবে তত বেশী পরিমাণে আলোক প্রতিফলিত হইবে। এইরূপ মসৃণ তলকে বলা হয় **প্রতিফলক** ( reflector )। যে কোন পালিস-করা ধাতুপৃষ্ঠ, কাঁচ, দর্পণ, পারদ, সকলই ভাল প্রতিফলক। সাধারণভাবে যে কোন ভাল প্রতিফলককে দর্পণ বলা হয়।

অমসৃণ তলে—যেমন মাটিতে, কাপড়ে, দেওয়ালে যদি আলোকরশ্মি পড়ে তাহা হইলে উহা চারিদিকে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে **বিক্ষেপণ** ( diffusion ) বলা হয়।

**প্রতিফলনের কয়েকটি নিয়ম আছে ( Laws of Reflection ) :**

AP একটি আপতিত রশ্মি ( incident ray ) যাহা বায়ুর ভিতর দিয়া CD প্রতিফলকের পৃষ্ঠে আপতন বিন্দু ( point of incidence ) P-তে পড়িয়াছে (Fig. 8a)। P হইতে যে রশ্মি ফিরিয়া যায়—PB—উহা হইল প্রতিফলিত রশ্মি ( reflected ray )। PC হইল প্রতিসৃত রশ্মি। আয়তন বিন্দু P-তে NP লম্ব (perpendicular) টানিলে উহাকে অভিলম্ব (normal) বলে। AP রশ্মি NP-র সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, তাহাকে আপতন কোণ (angle of incidence) বলে—ছবিতে i হইল আপতন কোণ। BP রশ্মির সহিত NP-র কোণ হইল প্রতিফলন কোণ (angle of reflection )—ছবিতে r হইল প্রতিফলন কোণ।
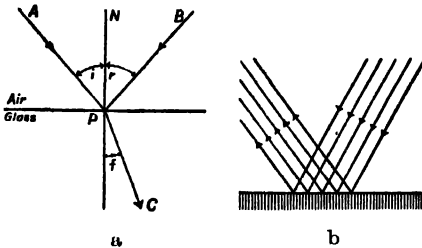
Fig. 8 আলোর প্রতিফলন

**প্রতিফলনের নিয়ম :** প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে

(i) আপতিত রশ্মি (AP) অভিলম্ব (NP) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ( BP ) সমতলে ( same plane ) অবস্থান করে।

(ii) আপতন কোণ i এবং প্রতিফলন কোণ r সমান।

## C4। দর্পণে প্রতিবিম্ব

**সমতল দর্পণে অসদ্ বিম্ব :** MM′ একটি সমতল ( plane ) দর্পণ। উহার সম্মুখে কোন বস্তু রাখিলে তাহার যে কোন বিন্দুর প্রতিবিম্ব কি ভাবে হইবে তাহা ছবিতে দেখান হইয়াছে।

কোন বস্তুর একটি বিন্দু হইল O (Fig. 9)। দুইটি সরলরেখার বিচ্ছেদস্থল দ্বারা একটি বিন্দুকে নির্ণয় করা যায়। O হইতে দুইটি রশ্মিরেখা OA এবং OB MM′ এর উপর পড়িয়াছে এবং প্রতিফলিত হইয়াছে। A এবং B-তে $AN_1$ ও $BN_2$ অভিলম্ব টানা হইয়াছে এবং i, r ও i′ r′-কে সমান করা হইয়াছে।
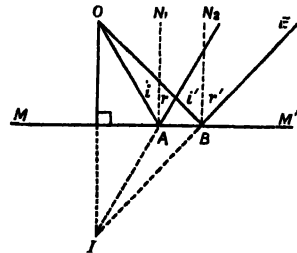
Fig. 9 সমতল দর্পণে অসদ্ বিম্ব

প্রতিফলিত রশ্মি দুইটি দর্পণের সম্মুখে মিলিত হয় না ; উহাদের বর্ধিত করিলে দর্পণের পশ্চাতে I-বিন্দুতে মিলিত হয়। I হইল O-র প্রতিবিম্ব। সরল জ্যামিতির দ্বারা ইহা দেখান যায় যে L হইতে O এবং I-এর দূরত্ব সমান এবং OI হইল MM´-এর উপর লম্ব।

I-কে বলা হয় O-র **অসদ্-বিম্ব** ( virtual image ) কেননা এই বিন্দু দিয়া আলোক রশ্মিগুলি যথার্থ যায় না কিন্তু দেখিলে তাহাই মনে হয়।

**পার্শ্বীয় পরিবর্তন** ( Lateral Inversion ) : O বিন্দুর মত একটি সমগ্র বস্তুর প্রতিবিম্বিত ঐভাবে দর্পণে দেখা যাইবে। ছবিতে (Fig. 10) AB বস্তুর প্রতিবিম্ব হইল A´B´। E-তে যদি কোন দর্শক থাকে তাহার নিকট AB তীরের মস্তকটিকে ডান দিকে আছে বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু দর্পণের ভিতর দেখিলে তীরের মস্তকটি বাম দিকেই আছে দেখা যাইবে। প্রতিবিম্বটির পার্শ্বীয় পরিবর্তন ( lateral inversion ) হইয়াছে বলা হয়। আসল বস্তু ও সমতল দর্পণে তার প্রতিবিম্বের আয়তন একই থাকে।
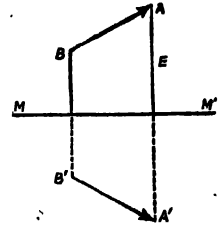
Fig 10 পার্শ্বীয় পরিবর্তন

**গোলীয় দর্পণ :** কোন একটি ফাঁপা গোলক যদি চকচকে হয় তাহাকে গোলীয় দর্পণ বলে। উহার যে কোন অংশই ( টুকরা ) দর্পণের কাজ করে। গোলকের ভিতর অংশ চকচকে হইলে উহাকে অবতল দর্পণ ( concave mirror ) বলে এবং বাহিরের অংশ চকচকে হইলে উত্তল দর্পণ ( convex mirror ) বলে।

দর্পণের যে অংশটুকু ব্যবহার করা হয় তাহার মধ্য-বিন্দুকে দর্পণের **মধ্যবিন্দু** (Pole) বলা হয়। ছবিতে (Fig. 11, a & b) V হইল মধ্যবিন্দু। যে গোলকের
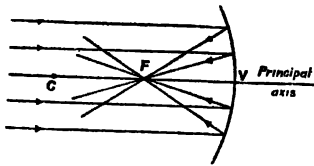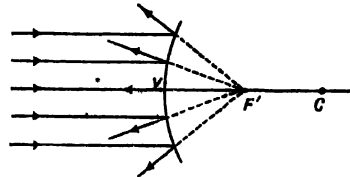
Fig. 11 গোলীয় দর্পণ

অংশ হইল এই দর্পণ তাহার কেন্দ্র যদি C হয় তাহা হইলে VC সরল রেখাটিকে বলা হয় **মুখ্য অক্ষ** ( principal axis )। C কেন্দ্রকে বলা হয় **বক্রতা কেন্দ্র**

( centre of curvature ), C এবং দর্পণের অন্য যে কোন বিন্দুর ( N-এর ) সংযোগকারী সরলরেখা হইল ঐ গোলীয় দর্পণের ব্যাসার্ধ; ইহাকে বলে **বক্রতা ব্যাসার্ধ** ( radius of curvature )।

VC সরলরেখার মাঝে এমন একটি বিন্দু F আছে যে যাহার মধ্য দিয়া VC-র সমান্তরাল যে কোন রশ্মিগুচ্ছ ( AN ) দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া ঐ বিন্দুর মধ্য দিয়া যাইবে (Fig.12)। F-কে বলা হয় **মুখ্য ফোকাস** ( principal focus ) এবং VF-কে (বা f ) বলা হয় **ফোকাল দৈর্ঘ্য** ( focal length )।
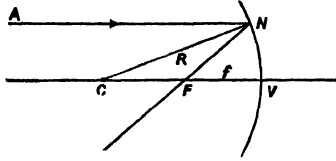
Fig. 12 গোলীয় দর্পণের বিভিন্ন অংশ

অবতল দর্পণের বেলায় প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ F বিন্দুতে প্রকৃতই কেন্দ্রীভূত হয় এবং সদ্‌বিম্বের ( real image ) সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু উত্তল দর্পণের বেলায় ( Fig. 11b ) রশ্মিগুচ্ছগুলি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু (F′) হইতে আসে বলিয়া মনে হয় এবং অসদ্‌বিম্বের (virtual image) সৃষ্টি করে।

গোলীয় দর্পণে আপতন কোণ i যদি খুব ছোট হয় তাহা হইলে দেখান যায় যে মুখ্য ফোকাস F হইল CV র মধ্যবিন্দু।

আবার বক্রতা ব্যাসার্ধ $R = CN = CV =$ গোলকের ব্যাসার্ধ। তাহা হইলে $FV = CF = \frac{R}{2} = f$। ফোকাল দৈর্ঘ্য $f = \frac{R}{2}$।

**অবতল দর্পণে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি :** যে বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্পণে পড়িবে দর্পণ হইতে সেই বস্তুর দূরত্বের উপরই প্রতিবিম্বের আকার প্রকার এবং অবস্থান নির্ভর করে।

(1) **দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্ব** R ( 2f ) **অপেক্ষা অধিক :** AB হইল বস্তুর অবস্থান (Fig.13)। দর্পণে V বিন্দু হইতে AB র দূরত্ব BV হইল CV ( অথবা 2f ) অপেক্ষা বেশী। মুখ্য অক্ষ CV র সহিত সমান্তরাল করিয়া A বিন্দু হইতে একটি রশ্মি লইলে উহা দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া মুখ্য ফোকাস F-এর মধ্য দিয়া যাইবে।
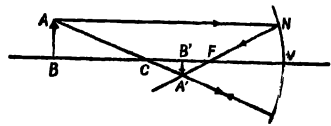
Fig. 13 বস্তুর দূরত্ব R অপেক্ষা অধিক

A বিন্দু হইতে অপর একটি রশ্মি বক্রতা কেন্দ্র ( centre of curvature ) C-র ভিতর দিয়া টানিলে উহা দর্পণের অভিলম্ব হইবে এবং প্রতিফলিত হইয়া

C-র ভিতর দিয়াই পুনরায় ফিরিয়া যাইবে। এই রশ্মি দুইটি A´ বিন্দুতে মিলিত হয় এবং A´ হইল A বিন্দুর প্রতিবিম্ব এবং B´ হইল B-র প্রতিবিম্ব।

তাহা হইলে A B-র প্রতিবিম্ব A´B´ হইল **সদ্, উল্টা** এবং A B হইতে **ছোট**।

(2) **মুখ্য ফোকাস F এবং বক্রতা কেন্দ্র C-র মাঝে বস্তুর অবস্থিতি :** C এবং F-এর মধ্যে AB রহিয়াছে (Fig. 14)। মুখ্য অক্ষর সহিত সমান্তরাল করিয়া একটি রশ্মি A বিন্দু হইতে লইলে উহা দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া মুখ্য ফোকাস F-এর মধ্য দিয়া যাইবে। অপর একটি রশ্মি A বিন্দু হইতে লইয়া F-এর ভিতর দিয়া পাঠাইলে দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া মুখ্য অক্ষের সমান্তরাল হইবে।
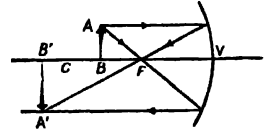
Fig. 14 F এবং C-র মাঝে বস্তু

এই দুইটি রশ্মি A´ এ মিলিত হইতেছে। AB-র প্রতিবিম্ব A´B´ **সদ্, উল্টা** এবং A B হইতে আকারে **বড়** হইবে।

(3) **বস্তুর দূরত্ব ফোকাল দৈর্ঘ্য হইতে কম :** AB-র অবস্থান FV-র মাঝে (Fig. 15)। A হইতে দুইটি রশ্মি লওয়া হইয়াছে। একটি C-র ভিতর দিয়া গিয়াছে অপরটি মুখ্য অক্ষের সমান্তরাল বলিয়া F-এর ভিতর দিয়া গিয়াছে। এই রশ্মি দুইটি অপসারী ( divergent ) রশ্মি বলিয়া দর্পণের প্রতিফলন-পৃষ্ঠের দিকে মিলিত হইতেছে না। দর্পণের পশ্চাৎ দিকে উহাদের বর্ধিত করিলে A´ বিন্দুতে মিলিত হইবে। প্রতিবিম্ব A´B´ এক্ষেত্রে অসদ্, সোজা এবং AB হইতে আকারেও অনেক বড়।
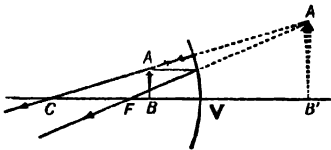
Fig. 15 বস্তুর দূরত্ব ফোকাল দৈর্ঘ্য হইতে কম

**উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি :** উত্তল দর্পণের সম্মুখে যে কোন জায়গাতেই বস্তুকে রাখা হউক না কেন উহার প্রতিবিম্ব হইবে **অসদ্, সোজা** এবং বস্তু হইতে **আকারে ছোট**।
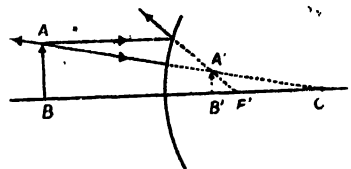
Fig. 16 উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি

প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল A বিন্দু হইতে একটি রশ্মি লইলে ( Fig. 16 ) দর্পণ তলে প্রতিফলিত হইবার পর

মনে হইবে **অসদ্ ফোকাস** ( virtual focus ) F´ হইতে উহা আসিতেছে। A হইতে C-র ভিতর দিয়া অপর একটি রশ্মি লইয়া গেলে উহা দর্পণের অভিলম্ব হিসাবে ঐ বরাবর আবার ফিরিয়া আসিবে কিন্তু দুইটি রশ্মি মিলিত হইবে না। দর্পণের পশ্চাতে উহাদের টানিলে A´ বিন্দুতে মিলিত হইয়া **অসদ্, সোজা** এবং AB হইতে **ছোট** A´B´ প্রতিবিম্ব গঠিত হইবে।

**সরল পেরিস্কোপ** (Simple periscope) : সমান্তরাল ভাবে রাখা দুইটি সমতল দর্পণের প্রতিফলনের উপর পেরিস্কোপের কার্যপ্রণালী নির্ভর করে। একটি কার্ড বোর্ড অথবা যে কোন বস্তুর তৈরী নলের ভিতরে দুইটি সমতল দর্পণ সমান্তরাল ভাবে রাখা হইয়াছে। এই দুইটি ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়। এই নলের গায়ে উপরে এবং নীচে আলো আসা-যাওয়ার পথ আছে। ছবিতে (Fig. 17) দর্পণ M ও M´-এর পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলন দেখান হইয়াছে। ভিড় এড়াইয়া বা আত্মগোপন করিয়া কোন কিছু দেখিতে হইলে পেরিস্কোপের প্রয়োজন। ফুটবল খেলার মাঠে খেলা দেখা, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের পরিখার (trench) ভিতর থেকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা বা জলের নীচের ডুবোজাহাজ সাবমেরিন যখন শত্রুর চোখ এড়িয়ে থাকতে চায় তখন বাহিরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে পেরিস্কোপের প্রয়োজন।
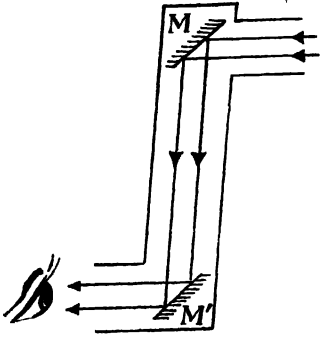
Fig 17 পেরিস্কোপ

## C4·2 আলোকের প্রতিসরণ

দর্পণের জন্য যেমন যথাসম্ভব মসৃণ পৃষ্ঠের প্রয়োজন তেমনি আলোর প্রতিসরণের জন্য প্রয়োজন যথাসম্ভব স্বচ্ছ বস্তুর। এক মাধ্যম হইতে আর এক মাধ্যমে প্রবেশ করাকে আলোর প্রতিসরণ বলে—( যেমন বায়ু হইতে কাঁচে )। আলোকের প্রতিসরণের কারণ হইল বিভিন্ন মাধ্যমে আলোকের গতিবেগের বিভিন্নতা।

AP রশ্মি বায়ু হইতে যদি কাঁচের ভিতর প্রবেশ করে তাহা হইলে প্রতিসৃত রশ্মি PC, অভিলম্ব PM-এর নিকট সরিয়া আসিবে। কিন্তু যদি PC রশ্মি কাঁচ হইতে বায়ুর ভিতর যায়, তাহা হইলে অভিলম্ব PN-হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। এই

কাছে আসা এবং দূরে সরিয়া যাওয়া দুইটি মাধ্যমের ঘনাঙ্কের (density) বেশী-কমের উপর নির্ভরশীল। PC এবং PM-এর মধ্যের কোণকে (t) প্রতিসরণ কোণ (angle of refraction) বলে (Fig. 18)। প্রতিফলন কোণ i-এর মাপ হইতে t-এর মাপ জানা যায় এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া গঠিত প্রতিফলনের নিয়মের মত প্রতিসরণেরও কতকগুলি নিয়ম আছে।

Fig. 18 আলোর প্রতিসরণ

**প্রতিসরণের নিয়ম (Laws of Refraction)**

(i) আপতিত রশ্মি, অভিলম্ব এবং প্রতিসৃত রশ্মি একই সমতলে অবস্থান করে।

(ii) কোন এক নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকরশ্মি এবং বিশেষ দুইটি মাধ্যমের বেলায় আপতিত কোণের Sine এবং প্রতিসৃত কোণের Sine-এর অনুপাত একটি ধ্রুবক। অথবা $\frac{\text{Sin } i}{\text{Sin } t} = {}_a n_g$.
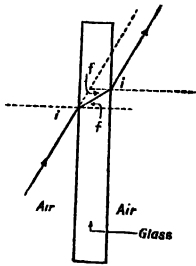
প্রতিসরণের ফল
Fig. 19

এই ধ্রুবক হইল প্রতিসরণাঙ্ক (refractive index)। আগে 'a' এবং পরে g থাকার মানে বায়ু (air) হইতে কাঁচে (glass) যাইবার জন্য যে প্রতিসরণ তাহাকে বোঝায়। শেষের এই নিয়মটিকে ইহার আবিষ্কারক Snellius-এর নাম অনুসারে Snell-এর নিয়ম বলে।

**প্রতিসরণের ফল :** (কাঁচের মাধ্যমে)। বায়ু হইতে একখণ্ড সমান্তরাল কাঁচের (plate) ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি প্রবেশ করিয়া যদি আবার বায়ুর ভিতরই গিয়া পড়ে তাহা হইলে শেষের রশ্মি স্থানচ্যুত (deflected) হইবে, কিন্তু দিক পরিবর্তন (deviate) করিবে না (Fig. 19)। বহির্গত রশ্মি প্রথম রশ্মির সমান্তরাল হইয়াই বাহির হইবে।

**সংকট কোণ** (Critical angle) **: পূর্ণ প্রতিফলন** (Total Reflection) **:** কোন আলোক রশ্মি যখন বেশী ঘনাঙ্কের মাধ্যম হইতে কম ঘনাঙ্কের মাধ্যমে যায় (যেমন জল হইতে বায়ুতে) তখন জলেতে
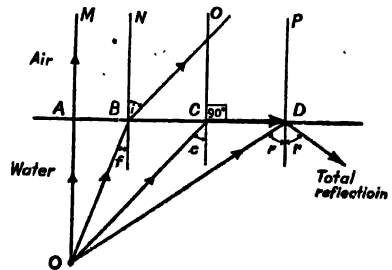
Fig. 20 সংকট কোণ ও পূর্ণ প্রতিফলন

উহার আপতন কোণ 'f' একটি নির্দিষ্ট মাপের আপতন কোণ হইতে কম না হইলে আলোক রশ্মি দুই মাধ্যমের বিভাগ-তলকে ( surface of separation) ভেদ করিতে পারে না। এই কোণকে বলে সংকট কোণ (critical angle) C (Fig. 20)।
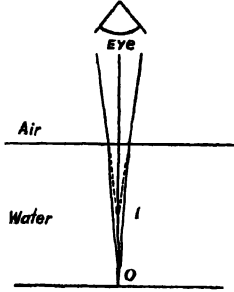
Fig. 21 জলের ভিতর প্রতিসরণ

**জলের ভিতর প্রতিসরণ :** একটি চৌবাচ্চার বেশ পরিষ্কার জলের মধ্যে একটি খেলার মার্বল গুলি পড়িয়া গিয়াছে। গুলিটি O চিহ্নিত স্থানে রহিয়াছে। (Fig. 21) জলের ভিতর দিয়া দেখিলে মনে হইবে গুলিটি I-এর কাছে রহিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে প্রতিসরণের দরুন চৌবাচ্চার তলদেশকে উঁচু মনে হয়।

## লেন্স ( Lens )

লেন্সের সাহায্যে আলোর প্রতিসরণের ফলে যে কোন উজ্জ্বল বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। গোলীয় তল ( অথবা গোলীয় এবং সমতল ) বিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থের দ্বারাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লেন্স নির্মিত হয়। গোলীয় তল ব্যবহারের কারণ উহা তৈরী করা সহজ, যদিও বিশেষ প্রয়োজনে অন্য প্রকার তলযুক্ত লেন্সও ব্যবহার করা হয়। অসীম ব্যাসার্ধ (infinite radius) যুক্ত সমতলকে গোলীয় তলের এক বিশেষ প্রকার বলিয়া ধরা যায়।

**C4·3 লেন্সের প্রকার :** গোলীয় লেন্সকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

(i) অভিসারী ( convergent ) অথবা উত্তল ( convex ) লেন্স এবং (ii) অপসারী ( divergent ) অথবা অবতল (concave) লেন্স। ছবিতে a, b, c অপসারী এবং d, e, f অভিসারী লেন্সের তিনটি করিয়া ছয়টি সাধারণ নিদর্শন দেওয়া হইল।

Fig. 22 বিভিন্ন প্রকার লেন্স

(i) অভিসারী লেন্স :

একটি সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ যদি কোন অভিসারী লেন্সের উপর আপতিত হয়, তাহা হইলে উহা একটি বিন্দু F-এতে কেন্দ্রীভূত হইবে। F-কে লেন্সের ফোকাস বলা হয় ( Fig. 23a )।
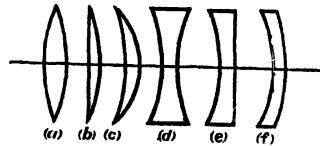
(ii) **অপসারী লেন্স :** যদি রশ্মিগুচ্ছ কোন অপসারী লেন্সের উপর আপতিত হয় তাহা হইলে লেন্স হইতে বাহির হইয়া উহা পুনরায় অপসারী হইবে
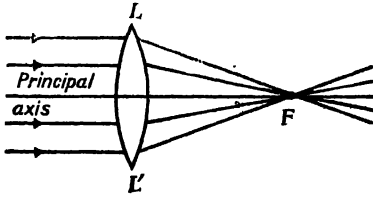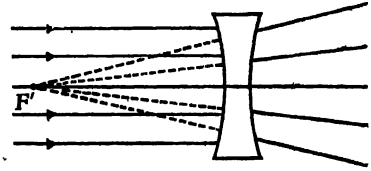
a অভিসারী লেন্স b অপসারী লেন্স

Fig. 23 বিভিন্ন প্রকার লেন্স

এবং মনে হইবে একটি বিন্দু F′ হইতে উহা আসিতেছে। F′ হইলে লেন্সের প্রধান অক্ষের উপরে মুখ্য ফোকাস ( Fig. 23b )। F আছে ( virtual ) ফোকাস কেননা রশ্মিগুলি আসলে ঐ বিন্দুর ভিতর দিয়া যায় না।

**লেন্সের কোনটা কি :** এখানে পাতলা লেন্স ( thin lens ) সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। পাতলা লেন্স বলিতে বোঝায় উহার ঘনতার ( thickness ) তুলনায় ব্যাস অনেক বেশী ( Fig. 24 )।

**মুখ্য** বা **প্রধান অক্ষ :** ( principal axis ) একটি লেন্সের তুইটি গোলীয় তল আছে। ইহাদের বক্রতা কেন্দ্রের ( centres of curvature ) সংযোজক যে সরল রেখা তাহাই হইল লেন্সের মুখ্য অক্ষ ( principal axis )।

**মুখ্য** বা **প্রধান ফোকাস** ( principal focus ) লেন্সের তুই দিকে তুইটি ফোকাস আছে। ( ছবিতে F এবং F′ )। মুখ্য অক্ষের সহিত সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুলি যে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় সেইটি হইল মুখ্য ফোকাস ( principal focus )।
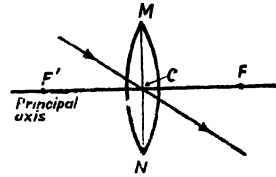
Fig. 24 পাতলা লেন্স

**ফোকাল দৈর্ঘ্য :** প্রধান অক্ষ বরাবর লেন্সের আলোক কেন্দ্র (optical centre) হইতে যে কোন একটি প্রধান ফোকাসের দূরত্বই হইল ঐ লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য ( focal length, CF অথবা CF′ )।

**আলোক কেন্দ্র :** লেন্সের ভিতর যে বিন্দু দিয়া আলোক রশ্মি গমন করিলে দিক পরিবর্তন ( deviate ) না করিয়াই বাহিরে আসে সেইটি হইল আলোক কেন্দ্র ( Optical centre C )। পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক কেন্দ্র ( geometrical centre ) এবং আলোক কেন্দ্র একই বিন্দুতে মিলিয়া যায়।

**ফোকাল সমতল** ( focal plane ) : মুখ্য ফোকাসের ভিতর দিয়া মুখ্য অক্ষের সহিত লম্ব ভাবে কোন সমতল টানিলে তাহাকে ফোকাল সমতল বলে।
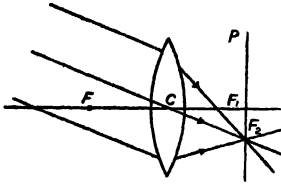
Fig. 25 ফোকাল সমতল

প্রধান অক্ষের সহিত স্বল্প কোণবিশিষ্ট কোন সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ ( Fig. 25 ) একটি অভিসারী লেন্সের মধ্য দিয়া যাইবার পর এই ফোকাস সমতলের কোন এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইবে ( $F_2$ ) এবং সেটি আর একটি ফোকাস হইবে।

**অভিসারী লেন্সের দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন :**

(1) **বস্তুর অবস্থিতি** 2F ( ফোকাল দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ ) **এর অধিক** A B বস্তুর A বিন্দু হইতে প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল একটি রশ্মি লওয়া হইয়াছে ( Fig. 26 )। উহা লেন্স পার হইয়া F-এর ভিতর দিয়া যাইবে।
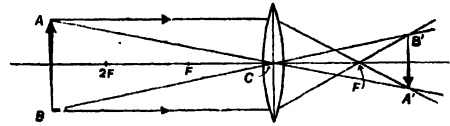
Fig. 26 বস্তুর অবস্থিতি 2F-এর অধিক

আর একটি রশ্মি আলোক কেন্দ্র C-র ভিতর দিয়া গেলে সোজা বাহির হইয়া যাইবে। এই রশ্মি দুইটি A´ বিন্দুতে মিলিবে। এখন ঠিক এই ভাবে B বিন্দু হইতে দুইটি রশ্মি B´-এ মিলিবে। তাহা হইলে A´B´ হইল AB-র প্রতিবিম্ব। এই বিম্ব **সদ্, ছোট** এবং **উল্টা**। প্রতিবিম্ব যে স্থানে গঠিত হইতেছে, সেখানে একটি পর্দা রাখিলে প্রতিবিম্বটি দেখা যাইবে।

(2) **বস্তুর অবস্থিতি** F **এবং** 2F-**এর মধ্যে :** সুবিধার জন্য B বিন্দুকে প্রধান অক্ষের উপরই ধরা হইয়াছে ( Fig. 27 )। প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল একটি রশ্মি A হইতে বাহির হইয়া লেন্স পার হইয়া F-এর মধ্য দিয়া গিয়াছে।
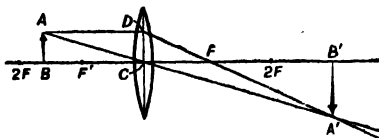
Fig. 27 বস্তু F এবং 2F-এর মধ্যে

অপর একটি রশ্মি A হইতে আলোককেন্দ্রের ভিতর দিয়া সোজা বাহির হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি রশ্মি A´ বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে এবং A´ হইল A-র প্রতিবিম্ব। তেমনি B´ হইল B-র প্রতিবিম্ব এবং সম্পূর্ণ বস্তু A´B´-র চেয়ে প্রতিবিম্ব A´B´ **সদ্, বড়** এবং **উল্টা**।

ইহারই একটি বিশেষ ক্ষেত্র হইল যখন AB ঠিক 2F—এ অবস্থান করে। সে সময়প্রতিবিম্বটি লেন্সের অপর দিকে ঠিক অতখানি দূরে গঠিত হইবে এবং উহা **সদ্, সমান মাপে** এবং **উল্টা** হইবে।

**(3) বস্তুর অবস্থান ফোকাল দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম**
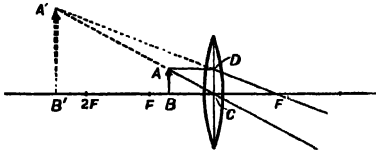
Fig. 28 বস্তুর অবস্থান ফোকাল দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম

A হইতে আসা রশ্মিগুচ্ছ মিলিত হয় না। পিছন দিকে বর্ধিত করিলে A´ বিন্দুতে মিলিত হয় বলিয়া মনে হয় এবং যে দিকে বস্তু রহিয়াছে সেই দিকেই প্রতিবিম্ব গঠিত হইয়া থাকে। ইহা **অসদ্, সোজা** এবং **AB হইতে বড় হয়।**

**অপসারী লেন্সের দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন:**

A হইতে কোন রশ্মি লেন্সের ভিতর দিয়া যাইবার পর অপসারী হইয়া যায় এবং মিলিত হয় না। পিছন দিকে বর্ধিত করিলে উহারা A´ বিন্দুতে মিলিত হইবে। A´ হইল A-র অসদ্‌বিম্ব। AB´ আকারে AB হইতে **ছোট** হয় এবং **সোজা** হয়। অপসারী লেন্সের দ্বারা কোন সদ্‌বস্তুর সদ্‌বিম্ব গঠিত হইবে না।
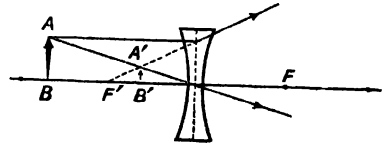
Fig. 29 অপসারী লেন্সের দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠন

## C5 চক্ষু:

বহু আলোকীয় যন্ত্রপাতি যেমন অণুবীক্ষণ (microscope), দূরবীক্ষণ, (telescope), আতস কাঁচ (magnifying glass) ইত্যাদি চক্ষুর সাহায্যেই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া চক্ষুর সম্বন্ধে কিছু জানিয়া রাখা ভাল।

অনেক মেহনৎ করিয়া একটি ভাল কারিগর বা বৈজ্ঞানিক যেমন একটি ভাল লেন্স তৈরী করেন, প্রকৃতি তেমনি আমাদের দেহে অতি যত্নের সহিত দামী লেন্স বসাইয়াছেন। আমাদের যে দুই চক্ষু ভরিয়া আমরা এই মহাজগতের আলোছায়ার খেলা দেখিতেছি, এই চক্ষুই হইল প্রকৃতিদত্ত লেন্স।

**চোখের গঠন:**

আমরা বলিয়া থাকি 'ভয়ের চোটে উহার চক্ষু গোল হইয়া গেল'—চক্ষু গোল হইয়া যায় না, চক্ষু প্রায়-গোলাকারই, মানে ভিতরের গড়নটা।

**অচ্ছোদ পটল** (Cornea C) : C হইল একটি স্বচ্ছ আবরণ যাহাকে পার হইয়া আলোক চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করে। ইহার প্রতিসরণাঙ্ক হইল 1·376। **জলীয় পদার্থ (Aqueous Humour A)** : A হইল একটি লবণাক্ত স্বচ্ছ জলীয় পদার্থ
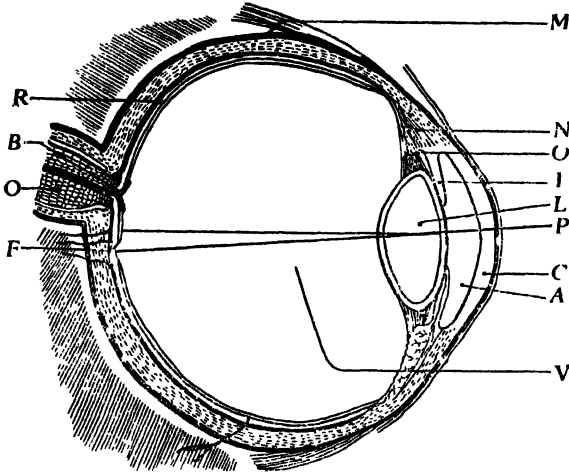
Fig. 30a চক্ষুর ভিতরকার গঠন

যাহার প্রতিসরণাঙ্ক 1·336। C-র পশ্চাতে একটি অস্বচ্ছ গোলাকার পর্দা আছে, উহার নাম **কণীনিকা** (Iris I)। ইহার মাঝে একটি ছিদ্র আছে যাহাকে বলা হয় **তারারন্ধ্র (Pupil P )**, P-র পশ্চাতে আছে একটি **উভোত্তল (double convex) লেন্স** (L)। C-এর আলোক A-র ভিতর দিয়া P পার হইয়া L-এ আসিয়া পড়ে। L-এর পশ্চাৎ দিকের বক্রতা ( curvature ) সম্মুখ দিকের চেয়ে বেশী। অক্ষিগোলকের (eye ball) ভিতর ইহা তন্তু ও পেশীর সাহায্যে লাগান থাকে এবং এই পেশী ও তন্তুর সাহায্যে লেন্সের বক্রতা কমান বা বাড়ান যায়।
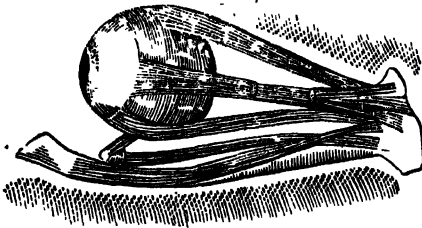
Fig. 30b চক্ষু

**জেলীর মত তরল ও স্বচ্ছ ভিট্রাস হিউমার ( Vitreous Humor V )** : লেন্সের পর আলোক V-কে পার হইয়া অক্ষিপটে (Retina R) পড়ে। চক্ষুর

R অংশটি হইল আলোক-সচেতন (Light Sensitive)। প্রধানতঃ নার্ভ তন্তুই হইল অক্ষিপটের উপাদান এবং চক্ষু-নার্ভের (Optic nerve) দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত ইহা যুক্ত রহিয়াছে। R-এর উপর যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা সদ্ উল্টা এবং আসল বস্তু হইতে আকারে ছোট।

অচ্ছোদপটল C-এর শিখর ভাগ এবং তারারন্ধ্রের মধ্যভাগকে যুক্ত করে যে সরল রেখা, তাহাকে বলে **আলোকীয় অক্ষ (Optic axis)**। অক্ষিপট একটি স্বচ্ছ ঝিল্লী, V এবং **কোরয়েড (choroid)** ঝিল্লি M-এর মধ্যে অবস্থিত। ইহা আটটি পরিস্ফুট স্তরে বিভক্ত। অক্ষিপট সর্বত্র সমানভাবে আলোক সচেতন নয়। যে জায়গায় চক্ষু-নার্ভ (optic nerve) চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, সে জায়গাটিকে বলে **অন্ধবিন্দু (Blind Spot B)**। এইখানে আলো পড়িলেও দেখা যায় না। ইহার কাছেই একটি ছোট গর্তের মত আছে যাহা অক্ষিপটের সবচেয়ে আলোক সচেতন বিন্দু—ইহাকে (Fovea F) অথবা হলদে বিন্দু (Yellow Spot) বলে।

### চক্ষু কেমন করিয়া দেখে :

অচ্ছোদপটল C, লেন্স L এবং দুইটি তরল পদার্থ লইয়া একটি অভিসারী (divergent) লেন্সের সমবায় গঠিত হয়। চক্ষু হইতে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে হইলে তাহাদের প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে পড়া চাই। এদিকে C এবং R-এর মধ্যে দূরত্ব নির্দিষ্ট থাকায় চক্ষুর ফোকাল দৈর্ঘ্য কমাইয়া বাড়াইয়া প্রতিবিম্ব ঠিক অক্ষিপটে ফেলিতে হয়। লেন্সের চারিদিকের পেশীর সঙ্কোচন এবং প্রসারণের দ্বারা চক্ষু ঠিক অক্ষিপটে প্রতিবিম্ব ফেলিতে পারে এবং ইহাকে চক্ষুর উপযোজন (accommodation) ক্ষমতা বলে।

উপযোজনের একটা নির্দিষ্ট সীমানা আছে--আলোকীয় অক্ষ বরাবর **আন্তিক বিন্দু** (near point) এবং **প্রান্তিক বিন্দুর** (far point) মধ্যের দুরত্বকে এর সীমানা বলা হয়।

**আন্তিক বিন্দু** ( near point ) হইল আলোকীয় অক্ষের উপর সেই বিন্দু যাহার স্পষ্ট ছবি R-এ ফেলিতে হইলে চক্ষুর উপযোজন ক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হয়।

**প্রান্তিক বিন্দু** ( far point ) হইল আলোকীয় অক্ষের উপর সেই বিন্দু যাহার স্পষ্ট ছবি চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থায় অক্ষিপটের উপর পড়ে। আন্তিক বিন্দু

হইতে নিকটে যদি কোন বস্তু থাকে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে না। চক্ষু হইতে আন্তিক বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে **সুস্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব** ( least distance of distinct vision ) বলা হয়। স্বাভাবিক চক্ষুর পক্ষে এই দূরত্ব হইল 25 সে. মি. অথবা 10 ইঞ্চি।

**চোখ গেল :** চোখের দোষ : নানাভাবে আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতে পারে। সাধারণতঃ চক্ষুর চারিপ্রকার অস্বাভাবিকতা হইয়া থাকে।

(1) স্বল্প দৃষ্টি ( Myopia, Short sight or near sight )

(2) দীর্ঘ দৃষ্টি ( Hyperopia, or Long sight )

(3) ক্ষীণ দৃষ্টি বা বেশী বয়সের চালশে ( Presbyopia )

(4) বিষম দৃষ্টি ( Astigmatism )

**শক্তি** ( Power ) : চক্ষুর দোষ দূর করিবার জন্য যে বিভিন্ন ফোকাল দৈর্ঘ্যের লেন্স ব্যবহার করা হয় তাহার উল্লেখ করিবার সময় ফোকাল দৈর্ঘ্য না বলিয়া লেন্সের শক্তি বা ক্ষমতা ( Power ) বলা হয়। ইহা ফোকাল দৈর্ঘ্যের ব্যস্তানুপাতিক ( reciprocal ) এবং ফোকাল দৈর্ঘ্য মিটারে গণনা করিলে লেন্সের ক্ষমতার মাপ হইল **ডাই-অপটার** ( diopters )। ধরা যাউক কোন লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য হইল ·5 মি. ( 50 সে. মি. ) অথবা

$$\frac{1}{\cdot 5} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \text{ diopters}$$

(i) **স্বল্পদৃষ্টি :** স্বল্প-দৃষ্টি লোক দূরের জিনিস স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় না। উহাদের প্রান্তিক বিন্দু চক্ষু হইতে সসীম দূরত্বের মধ্যে থাকে, কিন্তু আন্তিক বিন্দু প্রায় স্বাভাবিক চক্ষুর মতই হইয়া থাকে। স্বাভাবিক চক্ষু হইতে স্বল্প-দৃষ্টি চক্ষু
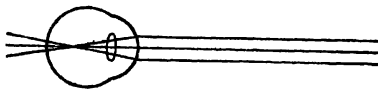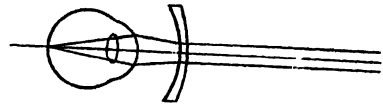
Fig. 31a Fig. 31b

স্বল্প দৃষ্টি

লম্বাটে হইয়া থাকে, ইহার ফলে অধিক দূরের বস্তু হইতে রশ্মিগুচ্ছ L-এর ভিতর দিয়া আসিয়া অক্ষিপটের উপর না করিয়া উহার সম্মুখে প্রতিবিম্ব গঠন করে ( Fig. 31a )। এই লেন্সের শক্তি ( power ) হয় নেগেটিভ। এই দোষ অপসারী লেন্স ব্যবহারের দ্বারা শুধরান যায় ( Fig. 31b )।

(ii) **দীর্ঘ দৃষ্টি :** এই দোষযুক্ত নেত্রের প্রান্তিকবিন্দু অসদ্; ইহা চক্ষুর পিছনে পড়িয়া যায় ( Fig. 32a )। ইহাদের আন্তিক বিন্দু 25 সে. মি.-এর বেশী হয়। দীর্ঘদৃষ্টি লোক দূরের জিনিস স্পষ্টই দেখিতে পায় কিন্তু কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখিতে
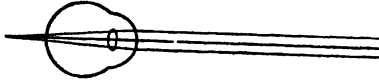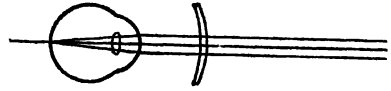
Fig. 32a Fig. 32b

দীর্ঘ দৃষ্টি

পায় না। দীর্ঘদৃষ্টির নেত্র-গোলক স্বাভাবিক চক্ষুর চেয়ে আকারে ছোট হয়। উত্তল লেন্স ব্যবহার করিয়া এই দোষ ঠিক করা যায় ( Fig. 32b )। এই লেন্সের শক্তি (power) হয় পজিটিভ।

(iii) **ক্ষীণ দৃষ্টি :** ইহা বয়সের দরুণ চক্ষু-দোষ। বয়সের সঙ্গে নেত্রের পেশী ও তন্তুগুলির সঙ্কোচন-প্রসারণ ক্ষমতা কমিয়া যায় বলিয়া কিছু পরিমাণে উপযোজন ক্ষমতাও নষ্ট হইয়া যায়। আন্তিক বিন্দু চক্ষুর নিকট হইতে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে দূরে সরিয়া যায়। এই রকম চক্ষুর, কাছের জিনিস দেখিতে অসুবিধা হয়, বই পড়া যায় না বা সেলাই করা যায় না। এই দোষের প্রতিবিধানের জন্য অল্পশক্তি পজিটিভ উত্তল লেন্স ব্যবহার করিতে হয়।

(iv) **বিষম দৃষ্টি :** চক্ষুর এই দোষটি খুব সাধারণ দোষ। আলোকীয় অক্ষের (optic axis) চারিপাশে L-এর বক্রতা সমান না হইলে এই দোষ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় একগুচ্ছ রশ্মি লেন্সের তল হইতে প্রতিসৃত হইলেও একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় না; রশ্মিগুলি দুইটি সরলরেখায় কেন্দ্রীভূত হয় (Fig. 33)।

Fig. 33 বিষম দৃষ্টি

এই দোষ দূর করিতে হইলে সিলিণ্ড্রিকাল লেন্স ব্যবহার করা প্রয়োজন।

আমরা দুই চক্ষু দিয়া বস্তুর দুইটি প্রতিবিম্ব দেখি এবং অক্ষিপটে এই প্রতিবিম্ব উল্টা হইয়া পড়িলেও মস্তিষ্কের সাহায্যে আমরা একটি সোজা প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। এখন বস্তুটিকে সরাইয়া লওয়া হইলেও $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত সেই অনুভূতি অক্ষিপটে বর্তমান থাকে। ইহাকে বলে দৃষ্টির নির্বন্ধ (persistence of vision)। আমরা যে সিনেমার ছবি দেখি আসলে তাহা অনেকগুলি ছবি পর পর অতি দ্রুতবেগে ( $\frac{1}{10}$ সেঃ-এর চেয়ে কম) চক্ষুর সম্মুখে ঘোরান হইয়াছে। এইভাবে ঘুরাইলে মনে হইবে এটি একটি অখণ্ড ছবি।

## C6. প্রিজ্‌ম ( Prism ) ও আলোকের বিচ্ছুরণ ( Dispersion )

বায়ুশূন্য স্থানে যে কোন রঙের আলোর গতিবেগ একই কিন্তু কোন বস্তু-মাধ্যমে বিভিন্ন রঙের আলোর গতিবেগ বিভিন্ন। আবার বিভিন্ন মাধ্যমে নীল, লাল, সবুজ ইত্যাদি নানা রঙের আলোর গতিবেগ আলাদা। কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের বা বস্তুর, দুটি পৃষ্ঠ ( surface ) যদি পরস্পরের সহিত A কোণ করে এবং আলোক রশ্মি AB পৃষ্ঠে আপতিত হইয়া AC দিয়া বাহির হয় তাহা হইলে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যাইবে।
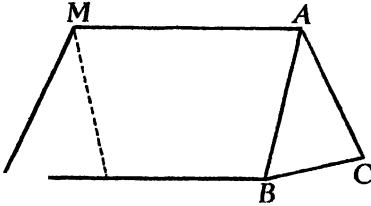
Fig. 34 প্রিজ্‌ম্

এই ত্রিকোণ গঠনের কোন নিরেট স্বচ্ছ বস্তুকে প্রিজ্‌ম্ বলা হয়। দুইটি প্রতিসরণ তল AB ও AC-র মাঝের কোণ A-কে প্রিজ্‌মের কোণ বলে এবং AB ও AC-র মিলনরেখাকে প্রিজ্‌মের প্রান্ত ( edge AM ) বলে ( Fig. 34 )। এই প্রান্তের বিপরীত দিকে BC হইল প্রিজ্‌মের ভূমি ( base )। BAC হইল প্রিজ্‌মের প্রধান ছেদ ( main section )। প্রিজ্‌মের AB পৃষ্ঠে সাদা আলো পড়িলে উহা AB এবং AC দুই তলে দুইবার প্রতিসৃত হইয়া যখন বাহিরে আসিবে তখন সাদা আলোর সাতটি উপাদান রঙে বিচ্ছুরিত ( dispersed ) হইবে। এই সাতটি রঙ হইল যথাক্রমে বেগুনী (violet), নীল ( Indigo ), আকাশী নীল (Blue), সবুজ ( green ), হলদে (yellow), কমলা ( orange ) এবং লাল ( Red )। ইংরাজিতে এগুলিকে পর-পর সাজাইলে হইবে V I B G Y O R।
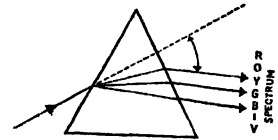
Fig. 35 প্রিজ্‌মের সাহায্যে বর্ণালি গঠন
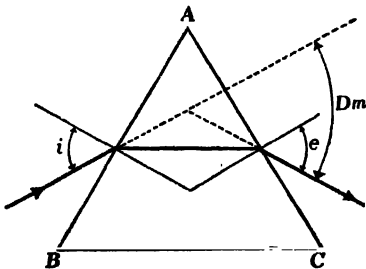
প্রিজ্‌মের AB পৃষ্ঠে আপতিত রশ্মি প্রিজ্‌মের ভিতর প্রবেশ করিয়া অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায় আবার AC পৃষ্ঠে বাহির হইয়া আসিবার সময় অভিলম্বের নিকট হইতে সরিয়া যায়। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত i কোণ করে এবং নির্গত

Fig. 36 প্রিজ্‌মের ভিতর আলোর গতি

রশ্মি ( emergent ray ) e কোণ করে। আপতিত রশ্মি এবং নির্গত রশ্মিকে বর্ধিত করিলে পরস্পরকে ছেদ (cut) করে এবং যে কোণের সৃষ্টি করে তাহাকে বলে চ্যুতি কোণ বা বিসরণ কোণ ( angle of deviation )। কোন একটি বিশেষ রঙের আলোর জন্যে যে চ্যুতি কোণ D তাহা প্রিজ্‌মের উপাদান বস্তু, প্রিজ্‌মের কোণ A ( AB এবং AC যে কোণ করে ) এবং আপতন কোণ i-এর উপর নির্ভর করে।

আলোকের তরঙ্গ-রূপ (Fig. 37) যদি বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে লাল আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশী এবং ক্রমান্বয়ে কমিতে কমিতে বেগুনী আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবার চেয়ে কম হয় লালের চেয়ে বড় (infra-red) এবং বেগুনীর চেয়ে ছোট ( ultra-violet ) তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও আছে, কিন্তু সে আলোক আমরা দেখিতে পাই না। বিচ্যুতির (deviation) ক্ষেত্রে দেখা যায় লাল আলোর বিচ্যুতি সবার চেয়ে কম আর বেগুনীর সবচেয়ে বেশী।
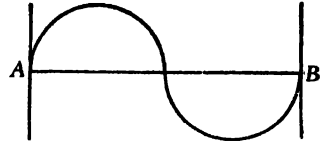
Fig. 37 আলোর তরঙ্গ-রূপ. AB হইল একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

বিভিন্ন রঙের আলোর এইরূপ বিভিন্ন বিচ্যুতির জন্যই আমরা সাদা আলো প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া পাঠাইলে সাতটি রঙকে বিশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। বিচ্ছুরিত আলোর দ্বারা যে একটি রঙিন পটির ( band ) সৃষ্টি হয়, ইহাকে বর্ণালি ( spectrum ) বলে।

## C7 আলোকীয় যন্ত্রপাতি ( Optical Instruments )

(i) **বিবর্ধক কাচ** ( Magnifying glass ) **বা সরল অণুবীক্ষণ** ( Simple microscope )ঃ কোন বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে চক্ষুর যতটা নিকটে সম্ভব লইয়া আসিতে হয়। যতই কাছে লইয়া আসা যায় বস্তুটিকে
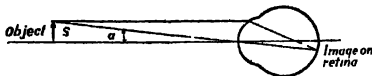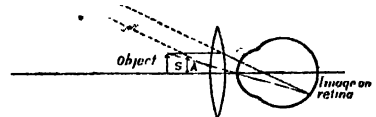
Fig. 38a Fig. 38b

বিবর্ধক কাচ

ততই বড় দেখায় (Fig. 38a) কিন্তু আন্তিক বিন্দু ছাড়াইয়া আরও নিকটে আনিলে অক্ষিপটে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা ঝাপসা দেখায়। একটি অভিসারী লেন্সকে

( উভোত্তল ) বিবর্ধক কাচ হিসাবে ব্যবহার করিলে এই অসুবিধা দূর করা যায় (Fig. 38b)। বিবর্ধক কাচ ব্যবহার করিবার সময় বস্তুটিকে লেন্সের প্রধান ফোকাসে বা তাহার ভিতরে রাখিতে হইবে; তাহা হইলে বস্তুর প্রতিটি বিন্দু হইতে সমান্তরাল রশ্মিগুলি দৃষ্টিপথে আসিবে। এই লেন্সের দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্বটি হইবে অসীম।

## (ii) ম্যাজিক লণ্ঠন ( Magic Lantern )

এই লণ্ঠনের সাহায্যে লেন্স হইতে বেশ তফাতে, দেওয়াল অথবা পর্দার গায়ে, বস্তুর সদৃ, বড় এবং উল্টা প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।
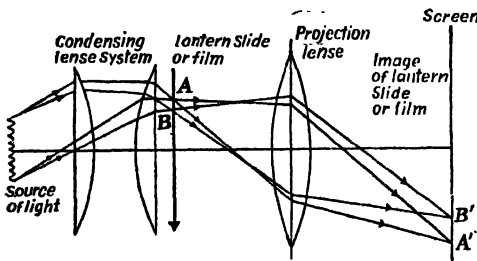
Fig. 39 ম্যাজিক লণ্ঠনের কার্যপ্রণালী

সাধারণতঃ বক্তৃতা দিবার সময় অথবা ক্লাসে লেকচারের সময় দরকারী ছবির স্লাইড অথবা ফিল্ম এইভাবে শ্রোতা, দর্শক কিংবা ছাত্রদের দেখান হয়।

**ম্যাজিক লণ্ঠনের কলকব্জা :**

(1) **আলোকের উৎস :** খুব জোরাল আলো প্রয়োজন বলিয়া কার্বন আর্ক বা ট্যাঙ্গষ্টেন ফিলামেণ্ট ব্যবহার করা হয়। এই উৎস হইতে খুব জোর আলো পাওয়া যায়।

(2) **লেন্সের সমবায় :** আলোক উৎসের সম্মুখে একদিকে সমতল ও অপর দিকে উত্তল এমন দুইটি লেন্সের উত্তল দুই দিক মুখোমুখী রাখা হয়। ইহাকে **ঘণীকরণ লেন্স** ( condensing Lens ) বলে, কারণ উৎস হইতে অপসারী আলোকরশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়া যাইয়া কেন্দ্রীভূত বা অভিসারী হয়।

অপর একটি অভিসারী লেন্স বস্তুর প্রতিবিম্ব পর্দায় ফেলিতে সাহায্য করে—ইহা হইল **Projection Lens** অথবা **Focussing Lens**। ইহা এত বড় হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সমস্ত আলো উহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে।

(3) **বস্তুর অবস্থান :** উপরে বর্ণিত দুই প্রকার লেন্সের মাঝে বস্তুকে রাখা হয়। Projection Lens-এর প্রধান ফোকাসের খুব কাছে বস্তুকে রাখিলে পর্দায় স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাইবে। সাধারণতঃ বস্তুকে স্থির রাখিয়া লেন্সটিকে সরাইয়া ফোকাস করা হয়।

(4) **পর্দা** ( Screen ) পর্দার উপরে বস্তুর যে কোন অংশ AB-র বর্ধিত, উল্টা, সদ্বিম্ব A´B´ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইভাবে প্রতিটি অংশ জুড়িলে সম্পূর্ণ বস্তুটির প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে।

(iii) **ক্যামেরা** ( Camera ) আলোকচিত্র গ্রহণের ক্যামেরার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রধান হইল :

(1) একটি **আলোক নিরুদ্ধ বাক্স**, যাহার ভিতরে আলো আসিবার পথ আছে এবং সে পথ বন্ধ করিবারও ব্যবস্থা আছে। এই বাক্সটি অনেক সময় ছোট বড় করিবার ব্যবস্থা থাকে (Fig. 40a)।
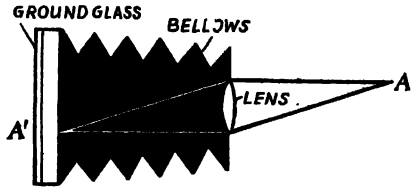
Fig. 40a

(2) **লেন্সের সমবায় :** এই লেন্সের সাহায্যে বস্তুর প্রতিবিম্ব বাক্সের ভিতর ফেলিতে পারা যায়।
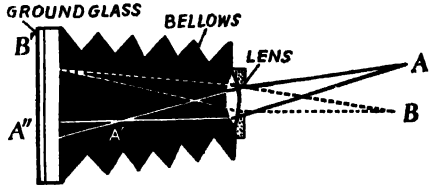
(3) প্রতিবিম্বকে ফোকাস করিয়া আলোক নিরুদ্ধ বাক্সের ভিতরে **ফিল্ম বা প্লেটের** উপর ফেলিলে প্রতিবিম্বটিকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যায় (Fig. 40b)। ফিল্ম বা প্লেট সেলুলয়েড অথবা কাচের তৈরী হয় এবং উহার উপরে রাসায়নিক পদার্থ সিলভার ব্রোমাইডের ( silver bromide ) একটি অতি পাতলা স্তর থাকে। আলোকচিত্র গ্রহণ করিবার সময় এই প্লেট যখন আলোর সংস্পর্শে আসে, তখন সিলভার ব্রোমাইড বিযুক্ত ( dissociated ) হইয়া যায়। ইহার পর অন্য রাসায়নিক পদার্থ দিয়া ফিল্ম অথবা প্লেটকে ধুইবার পর ব্রোমিন চলিয়া যায়, কিন্তু যে সব জায়গায় আলোক পড়িয়াছে সেখানে রূপা থাকিয়া যায়।

Fig. 40b
ক্যামেরার কার্যপ্রণালী

ক্যামেরার ভালমন্দ নির্ভর করে বেশীটাই লেন্সের উপর। যে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয় তাহা সাধারণতঃ একাধিক উভোত্তল লেন্সের সমবায়ে গঠিত হয়। ছবিতে দুইটি ঐরূপ লেন্সের মাঝে কণীনিকা পর্দা ( Iris diaphragm ) দেখান হইয়াছে। আলো আসার এই ছিদ্রের—ইহাকে উন্মেষ বা aperture বলে—ব্যাস ইচ্ছামত কমান-বাড়ান যায় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া আলোক আনিবার জন্য পর্দার কাছে একটি সাটারের ( shutter ) ব্যবস্থা আছে যাহাকে নির্দিষ্ট সময়ের মত খুলিয়া রাখা বা বন্ধ করা যায়।

লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ দূরত্বে যদি বস্তু থাকে, তাহা হইলে F এবং 2F-এর মধ্যে প্রতিবিম্ব হইবে। যখন বস্তু বহু দূরে থাকে, তখন প্রতিবিম্ব প্রধান ফোকাল তলে গঠিত হয় এবং P প্লেটকে ঐ জায়গায় রাখিতে হইবে।

লেন্সটিকে ফিল্মের কাছে আনা বা দূরে সরানর ব্যবস্থা থাকে বলিয়া বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর আলোকচিত্র লওয়া সম্ভব হয়।

কয়েক প্রকারের বাক্স ক্যামেরায় (Box Camera) লেন্স স্থির থাকে। ইহাদের ফোকাল দৈর্ঘ্য ছোট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর দূরত্ব 6 ফিটের অধিক থাকে, ততক্ষণ প্রধান ফোকাসের কাছেই প্রায় স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

### (iv) যৌগিক অণুবীক্ষণ (Compound Microscope)

খুব ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখিবার জন্য এই যৌগিক অণুবীক্ষণ ব্যবহার করা হয়। জীবাণু, কোষ ( জীবকোষ বা উদ্ভিদ কোষ ) ইত্যাদির আকার প্রকার ইহার দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। ইহা উত্তল লেন্সের দুইটি সমবায়ে গঠিত। একটিকে বলে অভিলক্ষ্য লেন্স ( objective lens ) $L_1$। ইহার ফোকাল দৈর্ঘ্য খুব কম এবং দেখিবার বস্তুটিকে প্রধান ফোকাসের ঠিক বাহিরেই রাখা হয়। $L_1$ হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বস্তুর একটি উল্টা সদ্বিম্ব গঠিত হয়। অভিনেত্র লেন্স ( eye piece ) $L_2$ কে বিবর্ধক কাজের ন্যায় ব্যবহার করিয়া এই $I_1$ প্রতিবিম্বটি দেখা হয়। $L_1$ এবং $L_2$-কে দুইটি পিতলের নলের মধ্যে রাখা হয় এবং নলের ভিতর লেন্স দুইটিকে সুবিধামত নড়াচড়া করান যায়। যদি সমান্তরাল আলোর জন্য চক্ষু ফোকাস করা হয়, তাহা হইলে $I_1$-এর প্রতিবিম্ব প্রধান ফোকাস $F_1$-তে না পড়া পর্যন্ত $L_2$কে সরাইতে হইবে যাহার ফলে মনে হইবে যে অসীমে অবস্থিত $I_1$ এর একটি সদ্বিম্ব $I_2$ হইতেই এই সমান্তরাল রশ্মি আসিতেছে।

Fig. 41 যৌগিক অণুবীক্ষণের কার্যপ্রণালী

(v) **দূরবীক্ষণ** (Telescope) : দূরবীক্ষণ নাম হইতেই বোঝা যায় যে ইহার দ্বারা দূরের জিনিসকে দেখা যায়। শুধু চোখে দূরের কোন বস্তুকে ছোট দেখায়, দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরের জিনিস কাছে এবং বড় দেখায়।

গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদি দেখার জন্য যে দূরবীক্ষণ ব্যবহার করা হয়, তাহাকে **এস্ট্রনমিক্যাল দূরবীক্ষণ** (astronomical telescope) বলে। ইহাতে একটি উত্তল অভিলক্ষ্য (objective) লেন্স $L_1$ এবং আর একটি উত্তল অভিনেত্র (eye piece) $L_2$ লেন্স থাকে। বহুদূরে অবস্থিত কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশ হইতে অনেক সমান্তরাল রশ্মি আসিয়া $L_1$-এ পড়িবে। প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইয়া $L_1$-এর মুখ্য ফোকাসে রশ্মিগুলি কেন্দ্রীভূত হইবে। কতকগুলি পরস্পর সমান্তরাল রশ্মি যদি প্রধান অক্ষের সহিত সামান্য কোণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই রশ্মিগুলি $L_1$-এর ফোকাল সমতলের কোন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইবে। $L_1$-এর প্রধান ফোকাস হইতে $L_2$-র ফোকাল দৈর্ঘ্য f দূরত্বে যদি $L_2$-কে রাখা হয়, তাহা হইলে, $L_1$-এর ফোকাল সমতলে গঠিত প্রতিবিম্ব হইতে রশ্মিগুলি $L_2$-র ভিতর দিয়া সমান্তরাল হইয়া বাহির হইবে। $L_1$ এবং $L_2$র মধ্যে দূরত্ব হইলে $f+F$ ($F=L_1$-এর ফোকাসের দৈর্ঘ্য)। $L_1$ এবং $L_2$ দুইটি পরস্পর-লাগান পিতলের নলের ভিতর সমাক্ষভাবে (Co-axially) বসান থাকে। একটি নল অপরটির মধ্যে নাড়াইবার বা সরাইবার ব্যবস্থা আছে। এই দূরবীক্ষণে যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহা দুই ভাবেই উল্টা (inverted and reversed)।
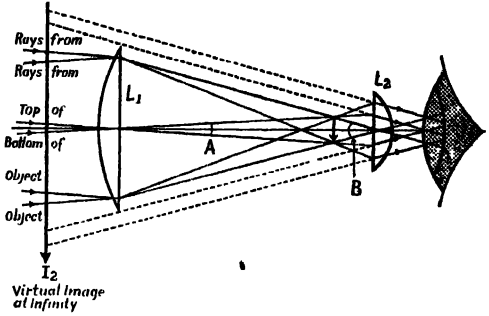
Fig. 42 দূরবীক্ষণের কার্যপ্রণালী

(vi) **মর্ত দূরবীক্ষণ** (Terrestrial telescope) :

আমাদের এই পৃথিবীর উপরের সকল জিনিস ভাল করিয়া দেখিতে হইলে, উল্টা দেখিলে মুস্কিল হইবে তাই, এস্ট্রনমিক্যাল দূরবীক্ষণকে কিছু রদ বদল করিয়া লইতে হয়। মর্ত দূরবীক্ষণের (terrestrial telescope) $L_1$এবং $L_2$র ফোকাল সমতলের মাঝে যদি আর একটি উত্তল লেন্স বসান যায়, তাহা হইলে সোজা প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে। আরও একপ্রকার দূরবীক্ষণকে বাইনকুলার

(Binocular) বলা হয়। ইহাতে দুইটি দূরবীক্ষণ একত্রে জোড়া থাকে এবং দূরবীক্ষণের নলের ভিতর 90° কোণ প্রিজ্‌ম্‌ থাকে যাহার সাহায্যে সোজা প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

## প্রশ্নাবলী

1. আলোক ও দৃষ্টির মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা লিখ।
2. আলোকের প্রকৃতি কি? উহার গতিপথ যে সরল তাহার কয়েকটি উদাহরণ দাও।
3. গ্রহণ কয় প্রকারের এবং কেন হয়?
4. দীপক এবং আলোক রোধকারী অস্বচ্ছ বস্তুর আকার ও প্রকারের উপর ছায়ার আকৃতি কি ভাবে নির্ভর করে? পর্দা কাছে আনিলে বা দূরে সরাইলে ছায়ার কি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে?
5. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন পাঁচটি সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ:
   (i) অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ, (ii) অপসারী রশ্মিগুচ্ছ, (iii) বলয়গ্রাস, (iv) প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া, (v) পেরিস্কোপ, (vi) সূচিছিদ্র ক্যামেরা।
6. আলোকের প্রতিফলনের নিয়ম বিবৃত কর। সমতল দর্পণে প্রতিফলনের উদাহরণ দাও। পার্শ্বীয় পরিবর্তন কাহাকে বলে?
7. উত্তল এবং অবতল দর্পণের (i) ফোকাল দৈর্ঘ্য (ii) বক্রতা ব্যাসার্ধ, (iii) বক্রতা কেন্দ্র কাহাকে বলে তাহা রেখার সাহায্যে বুঝাও। বস্তুর অবস্থান যদি ফোকাল দূরত্বে হয় তাহা হইলে অবতল দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব কেমন হইবে তাহা আঁকিয়া দেখাও।
8. আলোকের প্রতিসরণ বলিতে কি বুঝায়? প্রতিসরণের নিয়ম লিখ। প্রতিসরনাঙ্ক কাহাকে বলে?
9. সংক্ষেপে বিবৃত কর:
   (i) আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন, (ii) একটি শূন্য পাত্রে যদি একটি মুদ্রা রাখা যায় তাহা যেমন দেখা যাইবে পাত্রটি জলপূর্ণ হইলে দেখিতে কি তফাৎ হইবে?
10. লেন্স কাহাকে বলে ও কয় প্রকারের হয়। লেন্সের বক্রতা কেন্দ্র, মধ্য বিন্দু, বক্রতা ব্যাসার্ধ ও ফোকাল দৈর্ঘ্য আঁকিয়া দেখাও।
11. লেন্সের মাধ্যমে আলোকের প্রতিফলন হয় না প্রতিসরণ হয়? লেন্সের সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠন সম্পর্কে যাহা জান তাহা সংক্ষেপে লিখ এবং আঁকিয়া দেখাও।
12. চক্ষুর বিভিন্ন অংশগুলি বিবৃত কর (সম্ভব হইলে আঁকিয়া দেখাও)। চক্ষুর দোষ কয় প্রকারের, কেন হয় এবং তাহাদের কি ভাবে সংশোধন করা যায়?
13. সাদা আলো যে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সংমিশ্রণ তাহা কি ভাবে পরীক্ষা করিলে বুঝা যায়? শুদ্ধ বর্ণালি কি রূপে গঠন করিবে?
14. বিভিন্ন আলোকীয় যন্ত্র আমাদের কি ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা বর্ণনা কর। (যন্ত্রগুলি সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই. প্রত্যেকটি যন্ত্রের কার্যকারিতা বুঝাইলেই চলিবে)।
15. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির যে কোন দুইটি রেখা এবং লেখার সাহায্যে বিশদভাবে বর্ণনা কর:
   (i) যৌগিক অণুবীক্ষণ, (ii) বিবর্ধক কাচ, (iii) দূরবীক্ষণ, (iv) ম্যাজিক লণ্ঠন, (v) ক্যামেরা।

---

# D. Heat—Syllabus

*The portions in the Syllabus underlined are optional and may be omitted until further notice*

| Course Content | Demonstration & Experiments |
|---|---|
| D1. MAIN SOURCES OF HEAT : Sun, mechanical action (friction), chemical reactions (burning of fuels), electricity. | Ball and ring experiment, bar breaking. |
| D2. EFFECTS OF HEAT : expansion of solids, liquids, gases, (examples and applications) land and sea breezes. | Expansion of different metals, of liquids and of gases. |
| D3. THERMOMETERS ; fixed points and scales ; maximum and minimum thermometer, clinical thermometer. | Calibration of thermometer. |
| D4. CHANGE OF STATE : melting, evaporation, boiling ; condensing, freezing ; heat required for melting, evaporation. | Melting and boiling points of different substances, preparation of ice by cooling other. |
| D5. HOW HEAT TRAVELS : conduction (clothing and body covering), convection (heating and ventilation) radiation (luminous and non-luminous rays), the sun-heated green house, reflection and absorption of heat says by different types of surfaces. Thermos flask. | Conduction : IngenHausz' experiment, convention of liquids and gases. Radiation ; demonstration with ether thermoscope. |
| D6. ENERGY : steam engines, reciprocating engine (steam boiler) (locomotive), steam turbine, internal combustion engine (motor car, aeroplane), jet engine. | Demonstration of models, or by use of charts. |

## সারাংশ

D1 ·1 **তাপের স্বরূপ — অণুর কম্পমান অবস্থার নাম, একপ্রকার শক্তি**

·2 **তাপ পাওয়া যায়** (Source) :

(*i*) সূর্য (Sun) হইতে—বিনা চেষ্টায়

(*ii*) যান্ত্রিক (Mechanical) প্রথায় – যন্ত্র ব্যবহারে

(*iii*) রাসায়নিক (Chemical) প্রক্রিয়ায় —বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তনে

(*iv*) বৈদ্যুতিক (Electrical) উপায়ে—তড়িৎ প্রবাহের ফলে

D2 ·1 **তাপ নিজে অদৃশ্য কিন্তু তাহার প্রযুক্তির ফলে বস্তুর পরিবর্তন ঘটে** (Effects of heat)—

(*i*) বস্তুর উত্তাপ (Heat) বাড়ায়

(*ii*) প্রসারণ (Expansion) ঘটায়

(*iii*) অবস্থান্তর (Change of state) ঘটায়

(*iv*) তড়িতের (Electricity) উদ্ভব করায়

·2 **কঠিন পদার্থের** (solid) **প্রসারণ** (Expansion of solids) **তরল পদার্থ** অপেক্ষা **কম** হয়। **তরল পদার্থের প্রসারণ** (Expansion of Liquids) **গ্যাসীয় পদার্থের** অপেক্ষা **কম** হয়। **গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ** (Expansion of gases) **কঠিন ও তরল পদার্থ** অপেক্ষা **বেশী** হয়।

·3 বিভিন্ন **পদার্থের প্রসারণের বৈসাদৃশ্য** তাহাদের **অণুর ঘন সন্নিবিষ্টতার উপর নির্ভরশীল**

·4 **সূর্যতাপ বায়ুর প্রসারণ ঘটায়,** তাহার ফলে প্রসারণজনিত শূন্যস্থান পূরণের জন্য সৃষ্টি হয়-

(*i*) দিনমানে জলবায়ু (Sea breeze)

(*ii*) রাত্রে স্থলবায়ু (Land breeze)

D3 ·1 **সাঙ্কেতিক উপায়ে তাপের মাত্রা নিরূপণ** করা হয় **থার্মোমিটার** (Thermometer) সাহায্যে

·2 **পারদ স্তম্ভের** (Mercury Column) ওঠানামা **উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধির** (Temperature) **পরিচায়ক**

·3 **নিম্ন স্থিরাঙ্ক ও উচ্চ স্থিরাঙ্কের** মাঝে ঘর কাটার পার্থক্য (Fixed points), বিভিন্ন স্কেল (Scales)—

(*i*) সেণ্টিগ্রেডে—১০০ ভাগ

(*ii*) ফার্নহাইটে —১৮০ ভাগ

(*iii*) রোমারে — ৮০ ভাগ

(*iv*) $1°C = \frac{9}{5}°F = \frac{4}{5}°R$

বিভিন্ন রকমের থার্মোমিটার

·4 **সিক্সএর স্বয়ংক্রিয় থার্মোমিটার**—একই সঙ্গে **সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা** (Maximum & Minimum) নিরূপণ

·5 **ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার**— জ্বর দেখিবার জন্য

D4 ·1 **তাপ পদার্থের অবস্থান্তর ঘটায়** (Change of state)

·2 **তাপ যুক্তিতে**

(*i*) কঠিন পদার্থের গলন (Melting) হয়

(*ii*) তরল পদার্থের বাষ্পীভবন (Evaporation) হয়

(*iii*) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় স্ফুটন (boiling) হয়

(*iv*) তরল পদার্থের যে কোন তাপমাত্রায় বাষ্পীকরণ (Vaporisation) হয়

**তাপ মুক্তিতে**

(*i*) তরল পদার্থের কঠিনীভবন (Solidification) হয়

(*ii*) গ্যাসীয় পদার্থের তরলীভবন (Condensation) হয়

(*iii*) তরল পদার্থের কঠিন আকার (Freezing) ধারণ হয়

**D5 ·1 তাপ চরিষ্ণু** (Heat travels)—তিন প্রকারের সঞ্চরণ

·2 **পরিবহণ** (Conduction)—অণু স্থান ত্যাগ করে না ; দেহাবরণে

·3 **পরিচলন** (Convection)—অণু স্থান ত্যাগ করে : জলীয় পদার্থে

·4 **বিকিরণ** (Radiation)—দীপ্তিহীন ও দীপ্তিশীল রশ্মি ; এক্সরে

·5 **সবুজ ঘর** (Green House)—সূর্যরশ্মি ধরিবার ফাঁদ বিশেষ

·6 **বিকীর্ণ তাপের প্রতিফলন** (Reflection) ও **শোষণ** (absorption)

·7 **থার্মোফ্লাস্ক** (Thermosflask)- তাপবন্দী রাখিবার কল

**D6 ·1 তাপশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ**

·2 দাহ্য পদার্থ **দহনজনিত তাপের সাহায্যে নানান স্বয়ংক্রিয় যানবাহন পরিচালনা**

·3 **এনজিনের প্রকার**

(*i*) বহির্দহন এনজিন (External Combustion Engine)- বাষ্পীয় রেল এঞ্জিন

(*ii*) অন্তর্দহন এনজিন (Internal Combustion Engine)—গ্যাসীয় মটর এঞ্জিন

·4 **বাষ্পের কল এনজিন**

·5 **বাষ্পীয় ও গ্যাসীয় এনজিনের তুলনা**

# D তাপ Heat
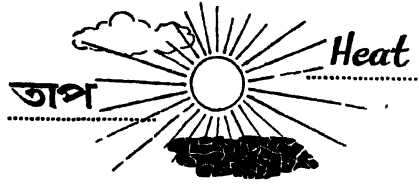
## D1·1 তাপের স্বরূপ

তাপ এমন কিছু যাহা চোখে দেখিতে পাই না, কিন্তু সহজে অনুভব করিতে পারি। তাপের ওজন নাই, কারণ ইহা কোন বস্তু বিশেষ নয়। ইহা এক প্রকার শক্তি। অন্য কোন বস্তুর ভিতরে ( অর্থাৎ সেই বস্তু তাপিত হইলে ) তাপের ক্রিয়াকে বুঝা যায়। তাপহীন অবস্থায় বস্তুকে ঠাণ্ডা মনে হয় এবং তাপযুক্ত অবস্থায় গরম। আসলে এ পৃথিবীতে কোন কিছুই সম্পূর্ণ তাপহীন নয়। বৈজ্ঞানিকের কাছে বরফেরও উষ্ণতা আছে। নগণ্য হইলেও একেবারে তাহা তাপহীন নহে। কমই হউক, আর বেশাই হউক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে তাপের উষ্ণতাকে মাপা যায়। তাপ মাত্রা মাপিবার যন্ত্র হইল থার্মোমিটার। বস্তুর মধ্যে তাপের নানান ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে এখন আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি। মানুষের জীবনে তাপের প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ। নিজেদের গায়ের উত্তাপ আমৃত্যু থাকে। তাপশক্তিকে মানুষ তাহার জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য আজ্ঞাবাহী করিয়াছে। তাহার যন্ত্রপাতি, যানবাহন প্রভৃতি অনেক কিছু তাপ পরিচালিত।

**তাপ এক রকম শক্তি**

**বস্তু+তাপ=অণুর অধিকতর কম্পমান অবস্থা ; অর্থাৎ বস্তুর উষ্ণতা**

**বস্তু—তাপ=অণুর অনধিক কম্পমান অবস্থা ; অর্থাৎ বস্তুর শীতলতা**

### D1·2 তাপ কোথা হইতে আসে (Source) :

মানুষের হাতে এখন অপর্যাপ্ত তাপশক্তি আসিয়াছে। ইহার অধিকাংশই প্রকৃতির মাঝে অকৃপণ দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। উহার জন্য মানুষকে কোন সাধ্যসাধনা করিতে হয় নাই। ইহা ছাড়াও মানুষ নিজের বুদ্ধির কৌশলে আরও বিচিত্র উপায়ে তাপশক্তির নানা উৎসমুখ আবিষ্কার করিয়াছে। সেখান হইতে

পাওয়া তাপশক্তি মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। তাপের বিভিন্ন উৎসসমূহ (Fig. 1) নীচে বলা হইল :

**(i) তাপের প্রধান উৎস—সূর্য কিরণ : বিনা চেষ্টায়**

অনন্তকাল হইতে আকাশে সূর্য নিজে জ্বলিয়া পৃথিবীকে কিরণদান করিতেছে। এই কিরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিপুল তাপ আসিয়া পড়িতেছে। সূর্য হইতে যত তাপ পৃথিবীতে আসে, তাহা এক জায়গায় জড় করিলে দশ লক্ষ মণ জল ফুটিতে মাত্র এক মিনিট লাগিবে। সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আসা বন্ধ হইলে পৃথিবীতে জীবনের সকল চিহ্ন ক্রমে মুছিয়া যাইবে। সৃষ্টির আধার এই সূর্য।

**(ii) তাপের দ্বিতীয় উৎস—যান্ত্রিক উপায়ে : যথাযথ যন্ত্র ব্যবহারে**

মানুষ গতি শক্তিকে তাপশক্তিতে পরিবর্তিত করিতে পারে। কোন দুইটি জিনিসের ঘর্ষণের সময় তাপশক্তির আবির্ভাব হয়। ছুরি-কাঁচি শান দিবার সময়, কাঠে কিম্বা লোহায় তুরপূণ দিয়া ছেঁদা করিবার সময়, চকমকি পাথরের ঘর্ষণের সময় তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। এ তাপশক্তির উৎস যন্ত্রের ব্যবহার, সূর্য কিরণের মত এখানে তাপ স্বাভাবিক ভাবে ও বিনা চেষ্টায় পাওয়া যায় না।
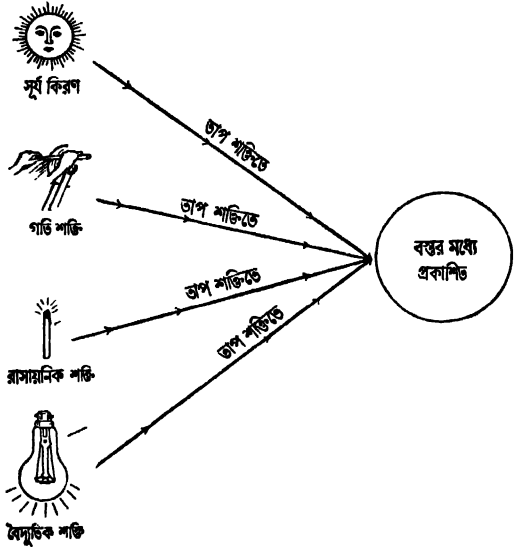
Fig. 1 তাপের বিভিন্ন উৎস

**(iii) তাপের তৃতীয় উৎস—রাসায়নিক উপায়ে : রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে**

কোন কিছু দাহ্য পদার্থ জ্বলিবার সময় তাপশক্তির বিকাশ ঘটে। কাঠ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি জিনিসের ভিতর যে রাসায়নিক শক্তি আছে, তাহা বায়ুর মধ্যেকার

অক্সিজেনের সঙ্গে সংস্পর্শে আসিয়া তাপশক্তিরূপে প্রকাশ পায়। ফুলঝুরি, পটকা, প্রদীপের সলতে হইতে যে তাপ পাওয়া যায়, তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। আমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, শ্বাসকার্য চালনা প্রভৃতি যাবতীয় জীবনের কর্মচাঞ্চল্য মুখ্যত নানাপ্রকার রাসায়নিক ঘটনার ফল (Fig. 2)। সেখান হইতে সর্বদা ৯৮°৪ F° তাপ বাহির হইতেছে।
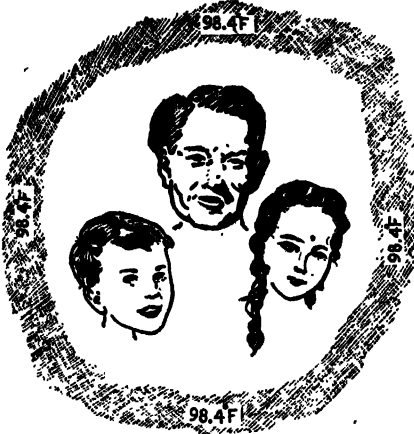
Fig. 2 জীবনের কর্মচাঞ্চল্যেও তাপশক্তি বর্তমান

**(iv) তাপের চতুর্থ উৎস—বৈদ্যুতিক উপায়ে :** তারের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহিত হইলে আলো এবং তাপ দুইই সৃষ্টি হয়। বিজলী বাতি ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে স্টোভ, হিটার, ইস্তিরি প্রভৃতির ব্যবহার সম্ভব, কারণ তড়িৎ-শক্তি অচিরে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। দামোদর উপত্যকা হইতে বিজলী সরবরাহ করার উদ্দেশ্য হইল গ্রামে এবং গ্রামান্তরে বিজলীর আলো, তাপ ইত্যাদি সহজে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

### তাপ—১নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** তাপ বস্তুর প্রসারণ ঘটায়

**পরীক্ষার উপকরণ :** পিতলের আংটা ও বল, বলটির মাপ আংটা হইতে ঈষৎ ছোট হইবে যাহাতে আংটার মধ্য দিয়া ঠিক গলিয়া যাইতে পারে, বুনসেন দীপ।

Fig. 3 আংটা ও বল পরীক্ষা

**প্রণালী :**

আংটার ভিতর দিয়া বলটিকে গলাও ( Fig. 3 )। দেখ অতি সহজে বল গলিয়া যাইতেছে। এখন বুনসেন দীপের
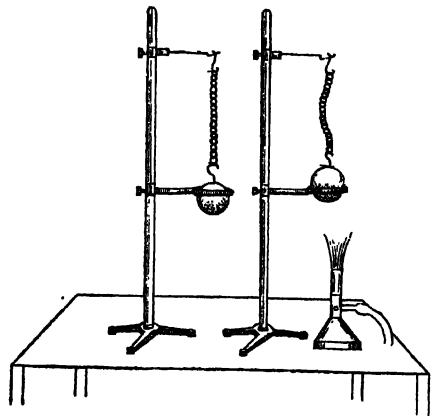
সাহায্যে বলটিকে উত্তপ্ত কর এবং দ্বিতীয়বার বলটিকে আংটার উপর রাখ। এখন বল আংটার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতে পারে না। ইহার কিছু পরে বল আংটার ভিতর দিয়া গলিয়া গেল।

অতএব প্রমাণিত হইল যে :

**(i) তাপ পিতলের বলটির আয়তনবৃদ্ধি ঘটায়।**

**(ii) তাপ প্রশমিত হইলে বল সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব আয়তন পায় ও আংটার ভিতর দিয়া গলে।**

### তাপ—২নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** বিভিন্ন পদার্থের প্রসারণ এক নয়

**পরীক্ষার উপকরণ :** সমান মাপের রিবেট করা পিতল ও লোহার পাত, বুনসেন দীপ।

**প্রণালী :**

পিতল ও লোহার জোড়া দেওয়া পাতটিকে বুনসেন দীপ দ্বারা উত্তপ্ত কর (Fig. 4)। কিছুক্ষণ তাপ দিবার পর সোজা পাতটি আর সোজা রহিল না, বাঁকিয়া গেল।

Fig. 4 লোহা ও পিতলের প্রসারণ পরীক্ষা

অতএব প্রমাণিত হইল :

**(i) লোহা ও পিতলের প্রসারণ এক নয়।**
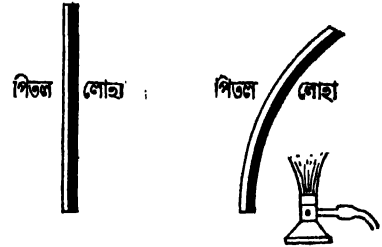
**(ii) এক নয় বলিয়াই পিতল যতখানি বাড়ে লোহা ততখানি নয়, ফলে পাতটি দুই দিকে অসমানভাবে বাড়ায় বাঁকিয়া গিয়াছে।**

### D2·1 তাপ অদৃশ্য কিন্তু বস্তুতে প্রযুক্তির পর তাহার প্রভাব দৃশ্যমান ( Effects of heat)

এমনিতে তাপকে আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু কোন বস্তুর উপর তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার ভিতর তাপ নিজের লক্ষণকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। তাপ দেখা যায় না কিন্তু তাপের স্বভাব, প্রভাব ও গুণকে বিশ্লেষণ করা চলে। তাপ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে কোন বস্তুর মাধ্যমে তাহার ক্রিয়াকলাপ পরীক্ষা করিতে হয়। তাপ বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে সেই বস্তুর বিবিধ পরিবর্তন দেখা যায়।

**D2·2** আমরা জানি এ জগতে যাবতীয় বস্তু তিন অবস্থায় থাকে—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায়। এখন দেখা প্রয়োজন বস্তুর এই তিন রকম অবস্থায় তাপ প্রয়োগে তাহার কেমন অবস্থান্তর ঘটে।

**তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ তরল পদার্থের অপেক্ষা কম হয়**

পূর্বেই বলা হইয়াছে তাপ প্রয়োগে পদার্থের আয়তন বাড়িয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সম পরিমাণ কঠিন পদার্থ সম পরিমাণ তরল পদার্থ অপেক্ষা কম প্রসারিত হয়। কেন হয় তাহা পরে বলা হইবে।

**তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের প্রসারণ গ্যাসীয় পদার্থ অপেক্ষা কম হয়**

তাপের সংস্পর্শে তরল পদার্থ আসিলে তাহা কঠিন পদার্থ অপেক্ষা বেশী আয়তনে বাড়ে, কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় গ্যাসীয় পদার্থ অপেক্ষা কম বাড়ে।

**তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ, কঠিন এবং তরল পদার্থ অপেক্ষা বেশী হয়**

তিনপ্রকার পদার্থের মধ্যে তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থ সর্বাধিক প্রসারিত হয়। গ্যাসের ইহা একটি মৌলিক ধর্ম।

**D2·3 বিভিন্ন পদার্থের প্রসারণের বৈসাদৃশ্যের কারণ তাহাদের অণুর ঘনসন্নিবিষ্টতা**

তাপ সংযোগে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণের বিভিন্নতা নির্ভর করে তাহাদের নিজ নিজ অণুর ঘনসন্নিবিষ্টতার উপর ( Fig. 5 )। যেসব পদার্থ
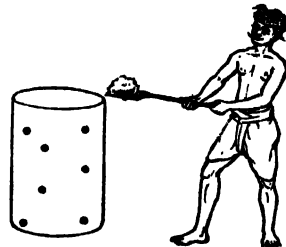
Fig. 5 অণুর ঘনসন্নিবিষ্টতার প্রভেদ

কঠিন, তাহাদের গঠনকারি অণুগুলি খুব কাছে কাছে থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের পরিমাণ খুব বেশী। তাহার ফলে তাপ প্রয়োগে কঠিন

পদার্থের প্রসারণ সবচেয়ে কম হয়। তরল পদার্থের অণু অপেক্ষাকৃত ফাঁক ফাঁক থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ কঠিন পদার্থের অণুর চেয়ে কম হইয়া থাকে। গ্যাসীয় পদার্থে একটি হইতে আরেকটি অণুর দূরত্ব অনেক বেশি হয় এবং বিভিন্ন অণুর মধ্যেকার আকর্ষণ তরল পদার্থের অণুদের অপেক্ষা কম থাকে। এই জন্যই তাহাদের এতটা আয়তনবৃদ্ধি সহজে সম্ভব হয়।

## অণুর কম্পনই তাপ শক্তি

প্রত্যেক পদার্থের অণু সদাসর্বদা পদার্থের ভিতরে কম্পমান অবস্থায় বিরাজ করে। যখন কোন পদার্থ উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে তখন তাহার ভিতরের অণুগুলি আরও দ্রুত ভাবে স্পন্দিত হয়। পদার্থের শীতলতার অর্থ তাহার অণু-কম্পন কমিয়া যাওয়া। কোন পদার্থই একেবারে শীতল নয় কারণ ঠাণ্ডা পদার্থের ভিতরের অণুর কিছু না কিছু কম্পন থাকিয়াই যায়। শীতলতা বা উষ্ণতা হইল একটি আপেক্ষিক অবস্থা (Fig. 6)। তাপ শক্তি অণুর গতীয় শক্তি ( dynamic energy )।
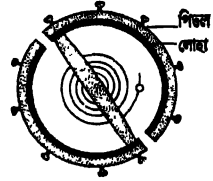
Fig. 6 ঠাণ্ডা ও গরমে অণুর ভিন্ন রকমের কম্পমান অবস্থার জন্য ঘড়ি স্লো-ফাষ্ট হইতে পারে

## তাপ—৩নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয়:** তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ বাড়ে

**পরীক্ষার উপকরণ:** ফার্গুসনের যন্ত্র, একটি ধাতব দণ্ড ও দুইটি বুনসেন দীপ

**প্রণালী:**
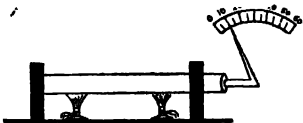
Fig. 7 তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ বাড়ে

ফার্গুসনের যন্ত্রের মধ্যে দণ্ডটি আটকাইয়া লও। পাশের স্কেলে সূচকটি 0 তে যেন থাকে। পরে দুইটি দীপেই আগুন জ্বালাও। দীপ হইতে ধাতব দণ্ডটি যেন তাপ পায়। কিছুক্ষণ পর ধাতব দণ্ডটি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং স্কেলের সূচকটি 0 হইতে সরিয়া গিয়া অন্য 10 মাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার পর দীপগুলি নিভাইয়া দিলে বেশ কিছুক্ষণ বাদে সূচকটি আবার 0তে ফিরিয়া যায় ( Fig. 7 )।

অতএব প্রমাণিত হইল যে,

(i) **তাপ প্রয়োগে ধাতব দণ্ডের প্রসারণ ঘটে।**

(ii) **ধাতব দণ্ড প্রসারিত হইয়া সূচকটিকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, যাহার ফলে সূচকটি 0 হইতে সরিয়া অন্য জায়গায় অবস্থান করিতেছে।**

(iii) **ধাতব দণ্ডটি তাপ হারাইয়া নিজের পূর্ব আয়তন পাইয়াছে বলিয়া সূচকটি পুনর্বার 0তে ফিরিয়া গিয়াছে।**

## তাপ—৪নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ** তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের প্রসারণ হয়

**পরীক্ষার উপকরণঃ** কাঁচের ফ্লাস্ক, জল ও বুনসেন দীপ

**প্রণালীঃ**
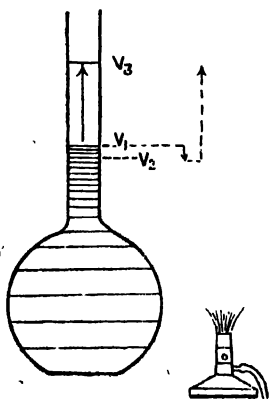
Fig. 8 তরল পদার্থের প্রসারণ পরীক্ষা

কাঁচের ফ্লাস্ক জলপূর্ণ কর। বুনসেন দীপটি প্রজ্বলিত করিয়া ফ্লাস্কে তাপ দাও। কিছু তাপ দিবার পরই দেখিবে জলের স্তররেখা $V_1$ হইতে $V_2$তে নামিয়া আসে। আরও তাপ প্রয়োগ করিলে জলের স্তররেখা ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে। প্রথম যে জায়গায় জলের স্তররেখা ছিল তাহা অতিক্রম করিয়া আরও উপরে $V_3$তে উঠিয়া যাইবে ( Fig. 8 )।

অতএব প্রমাণিত হইল যে,

(i) **কিছু তাপ পাইবার পর ফ্লাস্ক গরম হয় ও কাঁচের স্ফীতি ঘটে, ফলে জল নীচে নামিয়া যায়।**

(ii) **আরও তাপ প্রয়োগ করিবার পর বাহিরের কাঁচ ও ভিতরের জল দুইই তপ্ত হয়, ফলে জলের আয়তন বাড়ে।**

(iii) **তরল পদার্থ তাপ পাইলে বাড়ে।**

## তাপ—৫নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ** তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ হয়

**পরীক্ষার উপকরণঃ** বীকার, জল ও বুনসেন দীপ, একটি বায়ু পূর্ণ ফ্লাস্কে ছিপির সাহায্যে একটি লম্বা বাঁকান নল লাগান।

**প্রণালী :**

জল ভর্তি বীকারে ফ্লাস্কের বাঁকান সরু নলটি ডুবাইয়া দাও। ফ্লাস্কের উপর বুনসেন দীপ হইতে তাপ সংযোগ কর। দেখা যাইবে ফ্লাস্ক হইতে বাঁকান নলের মুখ দিয়া বীকারের জলে বুদ‌্বুদ বাহির হইতেছে।

অতএব প্রমাণিত হইল যে,

**(i) ফ্লাস্কের মধ্যে যে বায়ু ছিল তাহা তাপ পাইয়া প্রসারিত হয় এবং সেই প্রসারণের ফলে বীকারের জলে কিছু বায়ু বাহির হইয়া আসে।**

**D2·4 সূর্যতাপে বায়ুর প্রসারণের ফলে জলবায়ু ও স্থলবায়ুর সৃষ্টি হয়**

চারিদিক বন্ধ ফ্লাস্কের ভিতরে বায়ু লইয়া তাহাকে উত্তপ্ত করিলে বায়ুর যেমন প্রসারণ ঘটে, তেমনি বাহিরে প্রকৃতির মাঝেও উত্তাপের ফলে বায়ুর প্রসারণ ঘটে। ইহার ফলে যে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাহাকে জলবায়ু ও স্থলবায়ু বলা হয়।

Fig. 9 দিনমানে জলবায়ু

বায়ু একরকম গ্যাসীয় পদার্থ। জলভাগ ও স্থলভাগের উপরে বায়ু বিরাজ করে। দিনমানে সূর্যতাপের ফলে স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা দ্রুত উত্তপ্ত হয়। ফলে স্থলভাগের উপরের বায়ুও উত্তপ্ত হইয়া হাল্কা হয় এবং উপরে উঠিয়া যায়। তখন জলভাগের উপর হইতে শীতলবায়ু স্থলভাগের দিকে শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে চলিয়া আসে। বায়ুর এই প্রবাহকে জলবায়ু বলে (Fig. 9)। তেমনি সূর্যাস্তের পর অতি সহজে স্থলভাগ শীতল হইয়া যায় কিন্তু জলভাগ তখনও উত্তপ্ত থাকে এবং তখন সেখানকার বায়ু
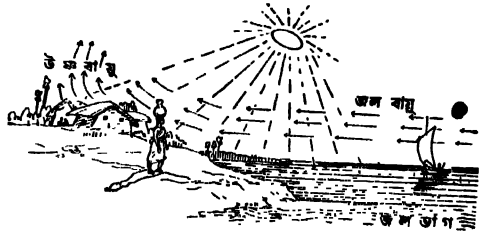
Fig. 10 রাত্রে স্থলবায়ু

উপরে উঠিয়া যায়। স্থলভাগ থেকে শীতলবায়ু প্রবাহ তখন জলভাগের দিকে ধাবিত হয়। এই বায়ু প্রবাহকে স্থলবায়ু ( Fig. 10 ) বলা হয়। এই রকম স্থলবায়ু প্রবাহ দেখা যায় সমুদ্র বা বড় বড় জলাধারের কাছে।

এই রকম বায়ুপ্রবাহ প্রমাণ করে :

(i) **স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা যতশীঘ্র তপ্ত হয় তাহা অপেক্ষা ততশীঘ্র শীতল হয়।**

(ii) **সূর্যের তাপে বায়ুর প্রসারণ হয়।**

(iii) **শূন্যস্থান পূরণের জন্য শীতলবায়ু প্রবাহের আকারে একস্থান হইতে অন্য স্থানে ধাবিত হয়।**

## D3·1 তাপের মাত্রা সাঙ্কেতিক উপায়ে নিরূপণ করা সম্ভব

আমাদের স্পর্শানুভূতি দিয়া আমরা বুঝিতে পারি এখন গরম পড়িয়াছে কি ঠাণ্ডা হইয়াছে। শীতকাল হইলে গরম-আলোয়ান খানির প্রয়োজন বোধ করি। গরমকাল হইলে শীতল বাতাসের সন্ধানে ফিরি। কিন্তু এভাবে তাপকে অনুভব করায় খানিকটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় ; খুব সূক্ষ্ম ভাবে তাহার মাত্রা নিরূপণ করা চলে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাপমাত্রা অতি সূক্ষ্ম ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব। প্রতিদিন সকাল হইতে দুপুরে এবং দুপুর হইতে রাত্রে, এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় কতটা তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার সহজ উপায় হইল থার্মোমিটারের ব্যবহার। হিমালয়ের বরফের রাজত্বে কিম্বা সাহারার মরুদেশে তাপের পার্থক্য থার্মোমিটারের সাহায্যে অনায়াসে ধরা পড়ে। শুধু নিছক অনুমান করিয়া নয়, নিয়মের বাঁধা ছকে তাপকে আমরা ডিগ্রীর একক দিয়া হিসাব করি, তাপ কত ডিগ্রী উঠিল বা কত ডিগ্রী নামিল।

## D3·2 পারদ স্তম্ভের ওঠানামা উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধির পরিচায়ক

সচরাচর যে থার্মোমিটার ( Fig. 11 ) আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহার কাঁচের নলের মধ্যে পারদ থাকে, সেই পারদের আয়তনের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের উপর নির্ভর করিয়া উষ্ণতা বা শীতলতা নির্ণয় করা হয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে তাপ অদৃশ্য এক শক্তি কিন্তু তাহা পারদের ভিতর আসিয়া যে উষ্ণতার সৃষ্টি করে, তাহাই থার্মোমিটারে ধরা পড়ে। তাপের মাত্রাকে আমরা নির্ণয় করিতে পারি, তাপকে নয়।

পারদের ওঠানামা বুঝিবার জন্য থার্মোমিটারে ডিগ্রী হিসাবে ঘর কাটা হয়, তাহাকে স্থিরাঙ্ক ( Fixed points ) বলে। এই স্থিরাঙ্কের দুটি দিক থাকে—
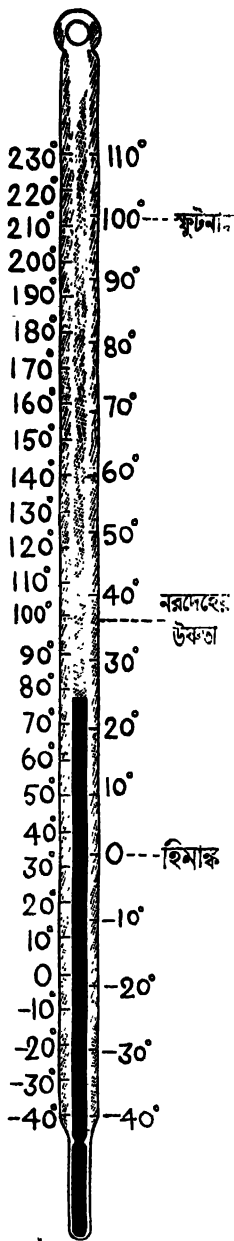
Fig. 11 তাপ নিরূপণ করিবার যন্ত্র থার্মোমিটার

একটি হইল উত্তাপ প্রয়োগে পারদ স্তম্ভের উঠিবার শেষ ধাপ, যাহাকে উর্ধ্বস্থিরাঙ্ক ( upper fixed point ) এবং অপরটি উত্তাপ প্রশমিত হইবার ফলে পারদ স্তম্ভের নামিবার শেষ ধাপ, যাহাকে নিম্নস্থিরাঙ্ক (lower fixed point ) বলে। সদাসর্বদা এই দুইধাপের মধ্যে পারদ স্তম্ভের ওঠানামা হইয়া থাকে।

## D3·3 নিম্নস্থিরাঙ্ক ও উচ্চস্থিরাঙ্কের মাঝে ঘরকাটার পার্থক্য

থার্মোমিটারের নিম্নস্থিরাঙ্ক ও উচ্চস্থিরাঙ্কের মাঝে ঘর কাটিয়া ডিগ্রী ভাগ করা হয়। কোন থার্মোমিটারে এই দুই স্থিরাঙ্কের মাঝে একশটি ভাগ করা হয়, আবার অন্য থার্মোমিটারে ১০০ ভাগ না করিয়া ১৮০ ভাগ করা হয়। এমন থার্মোমিটার আছে যেখানে আবার এই দুই স্থিরাঙ্কের দূরত্ব মাত্র ৮০টি ভাগ বা ডিগ্রী দিয়া করা হইয়াছে। এই ডিগ্রী ভাগ করিবার পার্থক্য হইতে থার্মোমিটারের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়।

### (i) 100° ভাগ দিয়া সেণ্টিগ্রেড স্কেল (100°C)

থার্মোমিটারে সেন্টিগ্রেড স্কেল অনুসারে নিম্নস্থিরাঙ্ক (হিমাঙ্ক = freezing point) কে 0°c ও উচ্চস্থিরাঙ্ককে ( স্ফুটনাঙ্ক = boiling point ) 100°C ধরা হয়। এই দুই অঙ্কের মাঝে 100টি ভাগ রহিয়াছে। এখানে 1 ডিগ্রী অর্থে বুঝায় মোট প্রসারণের $\frac{1}{100}$ ভাগ।

### (ii) 180° ভাগ করিয়া ফারেনহাইট স্কেল ( 180°F )

থার্মোমিটারে ফারেনহাইট স্কেল অনুসারে নিম্নস্থিরাঙ্ক ধরা হয় 32°F ও উচ্চস্থিরাঙ্ক 212°F। এই দুই স্থিরাঙ্কের মাঝে 180 ডিগ্রী ভাগ করা আছে।

### (iii) 80°R ভাগ করিয়া রোমার স্কেল

থার্মোমিটারে রোমার স্কেল অনুসারে নিম্নস্থিরাঙ্ক ধরা হয় 0°R ও উচ্চস্থিরাঙ্ক 80°R এই দুই স্থিরাঙ্কের মাঝে 80টি ভাগ আছে।

### (iv) সেন্টিগ্রেডে যখন এত ডিগ্রী, ফারেনহাইটে তখন কত ডিগ্রী ?

একই জায়গায় তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার দিয়া দেখিলে যত হইবে, ফারেনহাইট স্কেল দিয়া দেখিলে তত হইবে না। ইহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে এক থার্মোমিটারের ডিগ্রীর সঙ্গে অন্য থার্মোমিটারের ডিগ্রী ভাগের পার্থক্য আছে কিন্তু দৈনন্দিন কাজে এক স্কেল হইতে অন্য স্কেলে তাপমাত্রা প্রকাশ করিতে কোন অসুবিধা নাই।

নীচের এই সূত্র হইতে অনায়াসে স্কেল পরিবর্তন সম্ভব। 100 সেন্টিগ্রেড ভাগ =180 ফারেনহাইট ভাগ=80 রোমার ভাগ

$$\therefore \quad 1°C = \tfrac{9}{5}°F = \tfrac{4}{5}°R$$

## তাপ—৬নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** থার্মোমিটারের উর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্ক নির্ণয়

**পরীক্ষার উপকরণ :** কাচের কৈশিক নল, পারদ, মানোমিটার, ফানেল, বরফের টুকরো, থার্মোমিটার. হিপসোমিটার, বুনসেন দীপ, বীকার, স্ট্যাণ্ড

## প্রণালী

সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট ও সমনালি যুক্ত ( Even bore ) কাচের একটি কৈশিক নল নাও। কৈশিক নলের একদিকে একটি কুণ্ড তৈরী করিয়া লও। খোলামুখে ফানেল লাগাইয়া কুণ্ডটি ( bulb ) পারদপূর্ণ কর। সহজে পারদপূর্ণ হইবেনা। বুনসেন দীপের স্তিমিত শিখার সাহায্যে কুণ্ডটিকে বারবার উত্তপ্ত কর ও কিছু পারদ ঢালিয়া দাও। এই উপায়ে কয়েকবার ঠাণ্ডা গরম করিলে কুণ্ডটিকে পারদপূর্ণ করা সম্ভব হইবে।
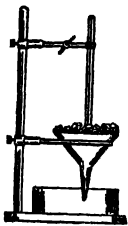
Fig. 12
থার্মোমিটারের নিম্নস্থিরাঙ্ক নির্ণয়

কুণ্ডটি পারদপূর্ণ করিবার পর কৈশিক নলের উপর হিমাঙ্ক মানবিন্দুর দাগ কাটিতে হইবে। একটি ফানেলে কিছু বরফের টুকরো রাখিয়া তাহার মধ্যে কুণ্ডটিকে রাখিতে হইবে (Fig. 12)। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর পারদস্তম্ভ ক্রমে ক্রমে নীচে নামিয়া

এক জায়গায় স্থির হইয়া যাইবে। বরফের মধ্যে পারদ স্তম্ভ যেখানে নামিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে সেখানে দাগ দাও, ইহাই **নিম্নস্থিরাঙ্ক।**

ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য থার্মোমিটারটিকে হিপসোমিটার নামক যন্ত্রের মধ্যে রাখিতে হইবে। হিপসোমিটার যন্ত্রের ভিতর জল রাখ। থার্মোমিটারের কুণ্ডটি জলের উপরে থাকিবে। হিপসোমিটারের নীচে বুনসেন দীপ জ্বালিয়া উত্তাপ দাও। তাহার ভিতরের জল ফুটিতে থাকিবে এবং 100°c উত্তাপে বাষ্প আসিয়া থার্মোমিটারের কুণ্ডটি উত্তপ্ত করিবে। বায়ুর চাপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য হিপসোমিটারের সঙ্গে মানোমিটার সংযুক্ত করিয়া রাখ। যে থার্মোমিটারটির ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক নির্ণয় করা হইতেছে তাহার ভিতরে নলের মধ্যে পারদস্তম্ভ উপরে উঠিতে থাকিবে। এই রকম উত্তপ্ত অবস্থায় পারদস্তম্ভকে বেশকিছুক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখ। যখন পারদ স্তম্ভ এক জায়গায় স্থির হইয়া আছে তখন সেইস্থানটিকে চিহ্নিত করিয়া **ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক** নির্ণীত কর (Fig. 13)। উপরের দিকের কৈশিক নলের মুখ বুনসেন দীপের ক্ষীণ শিখার সাহায্যে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।
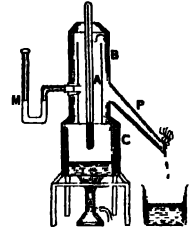
**Fig. 13**
**থার্মোমিটারের ঊর্ধ্বস্থিরাঙ্ক নির্ণয়**

অতএব প্রমাণিত হইল যে

(i) **কৈশিক নলের ভিতরে পারদ স্তম্ভ উত্তাপের ফলে আয়তনে বাড়ে এবং তাপ হারাইলে নামে।**

(ii) **পারদ কতকটা তাপ হারাইল বা কতকটা গ্রহণ করিল তাহা ডিগ্রীর হিসাবে কাটাঘর হইতে জানা যায়।**

## D3·4 একই সঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা দেখিবার সিক্স থার্মোমিটার ( Six's maximum and minimum thermometer )

প্রত্যেক জায়গায় সকাল হইতে রাত্রি অবধি উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। এই উষ্ণতার তারতম্য প্রতিঘণ্টায় কিরূপ বদলায় তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। সিক্স-এর থার্মোমিটারের সাহায্যে একই সঙ্গে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা দেখা সম্ভব ( Fig. 14 )।

এই থার্মোমিটারটির বিশেষত্ব হইল ইহাতে মুখ্যতঃ দুটি থার্মোমিটারকে এক সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ থার্মোমিটারের মত এই থার্মোমিটারটির

গঠন নয়। একটি U নলের সঙ্গে দুটি কুণ্ড যুক্ত আছে C ও D। C কুণ্ডটি D অপেক্ষা বড়। U নলের QMP অংশ পারদপূর্ণ। C কুণ্ড হইতে কাচের নলের P পর্যন্ত এলকহল দ্বারা ভর্তি থাকে। আবার অন্যদিকে D কুণ্ডের সহিত যুক্ত Q কাঁচের নল পর্যন্তও এলকহল পূর্ণ আছে। D কুণ্ডের কিছু অংশ খালি রাখা হয় প্রসারণের জন্য। C কুণ্ডে এলকহলের আয়তনের কমবেশির উপর তাপ-মাত্রা নির্ণীত হয়। U নলের দুপাশে ফারেনহাইট স্কেল বসান আছে। A ও B স্প্রীংবিশিষ্ট দুইটি লোহার সূচক। তাপ নিরূপণ করিবার পূর্বে U নলের বাহির হইতে সূচক A ও B কে যথাক্রমে Q ও P পারদের কাছে লাগাইয়া দিতে হয়। উত্তাপের দরুণ C কুণ্ডের এলকোহল আয়তনে বাড়ে এবং Q পারদের সম্মুখে A সূচককে ধাক্কা দেয়। আবার তাপ প্রশমিত হইলে C কুণ্ডের মধ্যে এলকহলের আয়তন কমে যাহাতে B সূচক U নলের অপর দিকে স্থানচ্যুত হয়। সূচক দুটির বিশেষত্ব হইল তাহাদের স্থানচ্যুতি হইলে নলের গায়ে স্প্রীং-এর সাহায্যে আটকাইয়া থাকে। এই স্থানচ্যুতি হইতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উত্তাপ দেখিবার সুযোগ হয়।
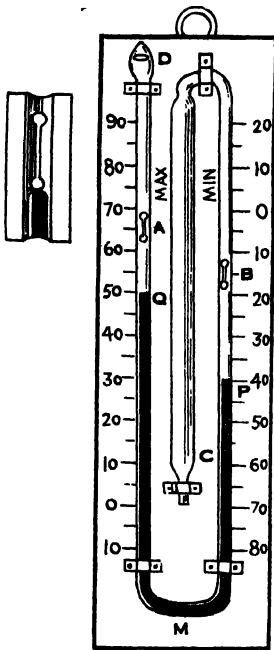
Fig. 14 সিক্সএর থার্মোমিটার

## D3·5 জ্বর দেখিবার থার্মোমিটার ( Clinical thermometer )

জ্বরজ্বালা হইলে যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তাহা ফারেনহাইট স্কেলে ভাগ করা (Fig. 15)। ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। যাহার জন্য ইহাকে ডাক্তারী
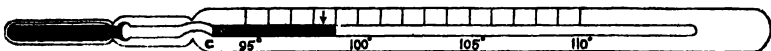
Fig. 15 জ্বর দেখিবার থার্মোমিটার

থার্মোমিটার বলা হয়। এই ডাক্তারী থার্মোমিটার আয়তনে অন্য থার্মোমিটার অপেক্ষা ছোট হয়। ইহার গায়ে 95°F হইতে 110°F পর্যন্ত চিহ্নিত থাকে—কারণ জীবিত অবস্থায় কোন মতেই মানুষের শরীরের উষ্ণতা এই দুই সীমা রেখা অতিক্রম

করিতে পারে না। আর দ্বিতীয় বিশেষত্ব হইল এই থার্মোমিটারের কুণ্ড হইতে যে সূক্ষ্ম রন্ধ্রটি উপরে চলিয়া গিয়াছে কুণ্ডের ঠিক উপরেই তাহা একটু বাঁকান ( **kink** ) আছে। ইহার ফলে জ্বর দেখিবার পর উত্তাপের দরুণ পারদস্তম্ভ কুণ্ড হইতে একবার আয়তনে বাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলে আপনা আপনি কুণ্ডে আবার নামিয়া আসিবে না।

## D4·1 তাপ বস্তুর অবস্থান্তর ঘটানর কারণ

কোন বস্তু তাপযুক্ত বা তাপমুক্ত হইলে তাহার অবস্থার সাধারণতঃ পরিবর্তন দেখা যায়। এ পৃথিবীতে বস্তু তিনপ্রকার অবস্থায় বিরাজমান—

কঠিন অবস্থায়
তরল ,,
গ্যাসীয় ,,

পূর্বেই দেখিয়াছি কোন বস্তুই সম্পূর্ণভাবে তাপহীন নয়। তাপ বলিতে আমরা বুঝি বস্তুর মধ্যস্থিত অসংখ্য অণুর কম্পমান অবস্থা। সব বস্তুর ভিতরই অণুরা কিছু পরিমাণে কম্পমান। দেখা গিয়াছে কোন বস্তুর ভিতরে তাপ প্রয়োগ করিলে (অর্থাৎ সেই বস্তুর অণুদিগের স্পন্দন বাড়াইয়া দিলে ) অথবা তাপ হ্রাস করাইলে অর্থাৎ তাহার অণুদিগের স্পন্দন মন্থর করাইলে ) সেই বস্তুর অবস্থান্তর ঘটে।

বরফ কঠিন পদার্থ, তাপ প্রয়োগ করিলে তাহা গলিয়া জল হয়—ইহা এক অবস্থান্তরের লক্ষণ। তেমনি জলের উপর আরও অধিক তাপ প্রযুক্ত করিলে তাহার আকার বদলাইয়া বাষ্পে পরিবর্তিত হয়। বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে তাহা আবার জলের আকার ধারণ করে। জলকে অধিকতর শীতল করিলে তাহা বরফে অবস্থান্তরিত হয়।

তাপ যোগে বা বিয়োগে বস্তুর অবস্থান্তরের ছক :
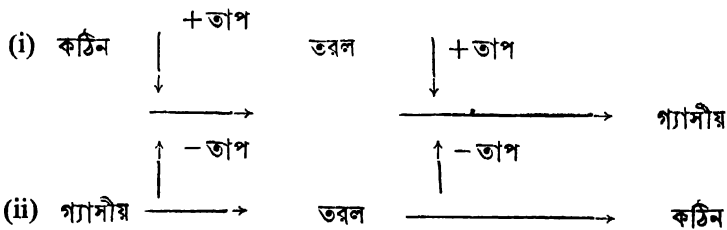
## তাপযুক্তি বা তাপমুক্তির ফলে বস্তুর নানান বিশেষত্ব

বস্তু কি অবস্থায় আছে এবং উহাকে তাপযুক্ত অথবা তাপমুক্ত করিলে যে নানা অবস্থান্তর ঘটে তাহা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য

ইহাতে বস্তুর স্বাভাবিক তাপ মাত্রা যাহা আছে তাহার উপর তাপ প্রযুক্তি বা বিমুক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

## D4·2 তাপযুক্তিতে

### (i) তাপযুক্তির ফলে কঠিন পদার্থের গলন হয় ( melting )

Fig. 16 গলন

কঠিন পদার্থ তাপ পাইলে তরল হয়। কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় আসাকে গলন বলে (Fig. 16)। দেখা গিয়াছে সাধারণ চাপে ( normal pressure ) একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে পদার্থের এইরূপ অবস্থান্তর ঘটে—সেই উত্তাপকে গলনাঙ্ক (melting point ) বলে।

### (ii) তাপযুক্তির ফলে তরল পদার্থের বাষ্পীভবন (evaporation)

তরল পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে তাহা বাষ্পে অবস্থান্তরিত হয়—এই প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলে ( Fig. 17 )। এই ঘটনা যে কোন তাপমাত্রায় হইতে পারে—কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতা লাগে না।

Fig. 17 বাষ্পীভবন

### (iii) তাপযুক্তির ফলে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় স্ফুটন ( boiling )

Fig. 18 স্ফুটন

তরল পদার্থ তাপযুক্তির ফলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফুটিতে থাকে এবং বাষ্পে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে স্ফুটন ( boiling ) বলে ( Fig. 18 )।

### (iv) আরও তাপযুক্তির ফলে তরল পদার্থের বাষ্পীকরণ (vaporisation)

তরল পদার্থের তাপবৃদ্ধির ফলে তাহা প্রথমে ফুটিতে থাকে এবং পরে বাষ্পে পরিবর্তিত হয়। এখানে তাপযুক্তির ফলে তরল পদার্থের আকারান্তরকে বাষ্পীকরণ ( vaporisation ) বলা হয়।

## D4·3 তাপ মুক্তিতে

**(i) তাপমুক্তির ফলে তরল পদার্থের কঠিনীভবন (solidification) হয়**

তরল পদার্থকে তাপমুক্ত করিলে তাহা ঘনত্বলাভ করিয়া কঠিন আকার ধারণ করে। ইহাকে কঠিনীভবন বলে।

**(ii) তাপমুক্তির ফলে গ্যাসীয় পদার্থের তরলীভবন হয় (condensation)**

গ্যাসীয় পদার্থকে ঠাণ্ডা করিলে অর্থাৎ তাহা হইতে তাপমুক্তি ঘটিলে তাহা তরল আকাব ধাবণ করে। এই প্রথাকে তরলীভবন ( condensation ) বলে।

**(iii) তরল পদার্থের তাপমুক্তি ঘটিলে কঠিন আকার ধারণ করে ( freezing )**

তরল পদার্থ হইতে তাপ কমাইলে তাহা কঠিন আকার ধাবণ করে।

যখন এই ঘটনা দেখা যায় সাধারণ চাপে ( normal pressure ) এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তখন পদার্থ ঘনীভূত হইয়াছে বলা হয়।

**সেন্টিগ্রেড স্কেল অনুযায়ী কতকগুলি পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক :**

| কতকগুলি পদার্থের গলনাঙ্ক | | ৭৬০ মিঃ মিঃ বায়ুমণ্ডলের চাপে পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক | |
|---|---|---|---|
| **পদার্থ** | **গলনাঙ্ক °C** | **পদার্থ** | **স্ফুটনাঙ্ক** |
| কার্বন | 3500 | তরল গন্ধক | 444°C |
| ঢালাই লোহা | 1200 | পারদ | 357°C |
| পিতল | 1000-800 | গ্লিসারিন | 290°C |
| তামা | 1033 | জল | 100°C |
| রূপা | 960 | এলকোহল | 78°C |
| দস্তা | 418 | তরল অ্যামোনিয়া | —34°C |
| মোম | 56-62 | ,, অক্সিজেন | —183°C |
| পারদ | হিমাঙ্ক—39 | ,, হাইড্রোজেন | —253°C |

## তাপ—৭নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** বাষ্পীভবনে শীতলতার সৃষ্টি হয়

**পরীক্ষার উপকরণ :** কাঠের একটি খণ্ড, ঈথার রাখিবার তামার পাত্র, জল, ঈথার, হাপর

**প্রণালী :**

কাঠের খণ্ডের উপর কয়েক ফোঁটা জল নাও। পরে কাঠের উপরে এই জল-বিন্দুর উপর ঈথার রাখিবার পাত্রটি রাখ এবং উহাতে ঈথার ভর। ঈথার লইবার পর হাপরের সাহায্যে তামার পাত্রের মধ্যে বায়ু চালনা কর। কিছুক্ষণ বাহির হইতে বায়ুপ্রবাহ আসিলে পাত্রের ভিতরের ঈথার উবিয়া যাইবে। সেইসঙ্গে দেখ কাঠের উপর জলবিন্দু বরফ হইয়া জমিয়া গিয়াছে। তামার পাত্রের সঙ্গে বরফ আটকাইয়া থাকিবে।

অতএব প্রমাণিত হইল যে,

(i) **তামার পাত্রের ভিতর বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে ঈথারের বাষ্পীভবন হয় এবং তাহা উবিয়া যাইবার সময় জলের লীন তাপ ( latent heat ) টানিয়া লয়।**

(ii) **বাষ্পীভবনে শৈত্যোৎপাদন হয়**

### D 5·1 তাপের সঞ্চরণ ( Heat travels )

উনানের উপর হাঁড়ির মধ্যে চাল টগবগ করিয়া ফুটে, ফুটিয়া সিদ্ধ হয়। উনানের ভিতর যে আগুন তাপ সৃষ্টি করে, তাহা পাত্রের ভিতর দিয়া জলের মাধ্যমে অবশেষে চালে আসিয়া প্রবেশ করে এবং তাহাকে ভাতে পরিণত করে। তাপের সঞ্চরণের ফলেই রোজ রান্না-ঘরে চাল থেকে ভাত হওয়া সম্ভব হয়। কোন কিছু গরম জিনিসের উপর আঙ্গুল স্পর্শ করিলে অবিলম্বে আমরা তাপকে অনুভব করি এবং সে স্থান হইতে হাত সরাইয়া লই। চক্ষের নিমেষে সেই উত্তপ্ত জিনিস হইতে তাপ আঙ্গুলে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই গরমের অনুভূতি হইয়াছে। গরমের
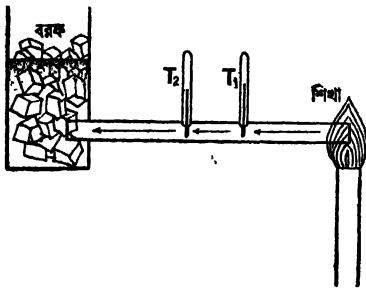
Fig. 19 তাপের সঞ্চরণ

বদলে যদি কোন ঠাণ্ডা পদার্থের উপর হাত স্পর্শ করান যায়, তাহা হইলে হাতের আঙ্গুল হইতে তাপ সেই শীতল পদার্থের ভিতরে স্থানান্তরিত হয়। তাপ চলিয়া যায় বলিয়াই ঠাণ্ডা লাগে। আলোর অভাব যেমন অন্ধকার, তেমনি তাপের অভাব শীতলতা। তাপশক্তি গতিশীল এবং প্রবহমান। একস্থান হইতে অন্যস্থানে তাপের চলাফেরা দেখিলে মনে করা যায় যে তাপের মধ্যে এমন একটি ভাব আছে, যেটিকে যাযাবরী বৃত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখন হাতে ফোসকা পড়ে কিম্বা পাত্রের মধ্যে আলুসিদ্ধ বা ভাতসিদ্ধ হয়, তখন তাপের কার্য আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে। তাপের এই চলৎ-শক্তি তাহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই চলৎ-শক্তিকে মানুষ নানা কাজে লাগাইয়াছে।

তাপ এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যাতায়াত করিতে পারে তিনরকম ভাবে :

(i) **পরিবহণ** ( conduction )

(ii) **পরিচলন** ( convection )

(iii) **বিকিরণ** ( radiation )

**তাপ সঞ্চরণে তিন প্রকার রীতির পার্থক্য :**

| **পরিবহণ (conduction)** | **পরিচলন (convection)** | **বিকিরণ (radiation)** |
|---|---|---|
| (1) তাপপ্রবাহ কঠিন, তরল, বাষ্পীয় কোন মাধ্যমের মধ্যে চলে | তাপপ্রবাহ কঠিন, তরল, জলীয় কোন মাধ্যমের মধ্যে চলে | তাপপ্রবাহ মাধ্যম-বিহীন ভাবে চলে |
| (2) তাপপ্রবাহে উষ্ণতার তারতম্য হয় | তাপপ্রবাহে উষ্ণতার তারতম্য হয় | তাপপ্রবাহে উষ্ণতার তারতম্য হয় না |
| (3) তাপপ্রবাহ মন্থর গতিতে চলে | তাপপ্রবাহ মন্থর গতিতে চলে | তাপপ্রবাহ আলোর সমান দ্রুত গতিতে চলে |
| (4) তাপপ্রবাহের সময় অণু স্থান ত্যাগ করে না | তাপপ্রবাহের সময় অণু স্থান ত্যাগ করে | তাপপ্রবাহ তরঙ্গগতিতে চলে |
| (5) তাপপ্রবাহের গতি বক্রাকার | তাপপ্রবাহের গতি বক্রাকার | তাপপ্রবাহের গতি সরল রেখায় |
| **উদাহরণ**—হাতা বা খুন্তি রান্নার সময় উত্তপ্ত হওয়া | **উদাহরণ**—জলবায়ু ও স্থলবায়ু প্রবাহের সময় | **উদাহরণ**—সূর্যের তাপ দেহকে যেমন ভাবে স্পর্শ করে |

## D5·2 পরিবহণের (conduction) দৃষ্টান্ত আমাদের দেহাবরণ

তাপের পরিবহণ বুঝিবার ভাল দৃষ্টান্ত হইল নিজেদের দেহাবরণ ব্যবহারের ভিতর। শীতকালে গরম জামা কাপড় ব্যবহার করি, কিন্তু গরমকালে সুতোর তৈরী পরিধেয় জিনিসের চাহিদা দেখি কেন? তাহার সহজ কারণ শীতবস্ত্র (গরম জামা কাপড়) আর সুতীবস্ত্র শরীরের মধ্যে তাপ ধরিয়া রাখিতে সমান কার্যকরী নয়। সুতীবস্ত্রের ভিতর দিয়া শরীরের তাপ সহজে বাহিরে পরিবাহিত হইতে পারে —সেই কারণে গরমের সময় শরীরে অনেকটা স্বস্তিবোধ হয়। কিন্তু শীতবস্ত্রের ভিতর দিয়া সহজে শরীরের তাপ সঞ্চরণ করে না এবং তাপ না বাহির হইলে শরীরের উত্তাপের হ্রাস পায় না। অতএব গরম জামাকাপড় পরিলে শরীর গরম থাকে। এ কথা লক্ষ্যণীয় যে, কিছু পদার্থ আছে যাহাদের ভিতর দিয়া তাপ সহজে চলাফেরা করিতে পারে না- -এই সব পদার্থ কুপরিবাহী (bad conductors)। আর যে সব জিনিসের ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দে তাপ আনাগোনা করিতে পারে তাহারা সুপরিবাহী (good conductors)। আসলে প্রত্যেক শীতবস্ত্রের ভিতর, উল প্রভৃতি জিনিসে, বায়ু চলাচলের অসংখ্য ফাঁক আছে। কিন্তু সুতোর তৈরী জিনিসের বুননির ভিতর এমন ফাঁক নেই। এই হাওয়া সাধারণ ভাবে তাপ পরিবহণের পরিপন্থী, সেই কারণেই শীতবস্ত্রের সাহায্যে ঠাণ্ডা এত ভাল করিয়া আটকায়। উলের জামার ভিতরে যে হাওয়া থাকে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখা যায় জলের মধ্যে সুতী জামা যত সহজে ডুবাইয়া দেওয়া সম্ভব, উলের জামা তত সহজে নয়। হাওয়া থাকায় জামা জলের মধ্যে ডুবাইতে দেরী হয়।

আমরা সু বা কুপরিবাহী যেরূপ আবরণই ব্যবহার করি, দেখা যায় যখন তাপ শরীরের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিতে সক্ষম সেই সব ক্ষেত্রে পরিবহণের সময় দেহ হইতে অণুর স্থানত্যাগ না ঘটাইয়াই তাপপ্রবাহ উত্তপ্ত স্থান হইতে শীতল স্থানে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ।

**পরিবহণের বিশেষত্ব**—কঠিন পদার্থের মধ্যে দেখা যায় অণু স্থান ত্যাগ করে না।

## D5·3 পরিচলনের (convection) দৃষ্টান্ত ঘরের মধ্যে বায়ুচলাচলে ও তাপনিয়ন্ত্রণে

ঘরের মধ্যে দেখা যায় ঘুলঘুলি বসান আছে দেওয়ালের উপরের দিকে। ইহার কারণ ঘরের মধ্যেকার বায়ু উত্তপ্ত হইলে তাহা হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং

শীতলবায়ু সবসময়ে ভারি হয় এবং নীচের দিকে অবস্থান করে। কোন একটি ঘরে যদি বহুসংখ্যক লোক এসে ভীড় করে এবং বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে কিছুক্ষণের ভিতরই এত লোকের নিঃশ্বাস নেওয়ার এবং ছাড়ার জন্য ঘর গরম হইয়া উঠিবে। ক্রমে ক্রমে ঘরের উত্তাপ বাড়িবে। এই রকম উপায়ে উত্তাপ বাড়িবার জন্য তাপের পরিচলন প্রক্রিয়াই দায়ী। গরম হাওয়া এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় প্রবাহিত হয়—নীচু হইতে উপরে যায়। বারংবার এই রকম উষ্ণ বায়ুর এমন পরিচলন ঘরকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে।
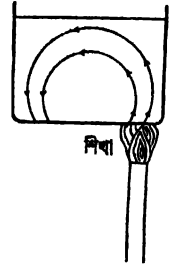
Fig. 20 পরিচলন
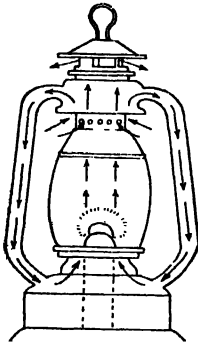
Fig. 21 তাপ বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি করে

শীতপ্রধান দেশে বাড়ীঘরকে তাপনিয়ন্ত্রিত করিবার বর্তমানে যে প্রথার সবিশেষ প্রচলন হইয়াছে তাহা তাপের এই পরিচলন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। বাহির হইতে পাইপে করিয়া বায়ু গৃহের ভিতরে আনিয়া উত্তপ্ত করিলে তাহা হাল্কা হইয়া পরিচলন ক্রিয়া অনুযায়ী উপরে উঠিতে চায়। পাইপের সাহায্যে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে এই গরম বাতাস লইয়া গেল উত্তপ্ত বাতাস ঘরকে গরম করিয়া তোলে। এই রকম করিয়া উষ্ণ বায়ুপ্রবাহের দ্বারা ঘরবাড়ী গরম রাখা হয়।

**পরিচলনের বিশেষত্ব**—(i) তাপ পাইয়া অণু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে।

(ii) জলীয় ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে এই প্রক্রিয়া লক্ষ্যণীয়।

## D5·4 বিকিরণের ( radiation ) দৃষ্টান্ত : দীপ্তিহীন ও দীপ্তিশীল রশ্মি

সূর্য হইতে পৃথিবীতে এই নয়কোটি ত্রিশলক্ষ মাইল অতিক্রম করিয়া যে তাপ আলোর গতিতে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে তাহা

মহাশূন্যের ভিতর দিয়া আসে। পৃথিবী সেই তাপ পাইয়া উত্তপ্ত হয়, কিন্তু সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যস্থিত অংশে কোন জড়পদার্থ না থাকায় তাপ কিছুর উপর ভর না করিয়া বিকিরণের ক্রিয়ায় সরাসরি চলিয়া আসে। এ পৃথিবীতে মহাশূন্য হইতে যত কিছু তাপ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে তাহা এই বিকিরণ উপায়ে।

Fig. 22 বিকিরণ
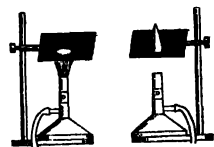
Fig. 23
তারের জাল সুপরিবাহী

**বিকিরণের বিশেষত্ব**—এক্স-রে, গামা রে, ইনফ্রা রেড—বিকিরণ প্রথাতেই এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চলিয়া যায়।

## তাপ– ৮নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ** বিভিন্ন পদার্থের পরিবাহিতা ( conductivity ) এক নয় — Ingenhausz এর পরীক্ষা :

**পরীক্ষার উপকরণ** :—মোমের প্রলেপযুক্ত A, B, C, D বিভিন্ন ধাতুর সমান দৈর্ঘ্য ও ব্যাসবিশিষ্ট দণ্ড, ছিদ্রবিশিষ্ট ধাতব পাত্র, জল ও বুন্‌সেন দীপ

**প্রণালী :—**

মোমের প্রলেপযুক্ত A, B, C, D বিভিন্ন ধাতুর সমান দৈর্ঘ্য ও ব্যাস-বিশিষ্ট দণ্ডগুলি ধাতুর পাত্রের ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাও। ধাতুর পাত্রে জল এমনভাবে দাও যাহাতে দণ্ডগুলি পাত্রের ভিতরে জলের নীচে থাকে। পরে বুনসেন দীপ সাহায্যে জলকে উত্তপ্ত কর।
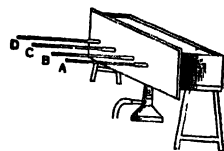
Fig. 24 বিভিন্ন পদার্থের পরিবহণ এক নয়

দণ্ডের উপরে মোমের প্রলেপ গলিতে থাকিবে। যখন দণ্ডগুলির উষ্ণতা স্থির হইয়া আসিবে, তখন মোমগলা বন্ধ হইবে এবং দেখা যাইবে যে বিভিন্ন দণ্ডের মোম বিভিন্ন দৈর্ঘ্য পর্যন্ত গলিয়াছে।

অতএব প্রমাণিত হইল যে,

**বিভিন্ন দণ্ডের তাপ পরিবাহিতা সমান নয় বলিয়াই তাহাদের উপরের মোম বিভিন্ন জায়গায় গলে। যে দণ্ডের তাপ পরিবাহিতা বেশী সে দণ্ডের বেশী জায়গা পর্যন্ত মোম গলে—যাহার তাপপরিবাহিতা কম তাহার কম জায়গা পর্যন্ত মোম গলে।**

## তাপ—৯নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ** পরিচলন উপায়ে তাপ চলাচল করিলে অণু স্থানত্যাগ করে

**পরীক্ষার উপকরণঃ** কাচের পাত্র, দুতিনটি পটাস পারমাঙ্গ্যানেটের টুকরা, জল, বুন্‌সেন দীপ

**প্রণালীঃ**

কাচের পাত্রে জল নাও। পটাস পারমাঙ্গ্যানেটের টুকরো কয়টি জলে ছাড়িয়া দাও। পরে বুনসেন্ দীপ সাহায্যে জলকে উত্তপ্ত কর। পাত্রের তলা হইতে রঙ্গিন জলের রেখা উপরে উঠিয়া আবার দুপাক দিয়া নীচে নামিতে থাকিবে। যতক্ষণ না জল ফুটিয়া ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপ দেওয়ার ফলে জলের মধ্যে একটি প্রবাহ সৃষ্টি হয় (Fig. 20)।

অতএব প্রমাণ করা হইল যে,

**জল তাপ পাইয়া হাল্কা হয় ও উপরে উঠে, সেই সময় উপরের ঠাণ্ডা জল নীচে নামে, কারণ তাহা ভারি; আবার ঠাণ্ডা জল তাপ পাইয়া উপরে উঠে। এমনি করিয়া একটি প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহ হওয়ার মূলে আছে তাপের পরিচলন ক্ষমতা (গমন ক্ষমতা)। ইহা মুখ্যত উত্তপ্ত অণুর স্থানত্যাগের উপর নির্ভরশীল।**

## তাপ—১০নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ** তাপের পরিচলন বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে

**পরীক্ষার উপকরণঃ** মোমবাতি, চিমনি, কাচের পাত্র, জল, T-এর আকারে একখণ্ড টিনের বা কাগজের পাত।

**প্রণালীঃ**

কাচের পাত্রে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি লও। পাত্রে খানিক জল লইয়া চিমনিটিকে এমনভাবে রাখ যাহাতে মোমবাতিটি মাঝে থাকে। কিছুক্ষণের ভিতরেই

মোমবাতি নিভিয়া যাইবে। এখন মোমবাতিটিকে আবার জ্বালিয়া চিমনির মাথায় T-এর আকারের টিনের যন্ত্রটি বসাইয়া দিলে বাতির শিখা নিভিবে না।
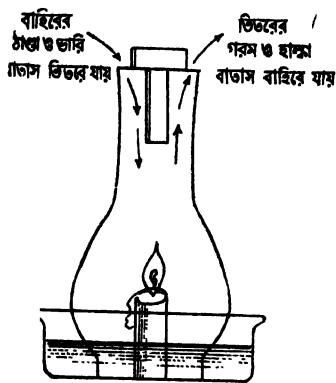
Fig. 25 পরিচলন ও বায়ুপ্রবাহ

চিমনির মুখে যতক্ষণ T-এর আকারের খণ্ডটি বসান না হয়, ততক্ষণ চিমনির মুখদিয়া শুধু ভিতর হইতে উত্তপ্ত বাতাস হাল্কা হইয়া বাহিরে চলিয়া যায়—বাহির হইতে ভারি বাতাস ঢুকিতে পারে না। কিন্তু T-এর আকারের খণ্ডটি বসাইলে এক দিক দিয়া গরম বাতাস হাল্কা হইয়া বাহিরে যায় ও অন্য দিক দিয়া বাহির হইতে ঠাণ্ডা ভারি বাতাস সহজে ভিতরে ঢোকে। শিখা তাই নিভিয়া যায় না।

অতএব প্রমাণ করা হইল যে,

**তাপ পরিচলনের ফলে ভিতর হইতে গরম হাওয়া বাহিরে যায় ও ঠাণ্ডা বাতাস ভিতরে আসে।**

## তাপ —১১নং পরীক্ষা

**প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ** বিকীর্ণ তাপ কোন জড়বস্তুর সাহায্য ছাড়াই এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যায়।

**পরীক্ষার উপকরণঃ** ঈথার তাপবীক্ষণ ( Ether thermoscope )

**প্রণালীঃ**

ঈথার-তাপবীক্ষণ যন্ত্রটি বাঁকান কাচের নল দিয়া ছুটি কাচের কুণ্ডকে সংযুক্ত করে। যন্ত্রটি বায়ুশূন্য—ভিতরে ঈথার এবং ঈথার-বাষ্প ভরা আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ঈথারের মাত্রা তুই দিকে সমান থাকে। কুণ্ড A তে ভুসা মাখান আছে। ভুসা সহজে বিকীর্ণ তাপ শোষণ করিতে পারে। এই শোষণের ফলে কুণ্ডের গায়ে তাপ রশ্মি পড়িলে সেই দিকের কুণ্ডে বাষ্পের চাপ বেশী হওয়ায় ঈথারের স্তররেখা (level) আর সমান থাকে না।
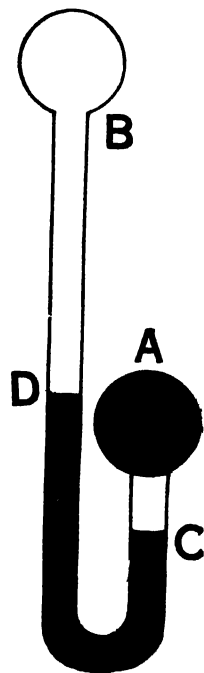
Fig. 26
ঈথার-তাপবীক্ষণ

প্রমাণ করা হইল যে,

**বিকীর্ণতাপ ঈথার-তাপবীক্ষণ যন্ত্রের কুণ্ডে পড়িলে, ঈথার ও ঈথারবাষ্পের চাপ বাড়ে। ফলে নলের অপর বাহুতে স্তররেখার পার্থক্য দেখা যায়। বিকীর্ণ তাপ কোন জড়বস্তুর সাহায্য ছাড়াই কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়।**

### D5·5 সবুজঘর ( green house ) —সূর্যরশ্মি ধরিবার ফাঁদ বিশেষ

সবুজঘর কাচ দ্বারা নির্মিত। কাচের একটি বিশেষত্ব যে। 100°C উষ্ণতা হইতে অধিক উষ্ণ বিকীর্ণ তাপের অর্ধেক উহার ভিতর দিয়া অতিক্রম করিতে পারে কিন্তু উহার কম উষ্ণতায় বিকীর্ণ তাপের সমস্তটাই আটকাইয়া দেয়। সূর্য-রশ্মি হইতে তাপ বিকীর্ণ হইয়া সবুজঘরে প্রবেশ করে এবং সবুজঘরের ভিতরের গাছপালা তাহা শোষণ করে। এই সব উদ্ভিদের উষ্ণতা 100°C তলায় থাকে। সেই কারণে সূর্যরশ্মি হইতে তাপ যত সহজে, সবুজঘরের ভিতরে আসিতে পারে তত সহজে বাহিরে নয়। এইজন্য সবুজঘরকে বলা হয় সূর্যরশ্মির বিকীর্ণ তাপ ধরিবার ফাঁদ। শীতপ্রধান দেশে এই রকম কাচের ঘরের মধ্যে অনেক কিছু জিনিসের চাষ করা হয়।

### D5·6 বিকীর্ণ তাপের প্রতিফলন (reflection) ও শোষণ (absorption)

(i) মসৃণ ধাতু ভাল তাপ-প্রতিফলক কিন্তু খারাপ শোষক ও তাপ-বিকিরক।
(ii) ভূসাকালি, ছাইভস্ম ভাল তাপ-শোষক এবং খারাপ প্রতিফলক।
(iii) ভাল তাপ-প্রতিফলক সাধারণতঃ খারাপ তাপ-শোষক।

### D5·7 তাপ বন্দী রাখিবার ফলেই থার্মোফ্লাস্ক ( thermos flask )

থার্মোস পাত্রে তাপ আটকাইয়া থাকে। একই পাত্রে প্রয়োজনবোধে কখনও গরম চা অথবা ঠাণ্ডা সরবৎ রাখা যায়। থার্মোস পাত্রের বিশেষত্ব হইল এই পাত্রের ভিতর হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে ভিতরে কোন রকম তাপ যাতায়াত করিতে পারে না। থার্মোস পাত্রের গাত্র খুব চকচকে রাখা হয়। পাত্রের ভিতরের ও বাহিরের মধ্যস্থিত জায়গা সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা হয়। থার্মোস পাত্রটির আবরণ কোন কুপরিবাহী বস্তুর দ্বারা নির্মিত হয়—যথা শোলা। পরিবহণ,
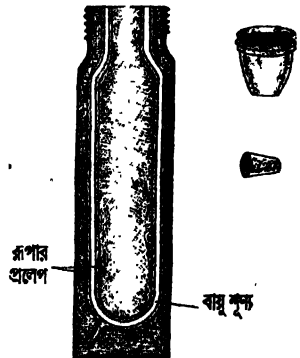
Fig. 27 থার্মোফ্লাস্ক

পরিচলন বা বিকিরণ কোন উপায়েই তাপ ভিতর হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে ভিতরে যাইতে পারে না। তাই ঠাণ্ডা জিনিস ঠাণ্ডা থাকে এবং গরম জিনিস গরম রহিয়া যায়। তাহা হইতে তাপ বাহির হয় না।

## D6·1 তাপশক্তির (energy) ব্যবহারিক প্রয়োগ

ব্যবহারিক জীবনে তাপশক্তিকে কাজে লাগাইয়া মানুষ অনেক অসাধ্যসাধন করিয়াছে, দূরত্বের ব্যবধানকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। কলিকাতা হইতে দিল্লী ৯০২ মাইলের পথ। আজকের দিনে কাহারও পক্ষে এই পথ পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া একরকম কল্পনাতীত। রেলগাড়ীর কামরায় গিয়া বসিলে এই দূরত্ব ট্রেনের এনজিনের সাহায্যে একদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। আবার ট্রেনের এনজিন অপেক্ষা আরও দ্রুতগামী যান এরোপ্লেনের দৌলতে এই দূরত্বের অবসান কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘটে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে রেলের এনজিন ও এরোপ্লেনের এনজিন এই দুই প্রকার যানই তাপশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োজনের দুইটি সুন্দর নিদর্শন। তাপশক্তি দুই ক্ষেত্রেই যানবাহনকে স্বয়ংগচ্ছ করিয়া তোলে। দূর নভলোকে মানুষের নতুন যাত্রার যে আশাতীত সাফল্যের সূচনা হইয়াছে, তাহাও তাপশক্তির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের আর একটি নিদর্শন।
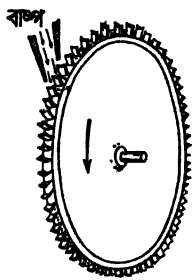
Fig. 28
স্টীম টারবাইন

## D6·2 দাহ্য পদার্থের দহনজনিত তাপের সাহায্যে স্বয়ংগচ্ছ যান গতিশীল হয়

নিঃসীম শূন্যে যে এরোপ্লেনটি নিমেষে উড়িয়া গেল অথবা চোখের সম্মুখে যে এনজিনটি রেলগাড়ীর কামরাগুলিকে লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহাদের গতিশীলতার পিছনে দাহ্যপদার্থের দহনজনিত তাপশক্তিই দায়ী। অবশ্য এই দুই রকম স্বয়ংগচ্ছ যানের গতিশীলতার জন্য ভিন্ন দাহ্যপদার্থের ব্যবহার করা যায়।
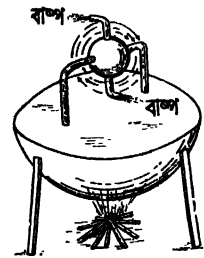
Fig. 29
হেরোর স্টীম এনজিন

(i) কয়লা পুড়াইয়া জলকে উত্তপ্ত করিয়া রেলের এনজিন চালু রাখার জন্য তাপ সৃষ্টি করা হয়।

(ii) বায়ুর উপস্থিতিতে পেট্রোল পুড়াইয়া এরোপ্লেনের এনজিন চালু রাখার জন্য তাপ সৃষ্টি করা হয়।

## D6·3 বহির্দহন ( external combustion engine )

সিলিণ্ডারের বাহিরে অন্য জায়গায় জল উত্তপ্ত করা হয় এবং বয়লারের সঙ্গে বাষ্প প্রকোষ্ঠের সংযোগ থাকে।

উদাহরণ—রেল এনজিন

**অন্তর্দহন এনজিন** ( internal combustion engine )

বায়ুর সঙ্গে দাহ্য পদার্থকে দহন করিয়া তাপসৃষ্টি করা হয় ও তাহার সাহায্যে এনজিনকে গতিশীল করা হয়।

উদাহরণ—মোটার ও এরোপ্লেন এনজিন

## D6·4 বাষ্পের কল এনজিন

জলকে উত্তপ্ত করিলে 1666 গুণ বাড়ে। এই প্রসারণের ফলে যে শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই পিস্টনকে আঘাত করিয়া গতিশীল করিয়া তোলে। এই বাষ্পের চাপকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালিত করা হয় যাহাতে পিস্টনকে ওঠা-নামার গতিসম্পন্ন করা যায়ঃ দুটি ভাল্‌ভ পর্যায়ক্রমে খুলিয়া ও বন্ধ হইয়া এই কার্যকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।
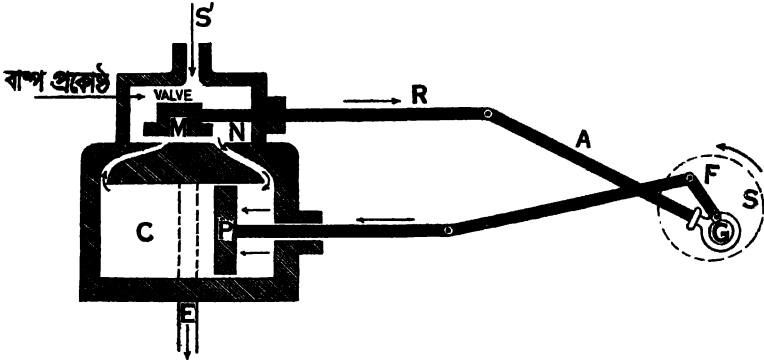
Fig 30 স্টীম এনজিনের গঠন

**একটি এনজিনের শারীরস্থান** ( anatomy of an engine )

(i) বাষ্প প্রকোষ্ঠ (steam chest)—একটি মজবুত প্রকোষ্ঠ যেখানে বয়লার হইতে উচ্চচাপসম্পন্ন বাষ্প নল দিয়া প্রবেশ করে।

(ii) সিলিনডার C ( cylinder )—বাষ্প প্রকোষ্ঠের নীচে ইহা একটি শক্ত বাক্স—উপর ও নীচের দুই প্রকোষ্ঠের সহিত M ও N দ্বার দ্বারা যুক্ত।

(iii) গতিশীল ভাল্‌ভ ( slide valve )—M ও N বাষ্প যাতায়াতের পথে কপাট—বাষ্প সিলিণ্ডারের প্রবেশমুখে ইহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

(iv) পিস্টন P (piston)—ইস্পাতের তৈরী, বায়ুনিরুদ্ধ অবস্থায় সিলিণ্ডারের ভিতর ওঠা-নামা করে।

(v) ক্র্যাঙ্ক F ( crank )—এনজিনের মূলদণ্ড G ও অপর দিকে পিস্টনের সহিত সংযুক্ত, পিস্টনের দক্ষিণ-বামে আবর্তনের সময় ক্র্যাঙ্ক মূলদণ্ডে ঘূর্ণন আনে।

(vi) উৎকেন্দ্রিক S ( eccentric )—ইহা অপর একটি ক্র্যাঙ্ক A-র দ্বারা গতিশীল ভাল্‌ভ দণ্ড R এর সঙ্গে যুক্ত একটি চাকতি বিশেষ। মূলদণ্ডের কেন্দ্রের সহিত ইহার কেন্দ্র এক নয় বলিয়া উৎকেন্দ্রিক বলে।

(vii) নির্গমদ্বার E ( exhaust port )—M ও N দ্বারের মধ্যে অবস্থিত সিলিণ্ডারের সহিত সংযুক্ত। এনজিন হইতে বাষ্প নির্গমনের পথ।
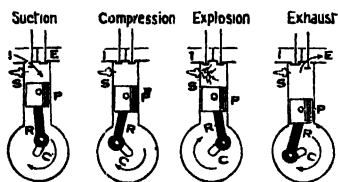
Fig. 31 মোটারের এনজিন
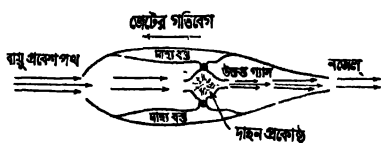
Fig. 32 জেট প্লেনের এনজিন

| বাষ্পীয় এনজিন | গ্যাসীয় এনজিন |
|---|---|
| (i) বাষ্পের প্রসারণে পিস্টন গতি পায় | (i) গ্যাস ও বায়ুর দহনে বিস্ফোরণের চাপে পিস্টন গতি পায় |
| (ii) বেশী জায়গার প্রয়োজন | (ii) স্বল্প জায়গার প্রয়োজন |
| (iii) চালু করিতে সময় সাপেক্ষ | (iii) চালু করিতে বেশি সময় লাগে |
| (iv) দুই ধাক্কায় চলে | (iv) চাব ধাক্কায় চলে |
| (v) কার্যক্ষমতা কম | (v) কার্যক্ষমতা বেশী |

## প্রশ্নাবলী

1. তাপ অদৃশ্য হইলেও কি করিয়া উহার স্বরূপ বুঝা যায় ?
2. তাপের উৎস কি কি ? তাপ বলিতে কি বুঝ ?
3. তাপ ও উষ্ণতার মধ্যে প্রভেদ কি ? থার্মোমিটার সম্বন্ধে যাহা নিরূপণ করি তাহা কি ?
4. জ্বর দেখিবার থার্মোমিটারের সঙ্গে সাধারণ থার্মোমিটারের প্রভেদ কোথায় ? জ্বর দেখিবার থার্মোমিটারে অংশাঙ্কন 95°F – 110°F থাকে কেন ?
5. যে থার্মোমিটারের সাহায্যে একই জায়গার একই দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা নিরূপণ করা যায় তাহার বিশদভাবে বর্ণনা দাও।
6. বিভিন্ন রকমের থার্মোমিটারে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক এক কেন হয় না ?
7. স্ফুটন ও বাষ্পীভবনে প্রভেদ কোথায় ?
8. তাপ যে চরিষ্ণু তাহা কোন পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও।
9. তাপ সঞ্চারণের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি লিখ।
10. বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তাপযুক্তি বা তাপমুক্তিতে কি কি পরিবর্তন ঘটে ?
11. সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু সৃষ্টির পিছনে যে তাপ কাজ করে তাহা দেখাও।
12. থার্মোফ্লাস্ক যে তাপবন্দী রাখিবার কল, এই উক্তিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাও।
13. বিভিন্ন পদার্থের তাপপরিবাহিতা যে একপ্রকার নয় তাহা পরীক্ষার দ্বারা বুঝাও।
14. মাটির কুঁজোতে জল বেশী ঠাণ্ডা হয় কেন ? পশমের পোশাক কেন গরমবোধ হয় ?
15. মানুষের হাতে তাপশক্তি কি করিয়া দূরত্বমোচনের সহায়ক হইয়াছে তাহা লিখ।

# E. Chemistry—Syllabus

*The portions in the Syllabus underlined are optional and may be omitted until further notice*

| | Course Content | Demonstration & Experiments |
|---|---|---|
| E1. | Oxides, acids, bases; mainly by examples. | |
| E2. | Some common salts we use; their composition and principal uses; common salt, sodium carbonate, washing soda, baking soda, potassium permanganate, magnesium sulphate, smelling salts, caustic soda. (N. B. Some other common salts are treated below). | |
| E3. | CHLORINE: preparation of chlorine, properties of chlorine, bleaching powder; use to bleach, to disinfect. Hydrochloric acid; properties and | Appropriate experiments |
| E4. | SULPHUR: Uses of sulphur; dioxide; preparation and uses of sulphuric acid; properties and uses. | |
| E5. | PHOSPHORUS: methods of making fire matches, safety matches, calcium phosphate. | |
| E6. | NITROGEN: air and nitrogen, ammonia, manufacture of ammonia and ammonium salts, nitric acid, ammonium nitrates, sulphates (fertilisers); the nitrogen cycle. | |
| E7. | LIME and its products: Chalk; lime-burning; quick lime and slaked lime, setting of mortar and plaster, carbon dioxide and rocks, softening of water, lime in agriculture. | |

# সারাংশ

E 1·1 **রসায়ন শাস্ত্র,** চিহ্ন, সঙ্কেত, ফরমূলা, মৌলপঞ্জী

·2 **অক্সাইড** (Oxide) : অক্সিজেন এবং অপর একটি মৌলের মিলনে যে দ্বিযৌগিক হয় তাহাকে অক্সাইড বলে

**বিভিন্ন প্রকার অক্সাইড :**

(*i*) অ্যাসিডিক অক্সাইড (acidic oxide) বা অ্যানহাইড্রাইড (anhydride)— $N_2O_5$ ; $SO_3$

(*ii*) প্রশম অক্সাইড (neutral oxide)—CO ; NO

(*iii*) ক্ষারকীয় অক্সাইড (basic oxide)—CaO ; $Na_2O$

(*iv*) উভপ্রকৃতির অক্সাইড (amphoteric oxide)—ZnO ; $Al_2O_3$

(*v*) উচ্চ অক্সাইড (peroxide)—$Na_2O_2$ ; $BaO_2$

·3 **অ্যাসিড** (Acid) : অ্যাসিড একটি যৌগ পদার্থ যাহাতে প্রতিস্থাপনীয় (replaceable) হাইড্রোজেন আছে
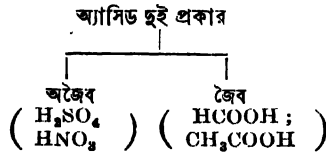
·4 **ক্ষারক** (Base) : কোন ধাতব মৌলের (অথবা ধাতুর অনুরূপ ব্যবহারিক যৌগমূলকের) অক্সাইডগুলিকে ক্ষারক বলা হয় —Zn $(OH)_2$ ; CaO ।

·5 **ক্ষার** (Alkalies) : জলে দ্রবণীয় ধাতব হাইড্রক্সাইডকে ক্ষার বলা হয়। **সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারকই ক্ষার হয় না।** KOH ; NaOH ; $Ca(OH)_2$ ।

E 2·1 **লবণ** (Salts) : অ্যাসিড ও অ্যালক্যালির মাঝে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জল ছাড়া অপর যে যৌগিকের সৃষ্টি হয় তাহাই লবণ

$NaOH + HNO_3 = NaNO_3 + H_2O$
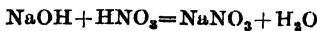
অ্যালক্যালি + অ্যাসিড = লবণ + জল

·2 (*i*) **সাধারণ লবণ** [Common Salt—NaCl Sodium Chloride]

(*ii*) সোডিয়াম কার্বনেট (sodium carbonate—$Na_2CO_3$)

(*iii*) কাপড়-কাচা সোডা (washing soda—$Na_2CO_3, 10H_2O$)

(*iv*) রুটি তৈরীর সোডা [baking soda—sodium bicarbonate, Potassium Hydrogen Tartrate]

(*v*) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (potassium permanganate—$KMnO_4$)

(*vi*) ম্যাগনিসিয়াম সালফেট (magnesium sulphate—$MgSO_4$)

(*vii*) ঘ্রাণ লইবার লবণ [(smelling salt—$(NH_4)_2CO_3$)]

(*viii*) কস্টিক সোডা (caustic soda—NaOH)

**E3 ·1 ক্লোরিন (Chlorine—Cl) :**

$MnO_2 + 4HCL = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
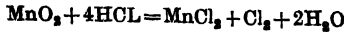
**·2 ব্লিচিং পাউডার** (Bleaching Powder)—$Ca\begin{smallmatrix}OCl\\Cl\end{smallmatrix}$ ঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ইহা হইতে নির্গত ক্লোরিনের উপরই বিরঞ্জক এবং জীবাণুনাশক গুণ নির্ভর করে

**·3 হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** (Hydrochloric Acid—HCL) ঃ ঝাঁঝাল গ্যাস - জলীয় দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বলে

**E4 ·1 সালফার** (Sulphur—S) ঃ অধাতু, তাপ এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়। প্রধান প্রয়োজন—সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করা

**·2 সালফার ডাই-অক্সাইড** (Sulphur Dioxide— $SO_2$) খুব ভারি গ্যাস— $H_2SO_4$ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়

**·3 সালফিউরিক অ্যাসিড** (Sulphuric Acid—$H_2SO_4$) : বহুল ব্যবহারের জন্য 'রসায়নের রাজা' বলা হয়। পণ্য উৎপাদনের দুইটি প্রণালী :

(*i*) প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি (Chamber Process)

(*ii*) স্পর্শ পদ্ধতি (Contact Process)

**E5 ·1 ফসফরাস** (Phosphorus—P) ঃ শ্বেত (white) এবং লোহিত (red)। শ্বেত ফসফরাস বিষাক্ত। দিয়াশলাই শিল্পে ফসফরাসের সর্বাধিক ব্যবহার: লুসিফার দিয়াশলাই (Lucifer Matches), সেফ্‌টি দিয়াশলাই (Safety Matches)

**·2 ক্যালসিয়াম ফসফেট** (Calcium Phosphate—$Ca_3[PO_4]_2$) : সার হিসাবে ব্যবহার

**E6 ·1 নাইট্রোজেন** (Nitrogen—N) : বায়ুর উপাদানের মধ্যে আয়তনিক পরিমাণ শতকরা 78.11 ভাগ হইল নাইট্রোজেন, ইহা মৌল অবস্থায় বর্তমান। উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-দেহের প্রোটিনগুলি সমস্তই নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ

**·2 অ্যামোনিয়া** (Ammonia—$NH_3$) ঃ নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের যোগ হেবার পদ্ধতিতে (Haber's Process) অ্যামোনিয়ার শিল্পোৎপাদন

**·3 অ্যামোনিয়ার লবণ** (Ammonium Salts) :

(*i*) অ্যামোনিয়াম সালফেট [ammonium sulphate—$(NH_4)_2SO_4$] ভাল সার

(*ii*) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (ammonium nitrate—$NH_4NO_3$ এ দেশের উপযোগী ভাল সার

(*iii*) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (ammonium chloride—$NH_4CL$) : কয়েক প্রকার সেল ও ব্যাটারীতে প্রয়োজন

(*iv*) অ্যামোনিয়াম কার্বনেট (ammonium carbonate—$(NH_4)_2CO_3$) : বেকিং পাউডারে প্রয়োজন হয়

·4 **নাইট্রিক অ্যাসিড** (**Nitric Acid—$HNO_3$**) : তীব্র জারক ; 'Aqua Regia' —গাঢ় $HNO_3$ এবং গাঢ় HCL-এর মিশ্রণ—সোনা, প্ল্যাটিনাম দ্রবীভূত হয়। বিস্ফোরকে প্রয়োজনীয়

5 **নাইট্রোজেন চক্র** (**Nitrogen Cycle**) :

বায়ুর মৌল-নাইট্রোজেন হইতে প্রোটিন গঠন ( প্রোটিন নাইট্রোজেন যৌগ ) মানুষ, জীব-জন্তু, উদ্ভিদদেহে প্রোটিন শোষণ। প্রকৃতিতে বিপরীত ক্রিয়ার ফলে প্রাণী এবং উদ্ভিদের মৃতদেহ পচিয়া নাইট্রোজেন যৌগ এখন মুক্ত নাইট্রোজেন এবং অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়। ইহার ফলে বায়ুমণ্ডলেতে নাইট্রোজেনের অনুপাত সমান থাকে

·1 **চুন** (**Lime—CaO**) ঃ এবং চুনের পণ্যদ্রব্য :

(*i*) চক (**Chalk**)

(*ii*) চুনা পাথরকে পোড়ান (**Lime burning**)

(*iii*) কড়া চুন (**Quick Lime**)

(vi) কলিচুন (**Slaked Lime**)

·2 **মর্টার** এবং **প্লাস্টার** (**Mortar and Plaster Setting**)

·3 **কার্বন ডাই-অক্সাইড ও শিলা** (Carbon dioxide and Rocks)

·4 **কৃষিকার্যে চুন** (**Lime in Agriculture**)
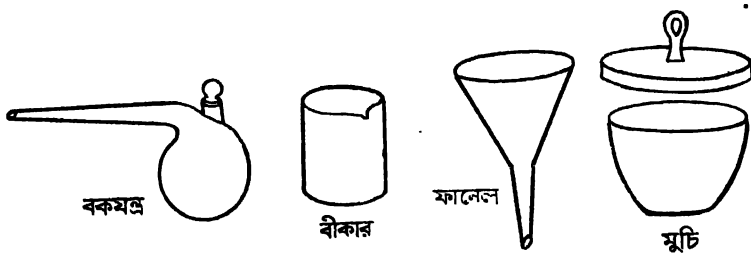
Fig. 1 পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ যন্ত্রপাতি
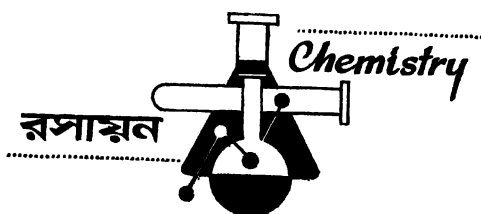
E

**E1 ·1** মানুষ শিশু থেকে বালক হয়, বালক থেকে যুবক তাহার পর বৃদ্ধ। কিন্তু মানুষের মনের কোন এক কোণে একটি চিরকালের শিশু বাসা বাঁধিয়া থাকে। তাহার চক্ষে বিস্ময়ের বিমুগ্ধতা, মনে উদ্বেল কৌতূহল। প্রকৃতিকে নানারূপে নানাভাবে সে চিনিতে চায়, বুঝিতে চেষ্টা করে। এই জানিবার চেষ্টাই তাহাকে বিজ্ঞানের পথে আনে। কেমন করিয়া মাটিতে বীজ পুঁতিলে তাহা গাছ, ফুল, ফলে পরিণত হইতেছে; খাদ্য হইতে কেমন করিয়া শরীরে রক্ত-মাংস সৃষ্টি হইতেছে; কাঠে আগুন দিলে উহা কেমন করিয়া পোড়ে এবং পুড়িয়া কি পদার্থে রূপান্তরিত হয়। পদার্থের এই রূপান্তর, তাহার গঠন ও গুণ, তাহাদের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ইত্যাদি জানিবার যে বিদ্যা তাহাই রসায়ন-বিদ্যা। বহু প্রাচীন কালে, মানুষের সমাজজীবন গঠনের আদিপর্বে, ভারতবর্ষেই, অনুমান করা হয়, সর্বপ্রথম এই শাস্ত্রের চর্চা হইয়াছিল এবং চীন দেশেও রসায়নের অনুশীলন প্রায় সমসাময়িক।

একশতের কিছু বেশী সংখ্যক মৌলের যোগ-বিয়োগের ফলেই এই পৃথিবীর সকল পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।
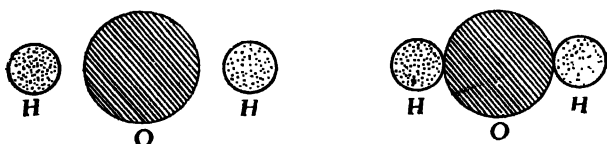
Fig. 2 মৌল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণু মিলিয়া যৌগ জলের অণুর সৃষ্টি

**চিহ্ন, সংকেত ও ফরমুলা:** সুবিধার জন্য মৌল ও যৌগ পদার্থগুলি সকলই চিহ্নের দ্বারা দেখান হয়—যেমন মৌল অক্সিজেন হইল O, সোডিয়াম হইল

Na (ল্যাটিন নাম Natrium)। ক্লোরিন হইল Cl; আবার সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগের ফরমুলা হইল NaCl। এখন দুইটি হাইড্রোজেন (H) অণু ও একটি অক্সিজেন অণু মিলিয়া একটি জলের অণু তৈরী হয়। ইহাকে দেখান হয় $H_2O$ লিখিয়া (Fig. 2)। দুইটি H অণুর সংকেত হইল $H_2$।

**সমীকরণ:** রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অ্যামোনিয়া ($NH_3$) এবং নাইট্রিক অ্যাসিড ($HNO_3$) মিলিয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ($NH_4NO_3$) সৃষ্টি করে। সমীকরণ দ্বারা ইহাকে লেখা যায় $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$

## মৌল পঞ্জী

কতকগুলি বিশিষ্ট মৌলের নাম, চিহ্ন ও পারমাণবিক ওজন:

| মৌলিক পদার্থ | চিহ্ন | পারমাণবিক গুরুত্ব | পরমাণু ক্রমাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| অক্সিজেন (oxygen) | O | ১৬·০০০ | ৮ |
| আর্সেনিক (arsenic) | As | ৭৪·৯১ | ৩৩ |
| আরগন (argon) | A | ৩৯·৯৪৪ | ১৮ |
| আয়রন (iron) | Fe | ৫৫·৮৫ | ২৬ |
| আয়োডিন (iodine) | I | ১২৬·৯২ | ৫৩ |
| অ্যালুমিনিয়াম (aluminium) | Al | ২৬·৯৭ | ১৩ |
| অ্যান্টিমনি (antimony) | Sb | ১২১·৭৬ | ৫১ |
| ইউরেনিয়াম (uranium) | U | ২৩৮·০৭ | ৯২ |
| কপার (copper) | Cu | ৬৩·৫৪ | ২৯ |
| কার্বন (carbon) | C | ১২·০১ | ৬ |
| কোবল্ট (cobalt) | Co | ৫৮·৯৪ | ২৭ |
| ক্লোরিন (chlorine) | Cl | ৩৫·৪৫৭ | ১৭ |
| ক্রোমিয়াম (cromium) | Cr | ৫২·০১ | ২৪ |
| ক্যালসিয়াম (calcium) | Ca | ৪০·০৮ | ২০ |
| গোল্ড (gold) | Au | ১৯৭·২ | ৭৯ |
| জিঙ্ক (zinc) | Zn | ৬৫·৩৮ | ৩০ |
| টিন (tin) | Sn | ১১৮·৭ | ৫০ |

| মৌলিক পদার্থ | চিহ্ন | পারমাণবিক গুরুত্ব | পরমাণু ক্রমাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| থোরিয়াম (thorium) | Th | ২৩২·১২ | ৯০ |
| নাইট্রোজেন (nitrogen) | N | ১৪·০০৮ | ৭ |
| নিকেল (nickel) | Ni | ৫৮·৬৯ | ২৮ |
| নিয়ন (neon) | Ne | ২০·১৮৩ | ১০ |
| প্লাটিনাম (platinum) | Pt | ১৯৫·২৩ | ৭৮ |
| প্যালেডিয়াম (palladium) | Pd | ১০৬·৭ | ৪৬ |
| ফসফরাস (phosphorus) | P | ৩০·৯৮ | ১৫ |
| ফ্লোরিন (fluorine) | F | ১৯·০ | ৯ |
| বেরিলিয়াম (berilium) | Be | ৯·০২ | ৪ |
| বেরিয়াম (berium) | Ba | ১৩৭·৩৬ | ৫৬ |
| মারকারি (mercury) | Hg | ২০০·৬ | ৮০ |
| ম্যাঙ্গানিজ (manganese) | Mn | ৫৪·৯৩ | ২৫ |
| ম্যাগনিসিয়াম (magnesium) | Mg | ২৪·৩২ | ১২ |
| র‍্যাডন (radon) | Rn | ২২২·০ | ৮৬ |
| লিথিয়াম (lithium) | Li | ৬·৯৪ | ৩ |
| লেড (lead) | Pb | ২০৭·২২ | ৮২ |
| সালফার (sulphur) | S | ৩২·০৬৬ | ১৬ |
| সিলভার (silver) | Ag | ১০৭·৮৮ | ৪৭ |
| সোডিয়াম (sodium) | Na | ২২·৯৯৭ | ১১ |
| হাইড্রোজেন (hydrogen) | H | ১·০০৮ | ১ |

**কতকগুলি প্রয়োজনীয় ফরমূলা :**

জল—$H_2O$

কস্টিক সোডা—NaOH

কস্টিক পটাশ—KOH

কলিচুন—$Ca(OH)_2$

অ্যামোনিয়া—$NH_3$

সালফার ডাই-অক্সাইড—$SO_2$

সালফিউরিক অ্যাসিড—$H_2SO_4$

নাইট্রিক অ্যাসিড—$HNO_3$

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড—HCL

সোডিয়াম ক্লোরাইড—NaCl

পটাসিয়াম নাইট্রেট—$KNO_3$

কপার অক্সাইড—CuO

কার্বন ডাই-অক্সাইড—$CO_2$

সোডিয়াম কার্বনেট—$Na_2CO_3$

**E1·2 অক্সাইড:** দুইটি বিভিন্ন মৌলের ( element ) সংযোগ হইতে যে যৌগিকের সৃষ্টি হয় তাহাকে দ্বিযৌগিক ( binary compound ) পদার্থ বলে। অক্সিজেন ( oxygen ) এবং অপর একটি মৌলের মিলনে যে দ্বিযৌগিক হয় তাহাকে অক্সাইড বলে।

বিভিন্ন প্রকার অক্সাইড:

| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
|---|---|---|---|---|
| অ্যাসিডিক অক্সাইড (acidic oxide) | প্রশম অক্সাইড ( neutral oxide ) | ক্ষারকীয় ( basic ) অক্সাইড | উভপ্রকৃতির অক্সাইড (amphoteric oxide) | উচ্চ অক্সাইড (peroxide) |

| নাম | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| (i) অ্যাসিডিক অক্সাইড | (i) সাধারণতঃ ইহারা অধাতব অক্সাইড (oxides of non metals ) হইয়া থাকে। (ii) ইহারা জলের সংস্পর্শে অম্লের ( acid ) সৃষ্টি করে এবং ক্ষারককে ( base ) প্রশমিত ( neutralise ) করে। **উদাহরণ:—** অক্সিজেন-ভরা একটি গ্যাস জারে এক টুকরা জ্বলন্ত ফসফরাস উজ্জ্বলন ( deflagrating ) চামচের সাহায্যে প্রবেশ করাইলে উহা তীব্রভাবে জ্বলে এবং ফসফরাস অক্সাইডের সৃষ্টি হয়। জারের ভিতর এখন জল এবং নীল লিটমাস কাগজ দিয়া নাড়িলে নীল লিটমাস লাল হয়, কারণ ফসফরিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হইয়াছে। $P_2O_5 \rightarrow$ ফসফরিক অক্সাইড; $P_2O_5 + H_2O$ ( ঠাণ্ডা ) $= 2HPO_3$ ( মেটা-ফসফরিক অ্যাসিড ), $P_2O_5 + 3H_2O$ ( গরম ) $= 2H_3PO_4$ ( অর্থো-ফসফরিক অ্যাসিড ), এইরূপ সালফিউরিক অক্সাইড এবং নাইট্রিক অক্সাইড হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। |

| নাম | বৈশিষ্ট্য |
| --- | --- |
| | $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ ( সালফিউরিক অ্যাসিড)<br>$N_2O_5 + H_2O = 2HNO_3$ ( নাইট্রিক অ্যাসিড ) |
| (ii) প্রশম অক্সাইড (neutral oxide) | 1. জলের সহিত যুক্ত হইয়া ইহারা অ্যাসিড সৃষ্টি করে না।<br>2. ইহারা ক্ষারকের (base) ন্যায় ক্রিয়া করে না।<br>**উদাহরণ :**<br>জল ( $H_2O$ ), নাইট্রোজেন মনোক্সাইড ( NO ), কার্বন মনোক্সাইড ( CO )। |
| (iii) ক্ষারকীয় অক্সাইড (basic oxide) | 1. সাধারণতঃ ক্ষারকীয় অক্সাইডগুলি ধাতব অক্সাইড হইয়া থাকে।<br>2. অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইলে ইহারা অ্যাসিডকে প্রশমিত করিয়া লবণ ও জলের সৃষ্টি করে।<br>3. ইহারা অ্যাসিডিক অক্সাইডের সহিত শুধু লবণ উৎপন্ন করিয়া থাকে।<br>4. ইহাদের মধ্যে কতকগুলির সহিত জল মিশাইলে ধাতব হাইড্রক্সাইডের সৃষ্টি হয়— ইহাতে লাল লিটমাস কাগজ দিলে উহা নীল হইয়া যায়।<br>**উদাহরণ :** CaO ( ক্যালসিয়াম অক্সাইড )<br>$Na_2O$ ( সোডিয়াম ,, )<br>CuO ( কপার ,, )<br>FeO ( আয়রন ,, )<br>$MgO + 2HCl = MgCl_2 + H_2O$<br>ম্যাগনিসিয়াম অক্সাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিলিয়া ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইড এবং জলের সৃষ্টি করিয়া থাকে।<br>$CaO + CO_2 = CaCO_3$ ( ক্যালসিয়াম কার্বনেট )<br>ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই-অক্সাইড মিলিয়া ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরী করিয়াছে। |

| নাম | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|
| | $K_2O+H_2O=2KOH$ (পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড)<br>পটাসিয়াম অক্সাইড এবং জল মিলিয়া পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড সৃষ্টি করে। |
| (iv) উভ-প্রকৃতির অক্সাইড (amphoteric oxide) | 1. ইহারা অ্যাসিডিক (acidic) এবং ক্ষারকীয় (basic) এই দুই প্রকার অক্সাইডের মতই আচরণ করে। ইহারা অম্লের এবং ক্ষারকীয় অক্সাইডের সহিত মিলিয়া লবণ উৎপন্ন করে।<br>**উদাহরণ:** $ZnO$ ( জিঙ্ক অক্সাইড )<br>$SnO_2$ ( টিন অক্সাইড )<br>$Al_2O_3$ ( অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড )<br>জিঙ্ক অক্সাইড অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইয়া জিঙ্কের লবণ ও জল উৎপন্ন করে।<br>$ZnO+2HCl=ZnCl_2$(জিঙ্ক ক্লোরাইড)$+H_2O$<br>এখানে ZnO ক্ষারকীয় আচরণ করিয়াছে। ZnO গলান ( fused ) ক্ষারে দ্রাব্য এবং ইহার ফলে জিঙ্কের লবণ উৎপন্ন হয়।<br>$ZnO+2NaOH=Zn(ONa)_2$ (সোডিয়াম জিঙ্কেট)$+H_2O$<br>এখানে জিঙ্কের প্রকৃতি অ্যাসিডিক। |
| (v) উচ্চ অক্সাইড ( peroxide ) | উচ্চ অক্সাইড ( peroxide ) তাহাদেরই বলা হয় যে গুলি পাতলা ( dilute ) অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইলে ঠাণ্ডায় $H_2O_2$ ( হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ) উৎপন্ন করে। ধাতব অক্সাইডের সহিত ইহারা লবণ ও $H_2O_2$ উৎপন্ন করে।<br>$Na_2O_2+2HCl=H_2O_2+2NaCl$ ( সোডিয়াম ক্লোরাইড )<br>$BaO_2+2HCl=H_2O_2+BaCl_2$ ( বেরিয়াম ক্লোরাইড ) |

**E1·3 অ্যাসিড :** অ্যাসিড একটি যৌগ পদার্থ যাহাতে প্রতিস্থাপনীয় ( replaceable ) হাইড্রোজেন আছে ; ধাতু বা ধাতুর অনুরূপ ব্যবহারিক যৌগ-মূলক (যেমন $NH_4$) দ্বারা সোজাসুজি ( directly ) অথবা ঘুরাইয়া (indirectly) অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত করা যায়। ক্ষারের ( alkali ) সহিত অ্যাসিডের বলশালী ( vigorous ) প্রতিক্রিয়া হয়। অ্যাসিডের স্বাদ টক। জলে দ্রবণীয় অ্যাসিড হইলে নীল লিটমাস কাগজ উহাতে ভিজাইলে লাল হইবে। জলে দ্রবীভূত অবস্থায় অ্যাসিডের অণুগুলি বিযুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন আয়নের ( $H^+$ ) সৃষ্টি করে অর্থাৎ তড়িৎ পরিবহণ করে।

**উদাহরণ :** $H_2SO_4$ ( সালফিউরিক অ্যাসিড )। ইহাকে অ্যাসিড বলা হয় কারণ :—

(i) সালফিউরিক অ্যাসিডের অণুতে দুইটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু আছে।

(ii) এই পরমাণু দুইটি পটাসিয়াম (K) অথবা সোডিয়াম ( Na ) জাতীয় ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে। আংশিক প্রতিস্থাপিত হইলে $KHSO_4$ ( পটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট ) এবং সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হইলে $K_2SO_4$ ( পটাসিয়াম সালফেট ) গঠিত হইবে। ধাতুর অনুরূপ ব্যবহারিক যৌগমূলক— যেমন $(NH_4)$-দ্বারা যদি আংশিক প্রতিস্থাপিত হয় তাহা হইলে $(NH_4)HSO_4$ ( অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট ) এবং সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হইলে $(NH_4)_2SO_4$ ( অ্যামোনিয়াম সালফেট ) গঠিত হইবে।

। অ্যাসিডের অন্যান্য লক্ষণ যেমন লবণ উৎপন্ন করা [$K_2SO_4$, $(NH_4)_2SO_4$, ইত্যাদি ] এবং নীল লিটমাস কাগজ লাল হওয়া $H_2SO_4$-এ পাওয়া যায়।

**দুই প্রকার অ্যাসিড :** সকল প্রকার অ্যাসিডকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(1) **জৈব** ( organic ) এবং (2) **অজৈব** ( inorganic )। এই দুই প্রকার অ্যাসিডের মধ্যে প্রধান অমিল হইল জৈব অ্যাসিডে কার্বন থাকিবে এবং অজৈব অ্যাসিডে কার্বন থাকিবে না।

(1) **জৈব অ্যাসিড :—**

(i) HCOOH ফরমিক অ্যাসিড (Formic acid—পিঁপড়ার হুলে পাওয়া যায় )।

(ii) $C_3H_4OH\ (COOH)_3$ সিট্রিক অ্যাসিড ( citric acid—লেবুতে পাওয়া যায় )।

(iii) $CH_3COOH$ অ্যাসেটিক অ্যাসিড ( acetic acid—সির্কাতে পাওয়া যায় )।

(2) **অজৈব অ্যাসিড :—**

(i) $H_2SO_4$ সালফিউরিক অ্যাসিড ( sulphuric acid ).

(ii) $HNO_3$ নাইট্রিক অ্যাসিড ( nitric acid )

(iii) $HCl$ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydrochloric acid)

**E1·4 ক্ষারক** ( **Base** ) : কোন ধাতব মৌলের ( অথবা ধাতুর **অনুরূপ** ব্যবহারিক যৌগমূলকের ) অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইডগুলিকে ক্ষারক বলা হয়।

**উদাহরণ :** সোডা, ছাই, চুন প্রভৃতি জিনিসগুলি ক্ষারক।

অ্যাসিডের সহিত ইহাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।

$$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$$

ক্ষারক + অ্যাসিড = লবণ + জল

[ক্যালসিয়াম অক্সাইড] + [হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড] = [ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড] + [জল]

$$Zn\ (OH)_2 + H_2SO_4 = ZnSO_4 + 2H_2O$$
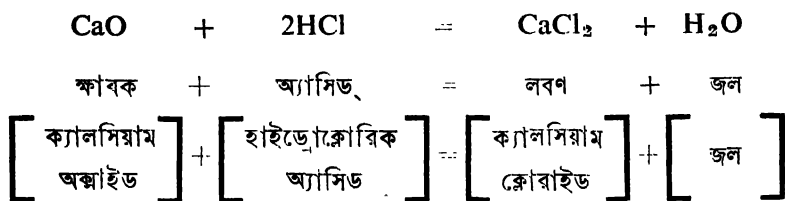
জিঙ্ক হাইড্রক্সাইড + সালফিউরিকঅ্যাসিড = জিঙ্ক সালফেট + জল

অ্যামোনিয়া $(NH_3)$ এবং আরও কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলিকে ক্ষারক বলিয়া ধরা হইলেও উহারা শুধু লবণ উৎপন্ন করে, জল নয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড কিন্তু লবণ ও জল দুই উৎপন্ন করে।

$NH_3 + HCl = NH_4Cl$ কিন্তু $NH_4OH + HCl = NH_4Cl + H_2O$

**E1·5 ক্ষার** (**Alkalies**) : যে সকল ধাতব হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবণীয় তাহাদের ক্ষার বলা হয়। **সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারকই ক্ষার হয় না।**

**উদাহরণ :** (i) KOH ( পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড অথবা কষ্টিক পটাশ )

(ii) NaOH ( সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অথবা কষ্টিক সোডা )

(iii) $Ca\ (OH)_2$ ( ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড—চুনের জল )

**কতকগুলি বৈশিষ্ট্য :** (i) ক্ষার জলে দ্রবণীয় এবং দ্রবণে (OH) আয়ন সৃষ্টি হয়।

(ii) জলীয় দ্রবণের স্পর্শ সাবান-জলের মত এবং ইহা বিদ্যুৎ পরিবহণ করে।

(iii) ধাতব লবণের দ্রবণের সহিত ক্ষার মিশ্রিত করিলে উহাদের হাইড্রক্সাইডগুলির অধঃক্ষেপ (precipitation) হয়।

(iv) অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া হইলে লবণ ও জলের সৃষ্টি হয়।

(v) জলীয় দ্রবণে লাল লিটমাস কাগজ ভিজাইলে উহা নীল হইয়া যায়।

## E2·1 আমরা ব্যবহার করি এমন কয়েকটি সাধারণ লবণ (Some Common Salts we use)

**লবণ :** অ্যাসিড এবং অ্যালক্যালির মাঝে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জল ছাড়া অপর যে যৌগিকের সৃষ্টি হয় তাহাই লবণ। অথবা অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, কোন ধাতু অথবা ধাতুর অনুরূপ ব্যবহারিক যৌগমূলকের দ্বারা কোন অ্যাসিড অণুর প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু বা পরমাণুগুলি আংশিক অথবা সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হইলে যে যৌগিকের সৃষ্টি হয় তাহাই লবণ। ক্ষারকের পরাবিদ্যুৎবাহী অংশ অ্যাসিডের অপরাবিদ্যুৎবাহী অংশের সহিত মিলিয়া লবণ গঠন করে।

**উদাহরণ :**

(i) $\overset{+}{Na}\overset{-}{OH} + \overset{+}{H}\overset{-}{NO_3} = NaNO_3 + H_2O$

[সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড] + [নাইট্রিক অ্যাসিড] = [সোডিয়াম নাইট্রেট] + [জল]

(ii) $KCl + H_2SO_4 = KHSO_4 + HCl$

[পটাসিয়াম ক্লোরাইড] + [সালফিউরিক অ্যাসিড] = [পটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট] + [হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড]

$2KCl + H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2HCl$

(iii) $MgO + 2HCl = MgCl_2 + H_2O$

[ম্যাগনিসিয়াম অক্সাইড] + [হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড] = [ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইড] + [জল]
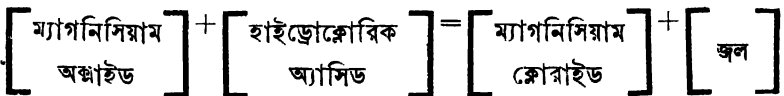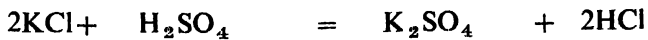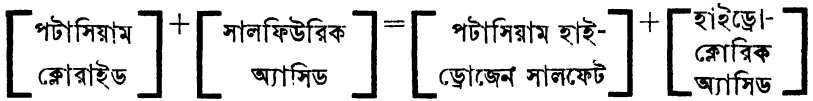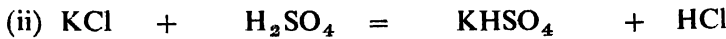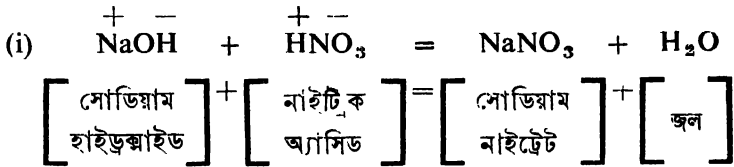
লবণের ধাতব অংশকে ক্ষারকীয় অংশ ( basic part ) এবং অন্য অংশকে আম্লিক অংশ ( acidic part ) বলা হয়। অ্যাসিড ও ক্ষারকের ক্রিয়া ছাড়াও বহু অন্য উপায়ে ক্ষারীয় অংশ ও আম্লিক অংশ সংযুক্ত হইলে লবণ উৎপন্ন হয়।

(iv) $CaO + CO_2 = CaCO_3$

[ক্যালসিয়াম অক্সাইড] + [কার্বন ডাই-অক্সাইড] = [ক্যালসিয়াম কার্বনেট]

(v) $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$

(vi) $Cu + Cl_2 = CuCl_2$
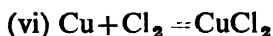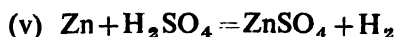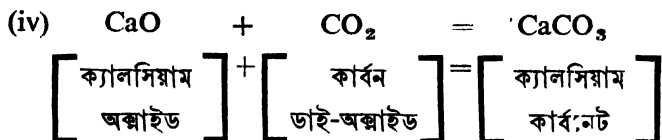
·2(i) **সাধারণ লবণ** ( Common Salt—NaCl ) : আমাদের খাওয়া-দাওয়া, রান্নায় যে লবণ ব্যবহার করি তাহাই **সাধারণ লবণ**। ইহার নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড ( Sodium Chloride—NaCl ), কারণ ইহা সোডিয়াম ও ক্লোরিনের যৌগ।

**প্রস্তুত প্রণালী :** লবণ জলকে বাষ্পীভূত করিলে লবণের দানা পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলে শতকরা আড়াই ভাগ সাধারণ লবণ পাওয়া যায়; ইহা ছাড়াও লবণ হ্রদে এবং লবণ খনিতে লবণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমুদ্রের অথবা লবণ হ্রদের তীরে বেশ বড় বড় অগভীর চৌবাচ্চা খুঁড়িয়া তাহাতে লবণ জল ভরিয়া রাখা হয়। সূর্যের তাপে জল বাষ্পীভূত হয় এবং লবণের দানা পাওয়া যায়।

খনিজ লবণের চাঙ্গড় খনি হইতে তোলা হয়—ইহা দেখিতে লালচে হয় ( সৈন্ধব লবণ )। অনেক সময় খনির গর্তে জল ঢালিয়া সেই জল পাম্প করিয়া তুলিয়া শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত হয়। আমরা দেখিয়াছি বর্ষাকালে লবণ জল টানে এবং কেমন ভিজা ভিজা হইয়া যায়। অশুদ্ধ লবণ হইলে ( ম্যাগনেসিয়াম বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড থাকিলে ) জল টানে ( উদ্‌গ্রাহী—hygroscopic )। শুদ্ধ লবণ উদ্‌গ্রাহী হয় না। আমরা যে table salt ব্যবহার করি তাহা শুদ্ধ লবণ। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে একটি পাত্রে জল লইয়া তাহাতে অশুদ্ধ লবণের সংপৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করিতে হইবে। এখন ইহার ভিতর দিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের গ্যাস পাঠাইলে বিশুদ্ধ লবণের দানা পাওয়া যাইবে।

**বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :** ইহা স্বচ্ছ বর্ণহীন স্ফটিক, জলে দ্রাব্য। ইহার স্বাদ নোনতা। ইহা মৃদু ( mild ) জীবাণু নাশক।

মাছ, মাংস, কাঁচা সব্‌জি ইত্যাদি লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে বহুদিন ঠিক থাকে।

গলায় টনসিলের ব্যথা ইত্যাদি হইলে গরম জলে লবণ মিশাইয়া কুলকুচি করিলে উপকার পাওয়া যায়।

সোডিয়াম কার্বনেট ( $Na_2CO_3$ ), কস্টিক সোডা ( $NaOH$ ), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ( $HCl$ ) ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে লবণের প্রয়োজন হয়।

চীনা মাটির (porcelain) দ্রব্য পালিশ করার কাজে লবণের দরকার লাগে।

**(ii) সোডিয়াম কার্বনেট** ( Sodium Carbonate—$Na_2CO_3$ ): আমাদের দেশে যে সাজিমাটি পাওয়া যায় তাহা সোডিয়াম কার্বনেট এবং বাইকার্বনেটের সংমিশ্রণ ( সাজিমাটি $Na_2CO_3$, $NaHCO_3$ )। ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়েনস হ্রদ, পূর্ব আফ্রিকার মাগাডি হ্রদের আশেপাশে, মিশরে, অশুদ্ধ অবস্থায় সোডিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়। মিশরে ইহাকে 'ট্রোনা' বলে। সমুদ্রের উদ্ভিদ্ পোড়াইলে যে ভস্ম হয় তাহাতে সোডিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায় এবং আগেকার দিনে এইভাবেই সোডিয়াম কার্বনেট তৈরী করা হইত।

**প্রস্তুত প্রণালী:** এখনকার দিনে সোডিয়াম কার্বনেটের উৎপাদন তিন প্রকার প্রণালীতে করা হয়ঃ

(i) লেব্লাঁক পদ্ধতি (Leblanc Process)

(ii) সলভে পদ্ধতি বা অ্যামোনিয়া সোডা পদ্ধতি (Solvay Process or Ammonia Soda Process)

(iii) তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Electrolytic Process or Hergreaves-Bird Process)

(i) **লেব্লাঁক** পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বস্তু হইল সাধারণ লবণ ($NaCl$), চুনাপাথর (Limestone, $CaCO_3$) এবং 'কোক্'। প্রথমে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও $NaCl$-কে মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে উহা সোডিয়াম সালফেটে ($Na_2SO_4$ ) পরিণত হইবে। ইহার পর সোডিয়াম সালফেট চুনাপাথর ও কোক একত্র করিয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে। এখন কোক দ্বারা বিজারিত সোডিয়াম সালফেট হইতে সোডিয়াম সালফাইড ($Na_2S$) উৎপন্ন হয়, আবার চুনাপাথরের সহিত বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম কার্বনেট তৈরী হয়।

$$2NaCl + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2HCl$$

$$Na_2SO_4 + 4C = Na_2S + 4CO$$

$$Na_2S + CaCO_3 = Na_2CO_3 + CaS$$
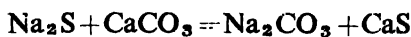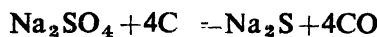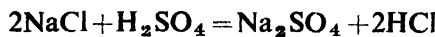
(ii) **সলভে প্রণালী :** জলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণকে অ্যামোনিয়া গ্যাস দিয়া সংপৃক্ত করা হয়। ইহার ভিতরে কার্বন ডাই-অক্সাইড ( $CO_2$ ) গ্যাস পাঠাইলে অ্যামোনিয়াম বাই-কার্বনেট ($NH_4HCO_3$) তৈরী হয়। এখন NaCI এবং $NH_4HSO_4$-এর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ফলে $NaHCO_3$ ও $NH_4Cl$ উৎপন্ন হয়। $NaHCO_3$ কে উত্তপ্ত করিলে উহার জল বাহির হইয়া যায় এবং $Na_2CO_3$ তৈরী হয়।

$$NH_3 + CO_2 + H_2O = NH_4HCO_3$$

$$NH_4HCO_3 + NaCl = NaHCO_3 + NH_4Cl$$

$$2NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$
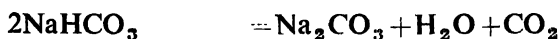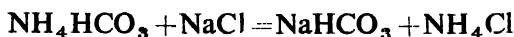
(iii) **তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি**—একটি 'সেল' ( cell )-কে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই সেলের ভিতর লবণ জলকে তড়িৎ প্রবাহিত করাইলে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে কস্টিক সোডা ( Caustic Soda –NaOH ) উৎপন্ন হয়। $CO_2$ পাঠাইয়া এই কস্টিক সোডাকে সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত করা হয়।

উপরের তিনটি প্রণালীর মধ্যে পূর্বে লেব্লাংক্ পদ্ধতির বেশী চল থাকিলেও এখন সলভে পদ্ধতিরই বেশী চল হইয়াছে। ভারতে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত মিঠাপুরে এই প্রণালীতে সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত হয়।

**বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :** ইহার রং শুভ্র, জলে দ্রবণীয়, স্বাদ ঈষৎ নোনতা ও কষা। উচ্চ তাপে $Na_2CO_3$ গলিয়া যায় কিন্তু বিযোজিত হয় না। ইহার জলীয় দ্রবণ মৃদু ক্ষারগুণ সম্পন্ন।

(i) সাবান, কস্টিক সোডা, কাচ ইত্যাদি তৈরীতে $Na_2CO_3$ প্রয়োজন হয়।

(ii) বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে এবং বস্ত্র ও অন্যান্য বস্তু পরিষ্কার করার জন্য $Na_2CO_3$ দরকার লাগে।

(iii) **কাপড় কাচা সোডা** (Washing Soda)—$Na_2CO_3$, $10H_2O$) **:** জলে $Na_2CO_3$ দ্রবীভূত করিয়া তাহার পর বাষ্পীভূত করিলে সোডার স্ফটিক ( soda crystals ) কেলাসিত হয়—ইহাকে কাপড় কাচা সোডা ( Washing Soda ) বলে। $Na_2CO_3$র সহিত যে $10H_2O$ ( ১০ অণু ) জল আছে উহাকে 'স্ফটিক জল' ( water of crystallisation ) বলে।

(iv) **রুটি তৈরী সোডা** ( Baking Soda—Sodium bi-carbonate, Potassium Hydrogen Tartrate )

**বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :** সোডিবাই-কার্ব এবং পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারট্রেটের মিশ্রণকে বেকিং সোডা বলে। ইহাকে উত্তপ্ত করিলে $NaHCO_3$ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হয় এবং $NaHCO_3$ সোডায় পরিণত হয়। রুটির ময়দা বা কেকের ময়দায় বেকিং সোডা মিশাইয়া মাখিলে ভিজা ময়দা যখন আগুনে সেঁকা হয় তখন $CO_2$ বাহির হইবার ফলে রুটি বা কেক ফুলিয়া ওঠে। $NaHCO_3$ ক্ষারের মত অম্লকে কমাইয়া দেয়। সোডার জল প্রস্তুত করিবার সময়, নানা ঔষধে $NaHCO_3$-র প্রয়োজন হয়।

(v) **পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট** (Potassium Permanganate—$KMnO_4$) ইহা পটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং অক্সিজেনের যৌগ। খনি হইতে যে পাইরোলুসাইট ( Pyrolusite) পাওয়া যায় তাহা হইতে $KMnO_4$ তৈরী করা হয়।

**বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :** ইহা বেগুনী রং-এর স্ফটিক হিসাবে পাওয়া যায়। ইহা জলে দ্রবণীয় এবং দ্রবণের রং বেগুনী হয়। ইহা ভাল জীবাণু-নাশক (disinfectant), পুকুর বা যে কোন জলাশয়ের জল পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়া পরিষ্কার করা হয়। কীট, পতঙ্গ, বিছা ইত্যাদি কামড়াইলে ক্ষতস্থান অল্প চিরিয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া $KMnO_4$ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

(vi) **ম্যাগনিসিয়াম সালফেট** (Magnesium Sulphate-$MgSO_4$) ইহা ম্যাগনিসিয়াম, সালফার ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। খনিতে ম্যাগনেসাইট (Magnesium Carbonate) পাওয়া যায়। ইহার সহিত পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।

**বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :** ইহা বর্ণহীন এবং স্ফটিকের মত কঠিন। অতিরিক্ত উত্তপ্ত করিলে ইহার স্ফটিক জল (water of crystallisation) উবিয়া যায়। $MgSO_4$ মৃদু জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জন ও বস্ত্র শিল্পে এবং ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজন হয়

**ঘ্রাণ লইবার লবণ** Smelling Salt $(NH_4)_2CO_3$—ইহা অ্যামোনিয়াম কার্বনেট নামে একটি লবণ এবং নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। কঠিন অবস্থাতেও ইহা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি উবিয়া যায় এবং

ইহা হইতে অ্যামোনিয়া গ্যাস ধীরে ধীরে বাহির হয়। ইহা অত্যন্ত তীব্র গন্ধযুক্ত এবং সর্দি, মাথাধরার পক্ষে উপকারী। অজ্ঞান ব্যক্তিকে এই গন্ধ শুঁকিতে দিলে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে। ইহা দুঃস্থিত (unstable) লবণ।

**(viii) কস্টিক সোডা (Caustic Soda—NaOH) :** যদিও সোডিয়াম একটি মৃদু ক্ষার, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটি তীব্র ক্ষার। ইহা সোডিয়াম, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ। ইহা লবণ নহে।

**প্রস্তুত প্রণালী :** NaOH প্রস্তুত করিবার দুইটি পদ্ধতি আছে

(1) **ক্ষারীকরণ পদ্ধতি** ( Causticising Process)

ইহাতে সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ( কলিচুন ) মিশান হয় এবং ফুটাইতে হয়। উহার ফলে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। $CaCO_3$ জলে অদ্রবণীয়, তলায় থিতাইয়া যায়।

$$(Na)_2CO_3 + Ca\ (OH)_2 = 2NaOH + CaCO_3$$
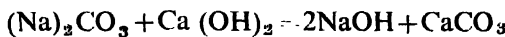
এই কস্টিক সোডা খুব বিশুদ্ধ নয়।

(2) **তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Eleectrolytic Process) :** জলেতে NaCl দ্রবীভূত করিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন উৎপন্ন হয়। এই সোডিয়াম এখন জলের সহিত ক্রিয়ার ফলে কষ্টিক সোডায় পরিণত হয়।

$$NaCl = \overset{+}{Na} + \overset{-}{Cl}$$

$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$

অথবা, $2NaCl + 2H_2O = 2NaOH + H_2 + Cl_2$
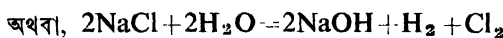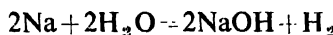
**বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :** ইহা দেখিতে সাদা এবং কঠিন স্ফটিকরূপে থাকে। ইহা সহজেই জল টানে ও জলে খুব দ্রাব্য। জলে গলিবার সময় তাপ বাহির হয় এবং দ্রবণটি সাবান জলের মত পিচ্ছিল। ইহা এত তীক্ষ্ণ ক্ষার যে হাতে লাগিলে হাত পুড়িয়া ঘা হয়।

(i) কঠিন সাবান তৈরী

(ii) কাগজ, কৃত্রিম রেশম ও রং উৎপাদনে

(iii) পেট্রোলিয়াম শোধনে

(iv) সোডিয়াম ধাতু উৎপাদনে

NaOH ব্যবহৃত হয়।

# ক্লোরিন
# (Chlorine)

| আণবিক সূত্র (molecular formula) | চিহ্ন Cl | পারমাণবিক গুরুত্ব (atomic weight) | পরমাণু ক্রমাঙ্ক atomic number |
|---|---|---|---|
| $Cl_2$ | | 35.46 | 17 |

**E3·1** বৈজ্ঞানিক শীল ( Scheele ) প্রথম ক্লোরিন আবিষ্কার করেন।

প্রকৃতিতে মৌল অবস্থায় ক্লোরিন পাওয়া যায় না উহা NaCl, KCl ইত্যাদি যৌগ অবস্থায় থাকে।

**প্রস্তুত প্রণালী :** ক্লোরিন প্রস্তুতের নানা পদ্ধতি আছে। পরীক্ষাগারে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের ($MnO_2$) সহিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ( HCl ) ক্রিয়ার দ্বারা ক্লোরিন তৈরী করা হয়।

$$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$$

একটি কাঁচের ফ্লাস্কে ( Fig. 3 ) $MnO_2$ ( Pyrolusite )-এর ছোট ছোট টুকরার সহিত গাঢ় HCl মিশাইতে হইবে। ফ্লাস্কের মুখে ছিপি বন্ধ থাকিবে এবং এই ছিপির মধ্যে দুইটি ফুটা দিয়া একটি দীর্ঘনাল ফানেল ( thistle funnel ) এবং এক নির্গম-নল ( delivery tube ) যাইবে। দীর্ঘনাল ফানেলের নিম্ন ভাগ অ্যাসিডে ডুবিয়া থাকিবে। এখন ফ্লাস্কটি তার জালির ( wire gauge ) উপর বসাইয়া বুন্‌সেন দীপের ( Bunsen burner ) সাহায্যে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হইবে এবং নির্গম নল দিয়া বাহির হইতে থাকিবে। গ্যাসীয় ক্লোরিনের সহিত কিছু পরিমাণে
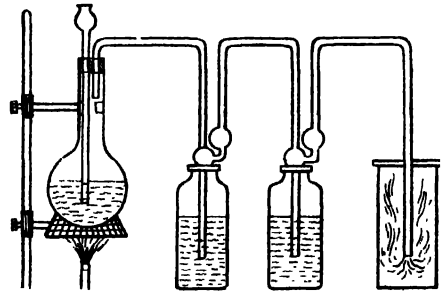
Fig. 3 ক্লোরিনের ল্যাবরেটারী প্রস্তুতি

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে। এইগুলি সরাইবার জন্য ক্লোরিন গ্যাসটিকে জল এবং গাঢ় $H_2SO_4$ পূর্ণ দুইটি গ্যাসধাবকের ( wash bottle ) ভিতর দিয়া পাঠান হয়। এখন যে পাত্রে ( জার ) গ্যাসটি রাখা হইবে উহাতে বায়ুর উর্ধ্বভ্রংশের ( upward displacement of air ) দ্বারা গ্যাসটি সঞ্চিত করা হয়।

শিল্প এবং অন্য কার্যে ব্যবহারের জন্য অধিক পরিমাণে ক্লোরিন উৎপাদনের তিনটি পদ্ধতি আছে :

(i) ওয়েলডন প্রণালী ( Weldon Process )

(ii) ডিকনের প্রণালী ( Deacon's Process )

(iii) তড়িৎ-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ( Electrolytic Process )

আধুনিক কালে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতেই ক্লোরিন উৎপাদন করা হইয়া থাকে।

## বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার :

**ভৌত ধর্ম ( Physical Properties ) :**

(i) বায়ু হইতে ক্লোরিন $2\frac{1}{2}$ গুণ ভারি, উহার গ্যাসীয় ঘনত্ব 35.5।

(ii) ইহা ফিকে সবুজ ও হলুদ বর্ণ মিশ্রিত গ্যাস

(iii) ইহা একটি বিষ এবং তীব্র শ্বাসরোধকারী গ্যাস

(iv) ইহাকে ঠাণ্ডায় এবং তাপে তরল করিতে পারা যায়

(v) ইহা লবণ জলে অত্যন্ত কম দ্রবণীয় কিন্তু জলে দ্রবণীয়

**রাসায়নিক ধর্ম ( Chemical Properties ) :**

(i) ক্লোরিন গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইয়া **ক্লোরিন জলের** ( Chlorine water ) সৃষ্টি করে, এই দ্রবের বর্ণ হলদে হয়। ইহার জীবাণুনাশক ও বিরঞ্জক ( decolourising ) গুণ আছে।

(ii) ক্লোরিন অতি সহজেই হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হয় যাহার ফলে HCl তৈরী হয়। এই কারণে বলা হয় যে হাইড্রোজেনের প্রতি ক্লোরিনের গভীর আসক্তি আছে।

(iii) ক্ষারের সহিত ক্লোরিনের নানা প্রকার ক্রিয়া হয়। $40^{0}C$ উত্তাপে শুকন কলিচুনের [Slaked lime-$Ca(OH)_2$] সহিত ক্লোরিনের ক্রিয়ার ফলে ব্লিচিং পাউডার তৈরী হয়।

**ব্যবহার**

(i) জীবাণুনাশকে (antiseptic)

(ii) কাগজ ও বস্ত্রশিল্পে কাঠ খড় ইত্যাদির বিরঞ্জক হিসাবে [ এখানে মনে রাখিতে হইবে যে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস শুষ্ক দ্রব্যকে বিরঞ্জিত করিতে পারেনা, আর্দ্রতার ( moisture ) উপস্থিতি প্রয়োজন ]।

(iii) বিষাক্ত গ্যাস—যেমন ফসজিন গ্যাস, মাস্টার্ড গ্যাস ইত্যাদি—তৈরী করিতে

(iv) পানীয় জল জীবাণুমুক্ত করিতে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়

**E3.2 ব্লিচিং পাউডার** ( **Bleaching Powder**—বিরঞ্জক চূর্ণ ) ইহার রাসায়নিক নাম হইল, ক্যালসিয়াম ক্লোরোহাইপোক্লোরাইট (Calcium Chlorohypo-chloriteca $<^{OCl}_{Cl}$ )। হাইড্রোক্লোরিক এবং এবং হাইপোক্লোরাইট এই দুইটি অ্যাসিডের যুগ্ম লবণ হিসাবে ব্লিচিং পাউডারকে ধরা হয়।

সীসার তৈরী বায়ু-বিহীন প্রকোষ্ঠে (chamber) শুষ্ক কলিচুনের [$Ca(OH)_2$] উপর দিয়া ক্লোরিন গ্যাস পাঠাইলে কলিচুন ধীরে ধীরে ক্লোরিন শোষণ করে এবং ব্লিচিং পাউডার তৈরী হয়। মাঝে মাঝে এই গুঁড়াগুলি ভালভাবে নাড়াইয়া দিতে হয়। এই $Ca(OH)_2$ খুব মিহি গুঁড়া অবস্থায় থাকা প্রয়োজন এবং ইহার আর্দ্রতা শতকরা 26 ভাগের বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রকোষ্ঠের উষ্ণতা $40^oC$-এর নিম্নে রাখা হয় কেননা অধিক উত্তাপে ব্লিচিং পাউডার বিযোজিত হইয়া যায়। ইহা সাদা গুঁড়া। ইহা জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং ইহা হইতে ক্লোরিন বাহির হইয়া আসে। এই ক্লোরিনের উপরই ব্লিচিং পাউডারের বিরঞ্জক এবং বীজাণুনাশক গুণ নির্ভর করে। বাজারের চলতি ব্লিচিং পাউডার হইতে শতকরা 35-40 ভাগ ক্লোরিন পাওয়া যায়।

**বিরঞ্জন প্রণালী** : কাপড়গুলি প্রথমে NaOH-এর পাতলা দ্রবে ফুটাইয়া জলে ভাল করিয়া ধুইতে হয়। ইহার ফলে তেল জাতীয় যা ময়লা থাকে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহার পর ব্লিচিং পাউডারের দ্রবণে এই কাপড় কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে এবং পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে ধুইতে হইবে। অ্যাসিডের সংস্পর্শে ক্লোরিন উৎপন্ন হয় এবং এই ক্লোরিনই বিরঞ্জন করিয়া থাকে। রংমুক্ত কাপড় এখন জলে, তাহার পর $Na_2CO_3$ দ্রবণ এবং সোডিয়াম সালফাইট দ্রবণে ( ক্লোরিন মুক্ত করিবার জন্য ) ডুবাইয়া শেষে আবার জলে ভাল করিয়া ধুইতে হয়। ইহার ফলে কাপড় অ্যাসিড মুক্ত হয়।

**E3·3 হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** (HCl) : হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটি ঝাঁঝাল গ্যাস ; ইহার জলীয় দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বলে।

**ভৌত ধর্ম ( physical properties ) :**

(i) ইহা বর্ণহীন, শ্বাসরোধী গ্যাস

(ii) ভিজা বাতাসে উহা ধূমায়িত হয়

(iii) জলে অতিশয় দ্রাব্য—0°C-এ, 1 সি. সি. জলে প্রায় 458 সি. সি. গ্যাস দ্রবীভূত হয়

"ফোয়ারা পরীক্ষার" সাহায্যে ইহার দ্রাব্যতা সহজেই দেখা যাইতে পারে। একটি কাঁচের ফ্লাস্ক ( flask ) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস দ্বারা ভর্তি করিতে হইবে। ইহার মুখ একটি রবার অথবা শোলার ছিপি দিয়া বন্ধ থাকিবে। ছিপিতে একটি গর্ত্তের ভিতর দয়া প্যাঁচকল লাগান একটি নল থাকিবে। এখন কাঁচেয় পাত্রে নীল লিটমাস দ্রবণে ফ্লাস্ক উল্টাইয়া নলটি ডুবাইয়া দিলে নীল লিটমাস ফোয়ারার আকারে ফ্লাস্কের মধ্যে উঠিয়া লাল হয় ( Fig. 4 )।
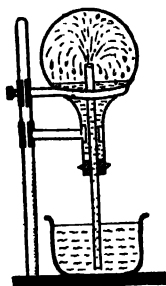
Fig. 4
ফোয়ারা পরীক্ষা

(iv) বায়ু অপেক্ষা ভারি

(v) ইহা সহজে তরল হয়, স্ফুটনাঙ্ক 44°C

**রাসায়নিক ধর্ম ( Chemical Properties ) :**

(i) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এক-ক্ষারীয় ( monobasic ) অ্যাসিড।

(ii) ইহা জলে খুব দ্রবণীয় এবং দ্রবীভূত অবস্থায় ইহার অণুগুলি তড়িত-বিযোজিত হইয়া H এবং Cl আয়ন উৎপন্ন করে।

$$HCl \rightleftharpoons H^{+} + Cl^{-}$$
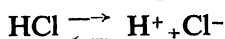
(iii) অ্যামোনিয়ার সহিত যুক্ত হইলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ঘন ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।

(iv) **ক্ষার জাতীয় বস্তুর উপর ক্রিয়া :** ইহা ক্ষার জাতীয় বস্তুর সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়া বিভিন্ন লবণ উৎপন্ন করে :

$$HCl + NH_4OH = NH_4Cl + H_2O$$

$$HCl + Ba(OH)_2 = BaCl_2 + 2H_2O$$
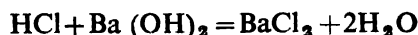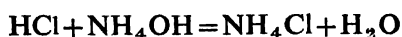
(v) **ধাতুর উপর ক্রিয়া :** ইহা লোহা, সোডিয়াম, দস্তা প্রভৃতি ধাতুকে দ্রবীভূত করে এবং হাইড্রোজেন ও ধাতব, নিম্ন ( আস্ )—ক্লোরাইড সৃষ্টি করে

$$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$$

$$Fe + 2HCl = FeCl_2 + H_2$$
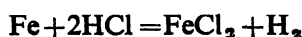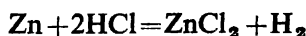
(vi) ইহা নিজেও অদাহ্য এবং দহনে সাহায্য করে না। **লক্ষ্যণীয়ঃ** তরল বা গ্যাসীয় HCl যদি শুষ্ক হয় ( আর্দ্রতাহীন ) তাহা হইলে উহা নীল লিটমাসকে লাল করে না।

**ব্যবহারঃ** রঞ্জন শিল্পে, লোহার উপর জস্ক অথবা টিনের আস্তরণ দেবার সময়, ক্লোরিন তৈরী করার কাজে HCl ব্যবহৃত হয়। ঔষধ হিসাবে ইহার প্রয়োগ এবং ল্যাবরেটারীতে বিকারক ( re-agent ) হিসাবে ইহার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন প্রকার ধাতব ক্লোরাইড প্রস্তুত করার জন্যও উহার প্রয়োজন হয়।

## সালফার

## ( Sulphur )

| সঙ্কেত | পারমাণবিক গুরুত্ব | পরমাণু-ক্রমাঙ্ক |
|---|---|---|
| S | 32·06 | 16 |

**E4·1 সালফার** বা গন্ধক প্রকৃতিতে মৌলাবস্থাতেই পাওয়া যায়। ইহা অধাতু ( non-metal ) এবং তাপ অথবা বিদ্যুৎ-পরিবাহী নয়। আমেরিকা পৃথিবীর প্রয়োজনীয় সালফারের প্রায় $\frac{4}{5}$ অংশ সরবরাহ করে, যুক্তরাজ্যে পৃথিবীর সবার চেয়ে বড় সালফারের কারখানা। আমেরিকা ছাড়া সিসিলি ( Sicily ) এবং জাপানে প্রচুর সালফার পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মৌল অবস্থায় সালফার পাওয়া যায়না, খনিজ যৌগরূপে পাওয়া যায়। বেলুচিস্থানে কিছু পরিমাণে সালফার পাওয়া যায়।

### ব্যবহার

(i) সালফারের প্রধান প্রয়োজন হইল সালফিউরিক অ্যাসিড ($H_2SO_4$) প্রস্তুত করিতে। ইহা ছাড়া বিশুদ্ধ সালফার

(ii) ঔষধে প্রয়োজন হয়

(iii) রবার শিল্পে লাগে

(iv) সালফার যৌগ, যেমন কার্বন ডাই সালফাইড ($Cs_2$), সোডিয়াম থায়ো-সালফেট ( $NaHSO_4$ ), ফসফরাস সালফাইড প্রস্তুত করিতে দরকার হয়

(v) জীবাণুনাশক এবং কীটনাশক হিসাবে ও সালফারের ব্যবহার খুব বেশী

**E4·2 সালফার ডাইঅক্সাইড ( Sulphur Dioxide—$SO_2$ )** সালফারের পাঁচটি অক্সাইডের মধ্যে ডাই অক্সাইড এবং ট্রাই অক্সাইড সব চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। আগ্নেয়গিরি হইতে যে সব গ্যাস বাহির হয় তাহার মধ্যে $SO_2$ থাকে। এই গ্যাস খুব ভারি।

### প্রস্তুত প্রণালী : ল্যাবরেটারী পদ্ধতি

একটি কাঁচের ফ্লাস্কে কিছু তামার ছোট ছোট টুকরা ( copper turnings ) লইতে হইবে। ফ্লাস্কের মুখে দুইটি ফুটা করা ছিপি থাকিবে যাহার ভিতর দিয়া দীর্ঘনাল ফানেল যাইবে এবং নির্গমন নল বাহির হইবে। ফ্লাস্কটি ত্রিপদী অথবা রিটর্ট স্ট্যাণ্ডের ( retort stand ) উপর তার জালি দিয়া বসাইতে হইবে। ফ্লাস্কের গলদেশ ক্ল্যাম্পের সহিত আটকান থাকিবে। এখন দীর্ঘনাল ফানেলের ভিতর দিয়া ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড ( $H_2SO_4$ ) ঢালিতে হইবে যাহাতে দীর্ঘনাল ফানেলের নীচের অংশ অ্যাসিডে ডুবিয়া যায় (Fig. 5)। এইবারে বুনসেন দীপ জ্বালিয়া ফ্লাস্কটি গরম করিলে নির্গম নল দিয়া $SO_2$ বাহির হইবে। এখন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বোতলের ভিতর দিয়া গ্যাসটি পাঠাইলে অ্যাসিডে ধৌত হইয়া বায়ুর উর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সঞ্চয় করা হয়।
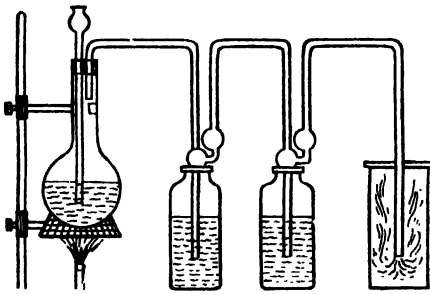
Fig. 5 সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতি

**পণ্য উৎপাদন ( manufacture ) :** হাওয়ায় সালফার পোড়াইলে $SO_2$ -এর সৃষ্টি হয়।

$$S+O_2=SO_2$$
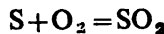
ইহা ছাড়া কপার পাইরাইটস ( $Cu_2S$, $Fe_2S_3$ ), আয়রণ পাইরাইটস ( $FeS_2$ ) বায়ুতে পোড়াইলে ( roast ), $SO_2$ পাওয়া যায়।

### ব্যবহার

(i) সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে

(ii) সাধারণ বিরঞ্জক এবং জীবাণু নাশক হিসাবে

(iii) ক্লোরিন অপসারণে ( antichlor )

(iv) কেরোসিন তৈল ও চিনি শোধনে এবং চিনি বিরঞ্জনে

(v) তরল অবস্থায় $SO_2$ রেফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডার জন্য ব্যবহৃত হয়।

## E4·3 সালফিউরিক অ্যাসিড ( Sulphuric Acid—$H_2SO_4$ ) :

সালফিউরিক অ্যাসিডের বহুল ব্যবহারের জন্য ইহাকে **রসায়নের রাজা** বলা হয়। ইহা অ্যাসিডরূপে প্রকৃতিতে সাধারণতঃ দেখা যায়না, ইহার ধাতব লবণ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

$SO_2$-কে বায়ুর অক্সিজেন দিয়া $SO_3$ করিয়া তাহার সহিত জলের ক্রিয়া ঘটাইলে সালফিউরিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়।

$$SO_3 + H_2O = H_2SO_4 \text{ ।}$$
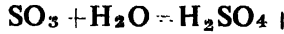
পণ্য উৎপাদনের জন্য দুইটি প্রণালী আছে

(i) প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি ( Chamber process )

(ii) স্পর্শ পদ্ধতি (Contact process )

### ভৌত ধর্ম (Physical properties ) :

আমরা যে সাধারণ গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড পাই তাহাতেও দুই ভাগ জল থাকে। বিশুদ্ধ অ্যাসিডের জন্য এই দুই ভাগ জলওলা অ্যাসিডে $SO_3$ পাঠাইতে হইবে এবং ঠাণ্ডায় জমাইতে হইবে। তাহা হইলে বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড কেলাসিত হয়। বিশুদ্ধ অ্যাসিড বর্ণহীন এবং গন্ধহীন, তৈলের মত তরল। ইহা জলের চেয়ে প্রায় দুইগুণ ভারি। ইহার গলনাঙ্ক $10 \cdot 5°C$ আর স্ফুটনাঙ্ক $338°C$।

### রাসায়নিক ধর্ম ( Chemical Properties ) :

(i) ইহা জলে অত্যন্ত দ্রাব্য এবং যে কোন অনুপাতে মিশিতে পারে। মিশিবার সময় তাপের সৃষ্টি হয় এবং আয়তনে কমিয়া যায়। গাঢ় $H_2SO_4$-এ অল্পজল দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা বাষ্পে পরিণত হয় এবং হঠাৎ আয়তন বৃদ্ধির ফলে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই কারণে গাঢ় অ্যাসিডকে পাতলা করিতে হইলে জলে অল্প অল্প করিয়া অ্যাসিড দিয়া নাড়া প্রয়োজন।

(ii) জলের প্রতি ইহার আসক্তি আছে বলিয়া ইহা গ্যাস এবং অন্যান্য দ্রব্য শুষ্ক করিতে ব্যবহার করা হয়। কম উষ্ণতায় উহা জলের সহিত বিভিন্ন সোদক

স্ফটিকের সৃষ্টি করে—$H_2SO_4$, $H_2O$ ; $H_2SO_4$, $2H_2O$ ; $H_2SO4$, $4H_2O$।

(iii) ইহা একটি তীব্র দ্বিক্ষারী অ্যাসিড এবং ইহার জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে করে। ক্ষারকের সহিত ইহা দুই প্রকার লবণ ও জল উৎপন্ন করে।

$$H_2SO_4 + NaOH = NaHSO_4 + H_2O$$

$$H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$$
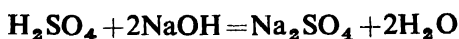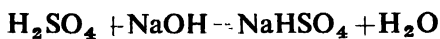
(iv) জল শোষণ করে বলিয়া চিনি, স্টার্চ প্রভৃতি, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে কার্বন হইয়া যায়। জৈব পদার্থের অণু হইতে ইহা জল শোষণ করিয়া লয়।

(v) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন বিজারক। বহু অধাতব মৌল—কার্বন, সালফার প্রভৃতি এবং বহু ধাতব মৌল—কপার, সিলভার ইত্যাদি গাঢ় $H_2SO_4$ দিয়া ফুটাইলে জারিত হয়। শুধু সোনা ও প্ল্যাটিনাম (noble metals) $H_2SO_4$ দ্বারা জারিত হয়না।

(vi) পাতলা $H_2SO_4$ কয়েকটি ধাতুর সহিত ক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন ও লবণ গঠন করে। গাঢ় $H_2SO_4$ দ্বারা এই ক্রিয়া হয়না।

$$Zn + H_2SO_4 \text{ ( পাতলা )} = ZnSO_4 + H_2$$
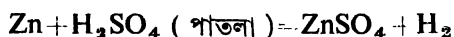
**ব্যবহার :** বহুরকম রাসায়নিক শিল্পে $H_2SO_4$ ব্যবহৃত হয়।

(i) হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনে

(ii) সুপার ফসফেট এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট,সোডিয়াম কার্বনেট, রং ফটকিরি বিস্ফোরক ইত্যাদি তৈরীতে।

(iii) পেট্রোলিয়াম শোধনে, বিরঞ্জনে।

(iv) গ্যাস বিশুদ্ধ করা এবং গ্লুকোজ উৎপাদনে।

## ফসফরাস

## (Phosphorous)

| আণবিক সূত্র | পারমাণবিক গুরুত্ব | পরমাণু ক্রমাঙ্ক |
|---|---|---|
| $P_4$ | 31 | 15 |

**E5·1 আগুন ও দিয়াশলাই :** যখন দিয়াশলাই ছিলনা তখন কি আগুনও ছিল না? দিয়াশলাই ত মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমকার দিকের

আবিষ্কার। আর আগুন আছে বেদে-পুরাণে, রামায়ণ মহাভারতে। আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক তখনকার কালে কি করিয়া আগুন জ্বালান হইত।

দুইটি জিনিসকে যদি ঘষা যায় তাহা হইলে তাহাদের অণুর গতিবৃদ্ধির ফলে তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ সহজ-দাহ্য বস্তু পাইলে তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিবে। প্রাচীন দিনের মানুষ শুকন নরম কাঠ এবং শক্ত কাঠে ঘষিয়া আগুন জ্বালাইত। বনের শুকন গাছপালাতে অনেক সময় প্রবল হাওয়ায় ডালে ডালে ঘর্ষণের ফলে আগুন লাগিয়া যায়। এই আগুনকে **দাবানল** বলে।

কিছু ঘষিয়া আগুন জ্বালাইবার এই কৌশলকে অনুসরণ করিয়াই পরবর্তীকালে লোহার সহিত লোহার আকরিক ঘষিয়া বা পাথরের উপর ইস্পাত ঘষিয়া আগুনের সৃষ্টি করা হইত। ইহাকেই আমরা চকমকি পাথর বলিয়া থাকি।

মৌল হিসাবে ফসফরাস দিয়াশলাই শিল্পেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। ফসফরাস দুই প্রকার হয় শ্বেত এবং লোহিত। ইহার মধ্যে শ্বেত ফসফরাসের বিষক্রিয়া আছে, কিন্তু লোহিত ফসফরাসের তাহা নাই। এই জন্য গোড়ার দিকে দিয়াশলাই তৈরীর জন্য শ্বেত ফসফরাস ব্যবহৃত হইলেও বর্তমানে এখন উহা আইনবিরুদ্ধ। এখন লোহিত ফসফরাস ব্যবহার করা হয়।

আজকাল দুইপ্রকার দিয়াশলাই প্রস্তুত হয়ঃ

(i) লুসিফার জাতীয় ঘর্ষণ দিয়াশলাই ( Lucifer Matches )—ইহাতে সরু কাঠির মাথায় ফসফরাস সালফাইড ( $P_4S_3$ ) ও লেড্ ডাই-অক্সাইড ( $P_bO_2$ ) কাঁচের গুঁড়া ও আঠার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই আঠা ফসফরাসকে জারণ হইতে রক্ষা করে। যে কোন কঠিন জায়গায় ঘষিয়া এই দিয়াশলাই কাঠি জ্বালান যায়। আমাদের দেশে এই দিয়াশলাইয়ের বিশেষ চল নাই।

(ii) **নিরাপদ দিয়াশলাই বা 'সেফটি ম্যাচ'ঃ** এই ক্ষেত্রে সরু কাঠির মাথা অ্যান্টিমনি ট্রাই-সালফাইড ($Sb_2S_3$), পটাসিয়াম ক্লোরেট, পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট, রেড্ লেড্ এবং আঠায় ডুবাইয়া শুকান হয়। বিশেষ ধরণের প্রস্তুত এক প্রকার খসখসে কাগজে এই কাঠি ঘষিলে তবে আগুন জ্বলিবে। এই কাগজ দিয়াশলাইয়ের বাক্সের দুই পাশে লাগান থাকে। ইহাতে লোহিত ফসফরাস কাঁচের গুঁড়া বা বালি আঠার সাহায্যে মাথাইয়া শুকান হয়।

**E5·2 ক্যালসিয়াম ফসফেট** [ calcium phosphate—$Ca_3(PO_4)_2$ ]

প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে ফসফরাস থাকে। আমরা ফলমূল শাকসবজি এবং ডিম মাছ মাংস হইতে ফসফরাস আমাদের শরীরে গ্রহণ করি। সকল উর্বরা জমিতেই

ক্যালসিয়াম ফসফেট [ $Ca_3(PO_4)_2$ ] থাকে। ইহা জলে দ্রবণীয়। সাধারণতঃ উদ্ভিদ তাহার মূল দিয়া জমির ফসফেট শোষণ করে এবং প্রাণী এই সকল উদ্ভিদ খাইলে উহাদের দেহে ফসফেট প্রবেশ করে। শস্য উৎপাদনী জমির উর্বরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইলে কৃত্রিম ফসফেট সার দেওয়া হয়—এই সারেতে ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে। হাড়েতেও প্রায় 60% $Ca_3(PO_4)_2$ থাকে। পণ্য ফসফরাস হাড় ও ফসফেটিক প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হয়।

## নাইট্রোজেন
## ( Nitrogen )

| আণবিক সূত্র | পারমাণবিক গুরুত্ব | পরমাণু ক্রমাঙ্ক |
|---|---|---|
| $N_2$ | 14·00 | 7 |

**E6·1 বায়ু ও নাইট্রোজেন :** আমরা যে একটি বায়ু সমুদ্রের মাঝে বাস করিতেছি তাহা আমাদের সকল সময় মনে থাকে না। দুই আঙ্গুলে নাকটি বন্ধ করিলে বুঝা যায় বায়ু জীবনের পক্ষে কত অপরিহার্য। বায়ু মৌলিক পদার্থ নয়—ইহা কয়েকটি গ্যাসের মিশ্রণ। বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদানের মধ্যে আয়তনিক পরিমাণ ( volumetric ) শতকরা 78·11 ভাগ হইল নাইট্রোজেন, 20·96 ভাগ হইল অক্সিজেন এবং ·93 ভাগ অন্যান্য নিষ্ক্রিয় ( inert ) গ্যাস।

লর্ড রাদারফোর্ড 1772 খৃষ্টাব্দে নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন। বাতাসে নাইট্রোজেন মৌল অবস্থায় বর্তমান, আবার প্রকৃতিতে যৌগ রূপেও নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের বিভিন্ন প্রোটিনগুলি সমস্তই নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ। বায়ুর অক্সিজেন দহনকার্যে সহায়তা করে; নাইট্রোজেন মিশ্রিত থাকায় এই দহনকার্যের তীব্রতা অনেক হ্রাস পায়। নাইট্রোজেন বর্ণ ও গন্ধহীন এবং জলে ইহা প্রায় অদ্রাব্য।

**E6 2 অ্যামোনিয়া** (Ammonia—$NH_3$) : অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের একটি যৌগ। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ যখন ধ্বংস হয় তখন পচনের ফলে জমিতে অ্যামোনিয়া ও অ্যামোনিয়ার লবণ পাওয়া যায়। বায়ুতেও অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া বর্তমান থাকে। প্রায় যে কোন অ্যামোনিয়ার লবণ এবং যে কোন ক্ষার, মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দিলে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। ল্যাবরেটারীতে সাধারণতঃ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ( $NH_4Cl$ ) এবং কলিচুন [$Ca(OH)_2$ ]

মিশাইয়া উত্তপ্ত করা হয়। ইহার ফলে অ্যামোনিয়া বাহির হয়। ইহা বর্ণহীন কিন্তু ইহার গন্ধ খুব ঝাঁঝাল।

**অ্যামোনিয়ার উৎপাদন** ( Manufature of Ammonia ) : **হেবার পদ্ধতি** ( Haber's Process ) : রাসায়নিক হেবার এই প্রণালীতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করেন। ইহাতে নির্দিষ্ট চাপ এবং উষ্ণতায় নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনকে অনুঘটকের ( Catalyst ) সাহায্যে যুক্ত করাইয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করা হয়।

$$N_2 + 3H_2 = 2NH_3 + 24000 \text{ Cal}$$

হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের অনুপাত 1 : 3 ভাবে মিশ্রিত করিয়া 200 অ্যাটম্‌সফিয়ার চাপে গরম লোহাচুর অনুঘটকের ( Catalyst ) উপর দিয়া পাঠাইলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

**প্রণালী :** বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন 1·3 অনুপাতে লইয়া কমপ্রেশন পাম্প ( Compression Pump )-এর ( Fig. 6 ) সাহায্যে 200 অ্যাটম্‌সফিয়ার চাপ দেওয়া হয়। এখন একটি প্রকোষ্ঠে মিহি লোহাচুর লইয়া 560°—700°C তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে এবং তাহার ভিতর দিয়া চাপ-যুক্ত নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনকে পাঠাইতে হইবে। এখন N এবং H সংযুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তাহার সহিত অপরিবর্তিত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনও কিছু পরিমাণ থাকে। এখন চাপ এবং ঠাণ্ডা দুই-এর সহযোগে অ্যামোনিয়াকে তরল করিয়া লওয়া হয় কিন্তু অন্য গ্যাস দুইটির কিছু হয় না। এইবার তরল অ্যামোনিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সহিত পুনরায় আরও বেশী পরিমাণ গ্যাস দিয়া ফের চাপের সাহায্যে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়।
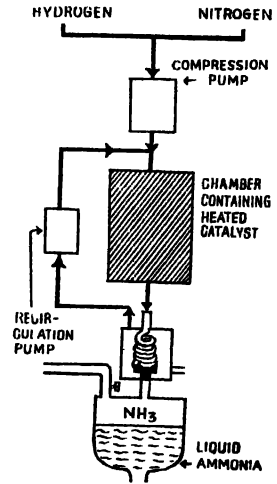
Fig. 6 হেবার প্রণালীতে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন

**ভৌত ধর্ম :** (i) অ্যামোনিয়া সহজেই তরল হয়

(ii) অ্যামোনিয়া বর্ণহীন কিন্তু গন্ধহীন নয়। স্মেলিং সল্ট অথবা জলমিশ্রিত অ্যামোনিয়া শুঁকিলে ইহার তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধ বোঝা যায়

(iii) ইহা বাতাসের চেয়ে অনেক হাল্কা, ইহার ঘনত্ব 8·5 ।

**রাসায়নিক ধর্ম :** (i) অ্যামোনিয়া বাতাসে দাহ্য নয় বা দহনে সাহায্যও করে না কিন্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ইহা হলুদ বর্ণের শিখায় জ্বলিতে থাকে।

(ii) জল এবং অ্যামোনিয়ার মিশ্রণে $NH_4(OH)$ গঠিত হয়। ইহা লাল লিটমাসকে নীল করে।

( iii ) অ্যামোনিয়া একটি ক্ষার এবং অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে লবণ উৎপন্ন করে।

$$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$$
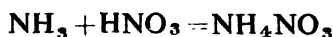
**ব্যবহার :**

(i) ল্যাবরেটরীতে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ক্ষারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়

(ii) ঠাণ্ডা করার ( refrigeration ) কাজে—বরফ তৈরী, জল ঠাণ্ডা করা ইত্যাদিতে অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়।

(iii) সলভে প্রণালীতে সোডা তৈরীর সময় অ্যামোনিয়া লাগে।

(iv) জমিতে সার হিসাবে $(NH_4)_2SO_4$, $NH_4NO_3$ প্রভৃতি অ্যামোনিয়াম লবণ ব্যবহৃত হয়।

(v) অ্যামোনিয়া জারিত করিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়।

## E6·3 অ্যামোনিয়াম লবণ :

**অ্যামোনিয়াম সালফেট** ( Ammonium Sulphate—$(NH_4)_2SO_4$ )

(i) কাঁচা কয়লাতে ওজনের শতকরা প্রায় এক ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। বায়ুহীন, বন্ধ লোহার পাত্রে কাঁচা কয়লা রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে নানারকম গ্যাসের সহিত কোল গ্যাস নির্গত হয় এবং অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। এই অ্যামোনিয়াকে 60% সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেটের দানা (crystals) পাওয়া যায়।

(ii) অ্যামোনিয়াম সালফেট হেবার পদ্ধতিতে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া হইতে কেলাসন করিয়া পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম সালফেট ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বারা অ্যামোনিয়াকে শোষিত করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। কেলা-সন দ্বারা ইহাকে শোধন করা হয়।

$$2NH_3 + CO_2 + H_2O + CaSO_4 = (NH_4)_2SO_4 + CaCO_3$$

**ব্যবহার :** সস্তা এবং ভাল সার হিসাবে অ্যামোনিয়াম সালফেটের প্রচুর চাহিদা।

**অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট** ( Ammonium Nitrate—$NH_4NO_3$) :

(ii) অ্যামোনিয়াম ও হাল্কা নাইট্রিক অ্যাসিড সংযোগে অথবা অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম নাইট্রেট হইতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রস্তুত করা হয়।

(i) $NH_3+HNO_3=NH_4NO_3$

(ii) $(NH_4)_2SO_4+2NaNO_3=Na_2SO_4+2NH_4NO_3$
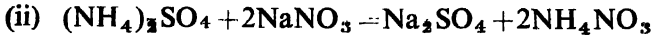
**ব্যবহার :** আমাদের দেশের পক্ষে অ্যামোনিয়াম সালফেটের চেয়ে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আরও উপযুক্ত সার কারণ এ দেশে সালফারের অভাব আছে। অ্যামোন্যাল (Ammonal) এবং অ্যামাটল (Amatol) নামে কয়েকটি বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের প্রয়োজন হয় ; হিম মিশ্র (freezing mixture) প্রস্তুত করিতেও ব্যবহৃত হয়।

**অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড** (Ammonium Chloride—$NH_4Cl$ )

(iii) কোল গ্যাস লিকার ( Liquor ) হইতে পাওয়া অ্যামোনিয়ার সহিত HCl-এর ক্রিয়ার ফলে অথবা অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড একত্র ফুটাইলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়।

$NH_3+HCl=NH_4Cl,$

$(NH_4)_2SO_4+2NaCl=2NH_4Cl+Na_2SO_4$
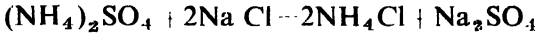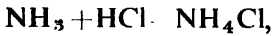
**ব্যবহার :** ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষায়, রঞ্জনশিল্পে এবং কয়েক প্রকার বৈদ্যুতিক সেল ( cell ) ও ব্যাটারীতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

**অ্যামোনিয়াম কার্বনেট** [Ammonium Carbonate—$(NH_4)CO$] :

অ্যামোনিয়াম সালফেট ও খড়ি মাটিকে একত্র উত্তপ্ত করিতে হইবে। যে বাষ্প বাহির হইবে তাহা সীসার গ্রাহকে ঘনীভূত করিলে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট পাওয়া যায়।

**ব্যবহার :** রুটি তৈরীর গুঁড়ায় ( baking powder ), রঞ্জন শিল্পে, স্মেলিং সল্ট প্রস্তুত করিতে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট ব্যবহৃত হয়।

**E6·4 নাইট্রিক অ্যাসিড** ( Nitric Acid—$HNO_3$ ) : নাইট্রিক অ্যাসিডকে পূর্বের অ্যালকেমী যুগের বৈজ্ঞানিকরা বলিতেন অ্যাকোয়া ফর্টিস ( Aqua fortis ) 'শক্তিশালী জল'। ইহার ব্যবহার বহুদিন হইতে প্রচলিত এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয়। বায়ুমণ্ডলে স্বল্পপরিমাণ নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। আকাশের বিদ্যুৎ বায়ুর অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের সংযোগ ঘটায় এবং ইহার ফলে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড ও পরে

নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড তৈরী হয়। এই নাইট্রোজেন পার অক্সাইডের সহিত জল মিশ্রিত হইয়া নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

$$N_2 + O_2 \rightarrow NO \xrightarrow{O} NO_2 \xrightarrow{H_2O} HNO_3 \xrightarrow[\text{ক্ষার}]{\text{জমির}} \text{নাইট্রেট}$$
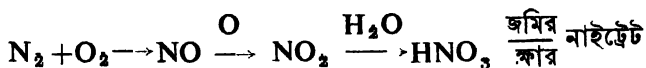
**প্রস্তুত প্রণালী :** ল্যাবরেটরী পদ্ধতি : পটাসিয়াম নাইট্রেট অথবা সোডিয়াম নাইট্রেটের উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

$$KNO_3 + H_2SO_4 = KHSO_4 + HNO_3$$
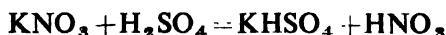
একটি কাঁচের ছিপি দেওয়া বকযন্ত্রে ( retort ) সমপরিমাণ ওজনের $KNO_3$ এবং গাঢ় $H_2SO_4$ লইতে হইবে ( Fig. 7 )। লোহার স্ট্যাণ্ডের উপর বকযন্ত্রটি বসাইয়া বুন্‌সেন দীপ জ্বালাইয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে। বকযন্ত্রের লম্বা মুখটি একটি গোল ফ্লাস্কের ভিতর ঢুকাইয়া রাখিতে হইবে। এই ফ্লাস্কটিকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে এবং উপরেও ভিজা ফিলটার কাগজ চাপা দিতে হইবে। 200°C পর্যন্ত তাপ উঠিলে নাইট্রিক অ্যাসিড উদ্বায়ী বলিয়া গ্যাসের আকারে বাহির হইয়া আসে এবং পাতিত ( distilled ) হইয়া ফ্লাস্কে জমে। এই অ্যাসিডকে আবার গাঢ় $H_2SO_4$ মিশাইয়া পাতিত করিলে 98% $HNO_3$ পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড পাইতে হইলে 98% $HNO_3$-র মধ্য দিয়া 60°—80°C উষ্ণতায় হাওয়ার বুদ্‌বুদ্‌ পাঠাইতে হইবে।
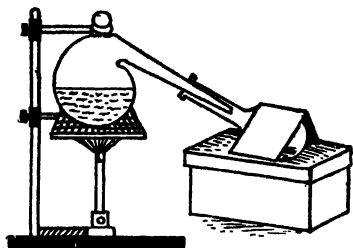
Fig. 7 ল্যাবরেটারী পদ্ধতিতে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতি

**ভৌত ধর্ম :** $HNO_3$ একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ, ইহার ঘনত্ব 1·52। বাতাসে ইহা ধূমায়িত হইতে থাকে এবং সহজেই জল আকর্ষণ করে। ইহা জলে খুব দ্রাব্য ; ইহার গন্ধ তীব্র ও শ্বাসরোধকারী।

**রাসায়নিক ধর্ম :** নাইট্রিক অ্যাসিড তীব্র জারক। ইহা পটাসিয়াম আয়োডাইড, HCl, করাতের গুঁড়া, ফসফরাস ইত্যাদির সহিত ক্রিয়া করে। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড এবং গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণে ( ইহাকে বলে 'অ্যাকোয়া রিজিয়া'—Aqua Regia বা 'জলের রাজা' ) সোনা ও প্লাটিনাম

দ্রবীভূত হয়, ( অন্য কোন অ্যাসিডের দ্বারা ইহা সম্ভব হয় না )। বিস্ফোরক দ্রব্য ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন ( Tri-Nitro-Toluine—TNT ) তৈরী করিতে নাইট্রিক অ্যাসিড লাগে। অ্যালফ্রেড নোবেল ( Alfred Nobel ) $HNO_3$ ও গ্লিসারিন মিশাইয়া নাইট্রোগ্লিসারিন এবং তাহা হইতে ডিনামাইট তৈরী করেন।

**E6·5 নাইট্রোজেন চক্র ( Nitrogen Cycle ) :** প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ দেহের গঠন ও ক্ষয় পূরণের জন্য প্রোটিন ( protein ) একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রোটিন হইল নাইট্রোজেন-যৌগ। আমরা দেখিয়াছি বাতাসে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন মৌল অবস্থায় আছে। এখন মানুষ বা অন্য জীবজন্তু অক্সিজেনকে সরাসরি গ্রহণ করিয়া কাজে লাগাইতে পারিলেও নাইট্রোজেনকে সরাসরি কাজে লাগান বা জীবদেহে উহার রাসায়নিক মিলন ঘটান সম্ভব হয় না।

(i) বিদ্যুৎ এবং জলের সংযোগে বায়ুমণ্ডলে যে নাইট্রিক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয় তাহা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া মাটিতে পড়ে এবং বিভিন্ন নাইট্রেট লবণের সৃষ্টি করে। উদ্ভিদ্ এই নাইট্রেট শিকড় দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। এইরূপে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ছয় লক্ষ মণ নাইট্রোজেন বায়ু হইতে অপসারিত হয়।

(ii) আবার কতকগুলি মটর জাতীয় ( Leguminous ) উদ্ভিদ এক প্রকার জীবাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন টানিয়া লয়। ইহারা বায়ুর নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে পরিণত করে। এই জীবাণুগুলি এই সকল গাছের শিকড়ে থাকে। ইহাদের অ্যাজোটোব্যাক্‌টার ( Azotobacter ) বলে। উদ্ভিদ্ এই দুইটি উপায়ে উহার প্রোটিন সংগ্রহ করে। জন্তুরা উদ্ভিদ্ হইতে এবং মাংসাশী জন্তুরা অপর জন্তুর মাংস, ডিম, দুধ হইতে প্রোটিন সংগ্রহ করে। মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উদ্ভিদ্ ডিম, দুধ, মাংস ইত্যাদি হইতে গ্রহণ করে।

Fig. 8 নাইট্রোজেন চক্র

এদিকে প্রকৃতিতে সদা-সর্বদা কতকগুলি বিপরীত ক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন মৌলের সৃষ্টি হইতেছে এবং বায়ুমণ্ডলের যে ছয় লক্ষ মণ নাইট্রোজেন প্রতিদিন অপসারিত

হইতেছে—তাহা আবার পূরণ হইয়া নাইট্রোজেনের অনুপাত সমান থাকিতেছে। বিপরীত ক্রিয়াগুলি এইরূপ :

মৃত প্রাণীর দেহ এবং প্রাণীর মলমূত্র যখন পচিয়া যায় তখন নাইট্রোজেন যৌগ-মুক্ত নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়। এখন অন্য নানা প্রকার জীবাণু (নাইট্রোসোমোনাস—Nitrosomonas, নাইট্রোব্যাক্টার—Nitrobacter) দ্বারা অ্যামোনিয়া নাইট্রাস অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। ইহার ফলে বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ এক থাকে। ইহাকেই নাইট্রোজেন চক্র বলে (Fig. 8)।

## চুন ও চুনজাত দ্রব্য

## ( Lime and its products )

**E7·1 চক** ( Chalk ) চক হইল আমাদের অতি পরিচিত খড়ি। সমুদ্রের একপ্রকার প্রাণী মরিয়া গেলে তাহাদের খোলা, সমুদ্রের নীচে জমা হয়। বহু বৎসর ধরিয়া জমিতে জমিতে উহা চক-পাথরে পরিণত হয়। ইহাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে। ভূপৃষ্ঠের আলোড়ন হইলে সমুদ্রতল অনেক সময় পাহাড়ের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তখনই আমরা চক পাহাড় ( chalk hills ) পাই। দাঁতের মাজন, পাউডার, লিখিবার খড়ি, রঙিন খড়ি ( crayon )—সকলই চক হইতে প্রস্তুত হয়।

**চুন** (Calcium Oxide—CaO) : এই চুন বা 'কড়াচুন'কে ইংরাজিতে বলে quick lime। চুনা পাথরকে ( Calcium Carbonate—$CaCO_3$ ) তাপ দিয়া ( 1000°C ) বিয়োজিত করিলে চুন প্রস্তুত হয়।

$$CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$$
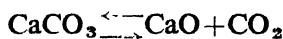
এই বিক্রিয়াটি উভমুখী বলিয়া $CO_2$ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন, তবেই সমস্ত চুনাপাথরকে চুনে পরিণত করা যাইবে। চুনা পাথর ছাড়াও শামুক, গুগলি, খড়িমাটি প্রভৃতিকে উত্তপ্ত করিলে কড়াচুন পাওয়া যায়। চুনাপাথর পুড়াইবার জায়গাকে বলে চুনের ভাটি ( Lime Kiln )। এগুলি ইটের তৈয়ারী হয় ( Fig. 9 ) এবং দেখিতে অনেকটা উঁচু গম্বুজের মত হয় তলা দিয়া বায়ুপ্রবেশের পথ আছে এবং উপর দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইবার রাস্তা আছে।

ভাটির নীচের দিকে একপাশে রাখা উনানে 'কোক' কয়লা জ্বালাইয়া তাপ প্রয়োগ করা হয়। 1000°C তাপে চুনাপাথর বিশ্লিষ্ট হইয়া চুনে পরিণত হয়। এই চুনকে নীচে হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং উপর হইতে চুনাপাথর পুনরায় ফেলা হয়। এই পদ্ধতিকে **অবিরাম পদ্ধতি** বলে।
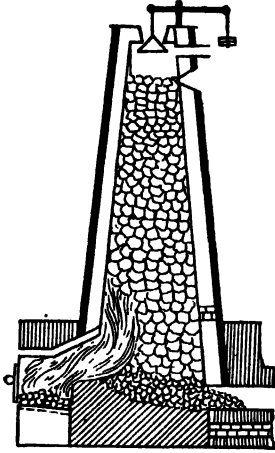
Fig. 9 চুনের ভাটি ; অবিরাম পদ্ধতি

ইহা ছাড়া আর একটি পদ্ধতি আছে, তাহাকে বলে **সবিরাম পদ্ধতি।** এই পদ্ধতিতে একবার চুনাপাথর ভরিয়া চুন প্রস্তুত হইলে ভাটি শীতল হইবার পর চুন বাহির করা হয় এবং আবার চুনাপাথর ঢালিয়া ভাটি জ্বালান হয়।

**ভৌত ধর্ম :** চুন দেখিতে সাদা এবং কঠিন হয়। অক্সি-হাইড্রোজেন শিখায় বা উচ্চ তাপ প্রয়োগ করিলে চুন উজ্জ্বল আলো দেয়। 2750°C তাপে উহা গলিয়া যায়।

**রাসায়নিক ধর্ম :** জলের প্রতি চুনের আসক্তি আছে—উহা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল শোষণ করে। অল্পজলে চুন দিলে চুন ফুলিয়া ওঠে এবং প্রচুর উত্তাপ বাহির হয়। এই উত্তাপে জল বাষ্প হইতে থাকে বলিয়া শোঁ শোঁ শব্দ হয়। এখন জলের পরিমাণ বাড়াইলে শেষ পর্যন্ত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ( $Ca(OH)_2$ ) তৈরী হয়। ইহাকে **কলিচুন** বা slaked lime বলে।

**চুন জাত দ্রব্য ও ব্যবহার :** চুন বহু কাজে ব্যবহার করা হয়। আর্দ্র বস্তুর জল শোষণ করিতে, lime light, কলিচুন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্তুত করিতে, জীবাণুনাশক হিসাবে, চুন ব্যবহৃত হয়। বালি, শুরকির বাঁধুনি হিসাবে চুনের প্রয়োজন হয় ; ব্লিচিং পাউডার, কস্টিক সোডা, অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিতে এবং কৃষিকার্যে চুনের প্রয়োজন আছে। **সোডা লাইম** রাসায়নিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। কস্টিক সোডার গাঢ় দ্রবণের সহিত চুনের মিশ্রণকে শুষ্ক করিলে ইহা পাওয়া যায়। অল্প পরিমাণ কলিচুন যদি প্রচুর জলে ভিজাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তলায় চুনটি থিতাইয়া থাকে এবং উপরের পরিষ্কার দ্রবকে বলা হয় **চুনের জল।** এই চুনের জল কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং $CaCO_3$ তৈরী হয়।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে অদ্রাব্য বলিয়া চুনের জলে $CO_2$ পাঠাইলে উহা ঘোলা হইয়া যায়।

যদি অল্প জলে খুব বেশী কলিচুন দেওয়া হয় উহা দেখিতে ঠিক সাদা দুধের মত হইবে। ইহাকে **চুন-গোলা** ( Milk of Lime ) বলে চুন এখানে জলে প্রলম্বিত ( suspended ) রূপে থাকে।

E7 ·2 **মর্টার** ( Mortar ) : ইঁট বা পাথরের গাঁথুনি করিবার সময় শুরকি বা বালি আর চুন ( 1 : 3 বা 1 : 4 ) একসঙ্গে মিশাইয়া অল্প জলে মাখিয়া ইঁটের মাঝে মাঝে লাগান হয়। ইহাকে **চুনা মর্টার** ( lime mortar ) বলে। জল যখন শুকাইয়া আসে, তখন ইহা জমাট বাঁধে এবং দুই পাশের ইঁট বা পাথরের টুকরাকে শক্ত করিয়া আটকাইয়া রাখে। জল বাষ্পীভবনে উবিয়া গেলে বালি থাকার দরুন মর্টার ছিদ্রযুক্ত ( porous ) হয়। কলিচুন এখন বায়ুর $CO_2$ শোষণ করে যাহার ফলে $CaCO_3$ তৈরী হয়। এই $CaCO_3$ বালি বা শুরকির সহিত মিশিয়া জমাট বাঁধে।

এইরূপ বালি জল আর সিমেণ্টের মিশ্রণকে **সিমেণ্ট মর্টার** ( Cement Mortar) বলে ।

**প্লাস্টার** (Plaster, or Paris Plaster ) : জিপসাম ( $CaSO_4, 2H_2O$ ) নামে ক্যালসিয়ামের একটি যৌগকে যদি 110°—120°C উত্তাপে তাপিত করা হয় তাহা হইলে কিছু জল নষ্ট হয় এবং প্লাষ্টার তৈরী হয়।

$$2 [ CaSO_4, 2H_2O ] = (CaSO_4)_2 , H_2O + 3H_2O$$
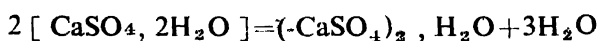
ইহা সাধারণ উষ্ণতায় জল শোষণ করে এবং কঠিন সিমেণ্টের মত সাদা জিপসামে রূপান্তরিত হয়। হাত-পা' ভাঙ্গিলে ডাক্তার প্লাস্টার করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন ; ভাস্কর্যে এবং ঢালাইয়ের কাজেও ইহার প্রয়োজন হয়।

E7 ·3 **কার্বন ডাই-অক্সাইড ও শিলা** (Carbon di-oxide and rocks) : অনেক প্রকার শিলা আছে ( যেমন চুনাপাথর, খড়িমাটি) যাহা জলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু $CO_2$ মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হয়। বাতাসের $CO_2$ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয় এবং নদীর জলের সহিত মিশিয়া বহু শিলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। এই জলে এখন $CaCO_3$ দ্রবীভূত হইয়াছে এবং আরও $CO_2$-র সংস্পর্শে আসিয়া কার্বনিক অ্যাসিড গঠিত হয়। ইহাতেও বহু শিলা দ্রবীভূত হয়। যখন নদীগুলি চুনাপাথর বা খড়িমাটি প্রধান এলাকা দিয়া প্রবাহিত হয় তখন সেই সকল অঞ্চলে পৃথিবীর উপর বা ভূ-গর্ভে নানা রকম পাথরের মূর্তির সৃষ্টি হয়। অবশ্য ইহার ভাস্কর

মানুষ নয়, প্রকৃতি। গহ্বরের মধ্যে যে মূর্তি গঠিত হয় তাহাকে স্ট্যালাক্মাইট ( Stalacmite ) বলে এবং গহ্বরের ছাদের মূর্তিকে বলে স্ট্যালাক্টাইট ( Stalactite )। যুগোশ্লাভিয়া এবং দক্ষিণ ইংলণ্ডে এমনি মূর্তি দেখা যায়।

**জলের খরতা অপসারণ ( softening of water ) :** জল খর ( hard ) বা মৃদু ( soft ) হয়। জল চিনিবার উপায় হইল সাবান মাখিয়া তাহা ধুইতে যাওয়া। খরজলে সাবান সহজে তোলা যায় না এবং ফেনা হয় না। মৃদুজলে খুব ফেনা হয় এবং সহজেই সাবান ধুইয়া ফেলা যায়।

আমাদের নিত্য প্রয়োজনে তাই খরজল অসুবিধাজনক। জলের খরতা দুই প্রকারের হয় :

(i) **অস্থায়ী খরতা ( temporary hardness ) :**

এই ক্ষেত্রে জলকে ফুটাইলেই দ্রাব্য বাই-কার্বনেট অদ্রাব্য কার্বনেটে পরিণত হইয়া তলায় থিতাইয়া যায় এবং জলের খরতা দূর হয়।

(ii) **স্থায়ী খরতা ( permanent hardness ) :**

এই ক্ষেত্রে শুধু ফুটাইলেই জলের খরতা দূর করা যায় না। দ্রাব্য ক্লোরাইড বা সালফেট লবণ, জলে মিশ্রিত থাকিলে কিছু সোডা বা চুন মিশাইয়া ফুটাইতে হইবে। এখন দ্রাব্য পদার্থ অদ্রাব্য হইয়া তলায় থিতাইয়া যায় এবং জলের খরতা অপসৃত হয়।

খর জল যদি সোডিয়াম পারমুটিট ( Sodium Permutit ) নামক জিনিসটির ভিতর দিয়া পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুই প্রকার খরতাই দূর হইবে।

বৃষ্টির জল বা নদীর জল ( শীতের সময় ) মৃদু হয়। ঝরনা, সাগর বা কূপের জলে বহু লবণ-জাতীয় পদার্থ থাকায় জল খর হয়।

**E7· 4 কৃষিকার্যে চুন ( lime in agriculture ) :** প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃতদেহ এবং নানা জৈব পদার্থের পচনের ফলে মাটিতে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গঠিত হয়। ইহা জলে দ্রবীভূত হইয়া কার্বলিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই ভাবে এবং আরও অন্য প্রকারে মাটির ক্ষারত্ব কমিয়া অম্লভাব বাড়িয়া যায় এবং শস্য উৎপাদনে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। চাষ করিবার সময় জমিতে চুন মিশাইলে মাটির অম্লতা কমিয়া যায়। উদ্ভিদ্ দেহের চুন সরবরাহের জন্যও মাটিতে চুন থাকা প্রয়োজন।

## প্রশ্নাবলী

1. অক্সাইড, অ্যাসিড এবং বেস্ বলিতে কি বুঝায় লিখ। প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

2. লবণ কাহাকে বলে—অ্যাসিড ও বেসের সহিত লবণের সম্বন্ধ কি? নিম্নের লবণগুলির যে কোন তিনটির বৈশিষ্ট্য, ব্যবহার এবং রাসায়নিক সূত্র ( chemical formula ) লিখ :—
   (i) সোডিয়াম কার্বনেট ( Sodium Carbonate ), (ii) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ( Potassium Permanganate ), (iii) ম্যাগনিসিয়াম সালফেট ( Magnesium Sulphate ), (iv) সোডিয়াম ক্লোরাইড ( Sodium Chloride ), (v) অ্যামোনিয়াম কার্বনেট ( Ammonium Carbonate ) ।

3. ল্যাবরেটরী পদ্ধতিতে ক্লোরিন প্রস্তুতি এবং উহার ধর্ম ও ব্যবহার বিবৃত কর।

4. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric Acid) এবং সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulphuric Acid)-এর গুণ, ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

5. নিম্নের যে কোন দুইটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :
   (i) দিয়াশলাই শিল্প, (ii) সালফার ডাই অক্সাইডের ল্যাবরেটরী প্রস্তুতি এবং ব্যবহার (iii) ব্লিচিং পাউডার।

6. বায়ুর উপাদান কি? নাইট্রোজেন চক্র বলিতে কি বুঝায়?

7. অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়াম লবণের ( অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও সালফেট ) পণ্য উৎপাদন সম্বন্ধে লিখ।

8. নাইট্রিক অ্যাসিডের ল্যাবরেটরী প্রস্তুতি ও ব্যবহার বিবৃত কর। সার হিসাবে নাইট্রিক অ্যাসিডের কোন্ কোন্ লবণ ব্যবহৃত হয়?

9. চুনাপাথর হইতে কিভাবে ভাটিতে কড়াচুন বা quick lime প্রস্তুত হয় তাহা লিখ। কৃষিকার্যে ইহা কেন ব্যবহৃত হয়?

10. নিম্নের যে কোন চারিটি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ : -
   (i) সালফার ডাই অক্সাইড (ii) অ্যাকোয়া রিজিয়া, (iii) মর্টার এবং প্লাস্টার, (iv) কটি সেঁকা সোডা, (v) জলের খরতা অপসারণ, (vi) ক্যালসিয়াম ফসফেট।

# F. Living Beings—Syllabus

*The underlined portions in the Syllabus are optional and may be omitted until further notice*

| Course Content | Demonstration & Experiments |
|---|---|
| F1. Nutrition | Water culture experiments. |
| F2. Soil, its relation to plants. | |
| F3. Outline of internal and external structures of toad or frog. | Dissection of toad or frog. |

## সারাংশ

**F1 ·1 প্রাণ ও নিষ্প্রাণের স্বধর্ম (life and non-life)**

**·2 প্রাণের সক্রিয়তা প্রাণপদার্থ প্রোটোপ্লাজমের জন্য**

(*i*) নানা রকমের জীবে নানা রকমের কর্মতৎপরতা

(*ii*) সকল কর্মচাঞ্চল্যের প্রতীক অদ্ভুত এই জীবন-রসায়ন

(*iii*) প্রোটোপ্লাজম জীবনকে ধারণ করে

**·3 পুষ্টির অভাবে প্রোটোপ্লাজম নিষ্ক্রিয় (loss of vitality)**

(*i*) খাদ্য জীবনধারণের অবশ্য রসদ

**·4 প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টির মূল প্রভেদ**

(*i*) প্রাণীকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় অন্য প্রাণী হইতে বা অন্য উপায়ে

(*ii*) উদ্ভিদেরা নিজেরাই খাদ্য তৈরী করিতে সক্ষম ক্লোরোফিলের সাহায্যে

**·5 আলোর অভাবে ক্লোরোফিল খাদ্য প্রস্তুত করিতে অপারগ**

**·6 উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় রসদের প্রমাণ : জলচাষ পরীক্ষা**

**F2 ·1 মাটি (soil)—ধরিত্রী অর্থাৎ সব কিছুকে যাহা ধারণ করে**

**·2 মাটির উৎপত্তি : কঠিন শিলার চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা**

**·3 মাটির প্রকারভেদ :**

(*i*) বালি

(*ii*) বেলে

(*iii*) দো-আঁশ

(*iv*) পলি

(*v*) এঁটেল

(*vi*) কালো

(*vii*) লাল

(*i*) সচ্ছিদ্রতায়
(*ii*) আর্দ্রতায়
(*iii*) রাসায়নিক গুণাগুণে

**·5 লাঙ্গল দিবার অর্থ—মাটির সচ্ছিদ্রতা বৃদ্ধি করা**
মাটির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির জন্য সার (relation to plants)

**·6 সার (manure) ও তাহার প্রকার ভেদ**
(*i*) সবুজ
(*ii*) রাসায়নিক
(*iii*) কম্পোস্ট

**·7 জাপানী প্রথায় ধান চাষ**

**F3 ·1 ব্যাঙ—প্রাণিবিভার ব্যাকরণ**

**·2 বহির্গঠন (external structures)**
(*i*) মাথা ও ধড়ের মধ্যে ঘাড় নেই
(*ii*) চোখ দুই প্রকার পাতাদ্বারা আবৃত
(*iii*) নাকের ছিদ্র ঢাকনাদ্বারা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব
(*iv*) দেহাবরণ অমসৃণ ও খসখসে ত্বকবিশিষ্ট
(*v*) জিহ্বা মুখবিবর হইতে সম্প্রসারণ করা সম্ভব
(*vi*) ডিম হইতে ব্যাঙাচি স্তরের পর পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ হওয়া

**·3 অন্তর্গঠন (internal structures)**
(*i*) খাদ্য গ্রহণের জন্য পৌষ্টিক নালী
(*ii*) রক্ত সংবহনের জন্য হৃৎপিণ্ড, ধমনী ও শিরা
(*iii*) শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য শ্বাসতন্ত্র
(*iv*) সঙ্কেত বহনের জন্য স্নায়ুমণ্ডলী

# F

## FI ·1 পৃথিবী: প্রাণ ও নিষ্প্রাণের স্বধর্ম

বিরাটাকার এক কমলালেবুর মত আমাদের এই পৃথিবী। তাহার যেখানেই যাই না কেন, আর যত-কিছু বিভিন্ন জিনিস দেখি না কেন, তাহা শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এই পৃথিবীর সকল বৈচিত্র্যই মূলতঃ দুইরকম জিনিসের সমাবেশে সৃষ্টি—সজীব পদার্থের আর জড় পদার্থের। সজীব পদার্থ মাত্রই জীবনের স্বতঃস্ফূর্তি দেখায়। উহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। এই জন্ম আর মৃত্যুর মাঝে প্রতিক্ষণ তাহার জীবনধারণের নানান লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই সব প্রাণের ধর্ম জৈবিক পরিবর্তন হিসাবে কত ভাবে প্রকাশ পায়। নির্বাক উদ্ভিদ জগতেরও প্রাণ আছে। শুষ্ক বীজ মাটিতে পড়িলে তাহার ভিতর হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয়, গাছ বড় হয়, ফুল ফোটে, ফল ধরে। মৌমাছি গুনগুন করিয়া মধু আহরণে যায়, পিঁপড়ে আপনার খেয়ালে আপন খাদ্য সংগ্রহ করে, মানুষ হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। ইহা জীবনের নানারকমের প্রকাশ। জীবনকে আমরা দেখিতে পাই একদিকে উদ্ভিদ জগতে—গাছপালায়, লতাগুল্মে, ফুলেফলে, শাকে-সবজিতে; আর অন্যদিকে প্রাণিজগতে—মানুষে, পশুতে-পক্ষীতে, জীবে-জন্তুতে, কীটে এবং পতঙ্গে। এই সমস্ত সজীব পদার্থের পাশাপাশি দেখা যায় জড় পদার্থ; পাথর, লোহা, ইট, কাঠ। জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণের কোন সাড়া নাই, আবেগ অনুভূতি নাই, গতিবেগ নাই; অচল অনড় হইয়া একই স্থানে পড়িয়া আছে।

## FI ·2 প্রাণের সক্রিয়তা প্রাণপদার্থ প্রোটোপ্লাজমের জন্য

প্রাণীই হউক আর উদ্ভিদ হউক, যাহারই ভিতর জীবনের স্পন্দন আছে, তাহারই দেহের ভিতরে অগণিত কোষে কোষে এক বিশেষ ধরনের সজীব পদার্থ মজুত আছে। তাহার নাম **প্রাণপদার্থ** বা **প্রোটোপ্লাজম**। এই প্রোটোপ্লাজমের বনিয়াদ তৈরী হয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি কতকগুলি মৌল দিয়া। এই বিভিন্ন মৌলগুলি প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে নানান

সমাবেশের গুণে সৃষ্টি করিয়াছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় জটিল পদার্থের। প্রোটোপ্লাজম এক অদ্ভুত গুণসম্পন্ন **জীবন-রসায়ন** - প্রতিমুহূর্তে সেখানে নানান রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। শ্বাস-প্রশ্বাস, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া দেখা-শুনা
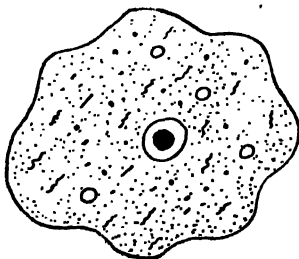
Fig. । জীবকোষের মধ্যে প্রাণপদার্থ প্রোটোপ্লাজম

প্রভৃতি নানান বিষয়ে জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দেহের ভিতরে নানারকমের যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তাহা প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে আপনা-আপনি ঘটিতে পারে—**প্রোটোপ্লাজম স্বয়ংক্রিয়**।

## FI 3 পুষ্টির অভাবে প্রোটোপ্লাজম নিষ্ক্রিয়

যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে দিনরাত নানারকম রাসায়নিক ভাঙ্গা-গড়া চলে। অবিরত এই জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলে প্রোটোপ্লাজমের ক্ষয় হয়। প্রোটোপ্লাজমের ক্রমাগত ক্ষয় তাহার কর্মক্ষমতা ব্যাহত করে এবং সেইজন্যে তাহার ক্ষমতা অটুট রাখিতে হইলে পুষ্টির প্রয়োজন। **পুষ্টির অভাবে সক্রিয় প্রোটোপ্লাজমও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে**। যে যে মৌল দিয়া প্রোটোপ্লাজম নিজে তৈরী সেই সেই মৌলগুলিই রসদ হিসাবে তাহার প্রয়োজন হয়। যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি। নানান খাদ্যের মাধ্যমে বা বাহির হইতে অন্য উপায়ে এই মৌলগুলি দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং প্রোটোপ্লাজমের সাহায্যে তাহারা নতুন প্রোটোপ্লাজম গঠনের কাজে লাগে। প্রোটোপ্লাজমের এই সহজাত ভাঙ্গা এবং গড়াকে বলা হয় যথাক্রমে সৃজনাত্মক প্রক্রিয়া (anabolism) ও ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া (catabolism)। এই দুই ক্রিয়াকে সম্মিলিতভাবে বিপাক (metabolism) বলা হয়। পুষ্টি দেহের ভিতরে জীবনের আগুনকে প্রজ্বলিত রাখে, অভুক্ত অবস্থা তাহার বিপরীত কাজ করে। প্রাণপদার্থের চাঞ্চল্যকেই বলা হয় জীবন—পুষ্টি পাইলে তাহা কর্মক্ষম হইয়া থাকে।

## FI ·4 প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টির মূল প্রভেদ

সে প্রাণিদেহ হউক আর উদ্ভিদের দেহ হউক, প্রত্যেক জীবের দেহ যেন একটি রাসায়নিক কারখানা। কিন্তু পুষ্টি গ্রহণের ব্যাপারে এই দুই কারখানার কাজ-কারবারের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়।

| উদ্ভিদের পুষ্টি | প্রাণীর পুষ্টি |
| --- | --- |
| 1. মৌলগুলি গ্রহণ করিয়া খাদ্য নিজে নিজে প্রস্তুত করে | 1. নিজে পারে না; পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল |
| 2. তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ গ্রহণ করে | 2. কঠিন ও তরল পদার্থ গ্রহণ করে |
| 3. প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সবুজ-কণিকা বা ক্লোরোফিল থাকায় সূর্যরশ্মির সাহায্যে মৌলগুলি হইতে সরাসরি জৈবিক পদার্থ প্রস্তুত করে | 3. প্রোটোপ্লাজমে সবুজ-কণিকা না থাকায় মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে অক্ষম |
| 4. বায়ু হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড লইয়া কার্বন ও অক্সিজেন কাজে লাগাইতে পারে | 4. পারে না |
| 5. লবণ জাতীয় খাদ্যের উৎস মাটি | 5 মাটি নয়—অন্য উপায়ে গ্রহণ করে |

## প্রাকৃতিক উপাদান হইতে ক্লোরোফিল খাদ্য তৈরী করিতে সক্ষম

উদ্ভিদদেহের প্রোটোপ্লাজমে ক্লোরোফিল মজুত থাকায় খাদ্য তৈরীর ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা হয়। ক্লোরোফিল আলো, বাতাস ও জল এই তিনটি জিনিস পাইলেই এগুলি হইতে উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে পারে। ক্লোরোফিল এমনই গুণসম্পন্ন কিন্তু প্রাণিদেহে ইহা না থাকায় কোন প্রাণী পূর্বোক্ত উপায়ে তাহাদের আহারের সংস্থান করিতে অপারগ। উদ্ভিদদেহে বাতাস পাতার রন্ধ্র দিয়া

ভিতরে প্রবেশ করে। শিকড়ের শোষণের ফলে মাটি হইতে জল আসে। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে কার্বন আসে ও ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন আত্তীকরণ (carbon assimilation) হয়। উদ্ভিদদেহের মধ্যে ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে এক বিস্ময়কর রাসায়নিক মিলন ঘটায়।

**কার্বন ডাই-অক্সাইড + জল = ফরম্যালডিহাইড + অক্সিজেন**

$$CO_2 + H_2O = CH_2O + O_2$$
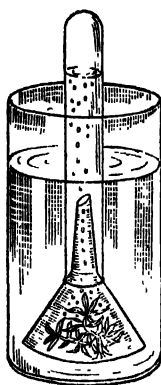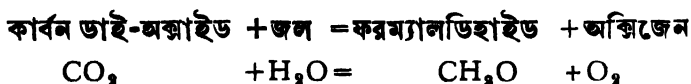
Fig. 2 খাদ্য-প্রস্তুতিতে অক্সিজেনের উদ্ভব

ক্লোরোফিলের এই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতার দ্বারা আলোক হইতে রশ্মি আহরণ করিয়া গাছ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটায় ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সালোক-সংশ্লেষ (photo-synth sis) ইহার দৃষ্টান্ত। ফরম্যাল-ডিহাইড হইতে গ্লুকোজ (এক প্রকার চিনি) তৈরী হয়। পরে গ্লুকোজ আরও জটিল হইয়া শ্বেতসারে (starch) রূপান্তরিত হয়:

$$6CH_2O = C_6H_{12}O_6$$
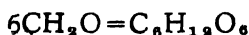
## F1 ·5 আলোর অভাবে ক্লোরোফিল খাদ্য তৈরী করে না

আলোর অভাবে ক্লোরোফিল উদ্ভিদদেহে শ্বেতসার প্রস্তুত করিতে অক্ষম। সালোকসংশ্লেষ দিনের বেলা হয়—রাত্রে বন্ধ থাকে। অর্থাৎ উদ্ভিদদেহে খাবার দিনে তৈরী হয়, রাত্রে তাহার সদ্ব্যবহার। আলোকসংশ্লেষ হয় না বলিয়া স্টার্চ প্রস্তুতও হয় না এবং রাত্রে উদ্ভিদ দেহ হইতে অক্সিজেন বাহির হয় না।

রাত্রে আলোক-সংশ্লেষ বন্ধ হইলে স্টার্চ আবার গ্লুকোজে পরিণত হয় : এবং গ্লুকোজ ভাঙ্গিয়া গাছের বর্ধমান অংশগুলিতে দেহ গঠনের কাজে লাগে। কখনও বা দেখা যায় যে স্টার্চে রূপান্তরিত খাদ্য পুনরায় গ্লুকোজে রূপান্তরিত না হইয়া স্টার্চরূপেই

Fig. 3 সূর্যালোকের অভাবে ক্লোরোফিল খাদ্য তৈরী করে না

সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে গাছের কোনও অংশে জমা হইয়া থাকে। আলু, ধান, গম, কচু প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। গাছ রাত্রিবেলা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে না। শ্বাসকার্য দিবারাত্রই চলে তাই রাত্রে গাছের নীচে শয়ন করা ভাল নয়।

## F1 ·6 পুষ্টি জলচাষ পরীক্ষা (water culture experiments)

**প্রতিপাদ্য বিষয় :** কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া উদ্ভিদের পোষণ ও পুষ্টির জন্য আর যাহা যাহা মৌলের প্রয়োজন :

**পরীক্ষার উপকরণ :**

(i) ৮টি এক লিটারের ফ্লাস্ক

(ii) ৮টি ঐ ফ্লাস্ক অনুযায়ী সচ্ছিদ্র ছিপি

(iii) ৮টি বায়ু চলাচলের নল

(iv) ৮টি সমান আকারের ভুট্টার চারা

(v) পটাসিয়াম নাইট্রেট —1 গ্রাম

(vi) পটাসিয়াম ফসফেট —1 গ্রাম

(vii) ম্যাগনিসিয়াম সালফেট—1 গ্রাম

(viii) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট —3 গ্রাম

(ix) ফেরিক ক্লোরাইড —অতি সামান্য

(x) কয়েক লিটার বিশুদ্ধ জল

**প্রণালী :**

আটটি ফ্লাস্কে বিশুদ্ধ জল লওয়া হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ নং ফ্লাস্কে | v, vi, vii, viii, ix | | সবগুলি লবণ দ্রব করা হউক |
| ২ নং " | (v) | বাদে | অন্য লবণগুলি দ্রব করা হউক |
| ৩ নং " | (vi) | " | " " " " " |
| ৪ নং " | (vii) | " | " " " " " |
| ৫ নং " | (viii) | " | " " " " " |
| ৬ নং " | (ix) | " | " " " " " |
| ৭ নং " | (v ও viii) | " | " " " " " |
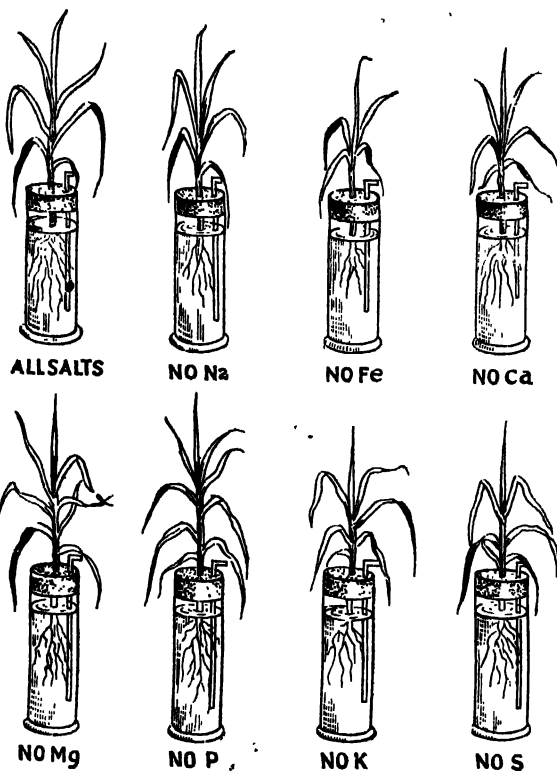
Fig. 4 জলচাষ পরীক্ষা

প্রত্যেক ফ্লাস্কে ছিপির ফুটোর ভিতর দিয়া একটি করিয়া ভুট্টার চারা ও একটি করিয়া বায়ু চলাচলের নল প্রবেশ করান হইল। প্রত্যেকটি দ্রবণই যেন কিছু পরিমাণে অম্লযুক্ত (acidic) হয়।

**পরীক্ষার ফল :**

পাঁচ ছয় সপ্তাহ ধরিয়া গাছগুলির বৃদ্ধি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় সব কয়টি ফ্লাস্কে চারাগুলি একভাবে বাড়িয়া উঠে নাই (Fig. 4)।

অতএব প্রমাণিত হইল যে,

(1) **কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়া উদ্ভিদদেহের পুষ্টি ও পোষণের জন্য প্রয়োজন ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনিসিয়াম, নাইট্রোজেন, লৌহ, ফসফরাস ও সালফার।**

(2) **এই সব পুষ্টি ও পোষণের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গাছ উহার শিকড়ের সাহায্যে মাটির রসের সহিত যৌগিক পদার্থ হিসাবে গ্রহণ করে।**

(3) **মাটিতে এইসব অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি সার হিসাবে প্রদান করিলে গাছের সর্বাঙ্গীণ পোষণ হয়।**

## F2·1 মাটি (Soil, its relations to plants)—ধরিত্রী সব কিছুকে ধারণ করে

আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, উদ্ভিদ আর প্রাণীদের লইয়া এই পৃথিবীর যত বিস্ময়। পৃথিবী অর্থে ধরিত্রী অর্থাৎ ধাত্রী ; যিনি উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ধারণ করেন। সেইজন্য সর্বদেশে দেশকে দেশমাতৃকা রূপে সম্বোধন করা হয়। ‘দেশের মাটি’ আমাদের কাছে তাই এত প্রিয়। মাটির সঙ্গে যেমন মানুষের সম্বন্ধ, উদ্ভিদের সম্বন্ধও তেমনি। গাছপালা সাধারণতঃ অচল হয়, একই জায়গায় স্থাণু হইয়া আছে। মাটি গাছপালাকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে ধরিয়া রাখে। এই মাটির মধ্যে উদ্ভিদের জন্ম, এখানেই উহার শেষ পরিণতি। মাটির সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ তাই এত অঙ্গাঙ্গী।

## F2·2 কঠিন শিলাখণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইলে মৃত্তিকার দশা পায়

আগ্নেয় শিলা হইতে মাটির উৎপত্তি হয়। ভূ-ত্বকের কঠিন শিলা লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া রৌদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইয়া আসিতেছে, তাহার ফলে সেই কঠিন শিলাও কালক্রমে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া মৃত্তিকার আকার পায়। জল কঠিন শিলাকেও গলায় বলিয়া তাহাকে বিশ্বদ্রাবক (universal solvent) বলা হয়। মাটির নানাপ্রকার ভেদ আছে। সাধারণভাবে মাটি প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এক স্থান হইতে অপর স্থানে নদীর স্রোতে বাহিত হইতে পারে। মাটি শিলাখণ্ডের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অজস্র অংশ। বিভিন্ন শিলাখণ্ড হইতে নানাজাতীয় মৃত্তিকার আবির্ভাব হয়। সচরাচর মাটির মধ্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদের দেহাবশিষ্ট অংশের কিছু কিছু নিদর্শন মেলে।

## F2·3 মাটির প্রকারভেদ :

(i) **বালি মাটি**—90% বালি, 10% কাদার ভাগ, জল শোষণ করে ; পটল, তরমুজ, কাঁকুড় ভাল হয়।

(ii) **বেলে মাটি**—বালির চেয়ে কাদার ভাগ বেশি, কম উর্বরা ; আলু, জোয়ার, বাজরা ভাল হয়।

(iii) **দো-আঁশ মাটি**—বালি ও কাদার ভাগ সমান, বায়ু ও জল সহজে প্রবেশ করে, কৃষি-উপযোগী ; ধান, ভুট্টা, সরষে, তামাক ভাল হয়।

(iv) **পলি মাটি**—কাদার ভাগ বেশি, সর্বাধিক উর্বরা ; সব চাষ ভাল হয়।

(v) **এঁটেল মাটি**—বালিহীন হওয়ায় কঠিন হয়, সচ্ছিদ্র না-হওয়ায় চাষের কাজে অসুবিধা ঘটায়, জল ধরিয়া রাখে না।

(vi) **কালো মাটি**—দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়—ব্যাসল্ট লাভা প্রস্তর হইতে আসে, তাহার রং কালো ; তুলা ভাল ফলে, দীর্ঘদিন জল ধরিয়া রাখে।

(vii) **লাল মাটি**—লোহা জাতীয় পদার্থ বেশি থাকে, সার ব্যতিরেকে উর্বরা নয়।

## F2·4 মাটির ঐশ্বর্য তাহার সচ্ছিদ্রতায়, আর্দ্রতায় ও রাসায়নিক গুণাগুণে

ভাল মাটি মাত্রেই তাহা সচ্ছিদ্র, আর্দ্র ও রাসায়নিক লক্ষণযুক্ত হইবে। ইহার কোন একটি অভাব ঘটিলে, মাটির ফসল ফলানর ক্ষমতা কম হয়। মাটির মধ্যে সর্বদা দেখা যায় ব্যাক্‌টিরিয়া নামক অণুবীক্ষণীয় জৈব পদার্থদের—যাহারা আপন দেহের সাহায্যে মাটির নাইট্রোজেন ভাগ বৃদ্ধি ঘটায়। এইসব জৈব পদার্থকে হিউমাস (humous) বলে।

## F2·5 লাঙ্গল দিবার অর্থ

প্রতিবার ফসল ফলনের আগে লাঙ্গলের সাহায্যে জমি কর্ষণ করা হয় ; কারণ, প্রধানতঃ লাঙ্গলের ফলার সাহায্যে চাষের নিরেট জমি ওলট-পালট হয়, জমিতে বায়ু প্রবেশ করে এবং বৃষ্টির জল তাহাকে আর্দ্র করে। মাটি বায়ু ও জল শোষণ করিবার পর বীজ বপন করিলে শস্য ভাল হয়। অতএব লাঙ্গল দিবার ফলে

(i) মাটির সচ্ছিদ্রতা ( porosity ) বাড়ে ;

(ii) বায়ু ও জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করে।

## F2·6 সার ( manure ) মাটির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন

প্রতি বছর একই জমিতে শস্য ফলানর ফলে মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়। কারণ মাটিতে মজুত যে সব রাসায়নিক পদার্থ থাকে, গাছের বৃদ্ধির জন্য তাহাদের ক্রমাগত ব্যবহার করা হয় এবং সেইসব আনুষঙ্গিক পদার্থগুলির অভাবের ফলে বপন করিলে গাছের স্বাভাবিক পুষ্টির অভাবে গাছ বাড়ে না। কৃত্রিম উপায়ে মাটির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধির জন্য গাছের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সংযোগ ঘটানকে সার (manure) দেওয়া বলা হয়।

(i) **সবুজ সার**

ধঞ্চে, মটর, ছোলা গাছ মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিলে জমির ফলন শক্তি বাড়ে। এই পদ্ধতি সবুজ সার নামে খ্যাত।

(ii) **রাসায়নিক সার**

অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ফসফেট ও পটাসিয়াম সালফেট প্রভৃতি রসায়ন মাটিতে দিলে মাটির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। এই পদ্ধতি রাসায়নিক সার নামে খ্যাত।

(iii) **কম্পোস্ট সার**

গাছপালা, তরকারির খোসা, গোবর, প্রাণিদেহের ছাটাই মাংস ও রক্ত, খোল ও ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, অ্যামোনিয়াম প্রভৃতির নাইট্রেট, ম্যাগনিসিয়াম ও লৌহঘটিত পদার্থ একসঙ্গে মিশাইয়া কোন গর্তে দু-তিন মাস জলসিক্ত করিতে হইবে। কিছুদিনের মধ্যেই উহার মধ্যে ব্যাকটিরিয়া জন্মে এবং এইসব যাবতীয় জিনিস অতি উত্তম সারে পরিণত হয়। এই সারকে কম্পোস্ট সার বলে। মাটির পক্ষে এই সারই সব চেয়ে উত্তম।

## F2·7 জাপানী প্রথায় ধান চাষ

সম্প্রতি আমরা জাপানী প্রথায় ধান চাষ করার কথা শুনিয়াছি। এই প্রথায় বীজ বপন করিয়া, সেই জমিতেই ধানের ফলন পর্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়—আমাদের এদেশে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অন্য জমিতে আর রোপণ করিবার দরকার হয় না।

## F3·1 কুনো ব্যাঙ (toad)—প্রাণিবিদ্যার ব্যাকরণ

প্রাণিতত্ত্ববিদরা ব্যাঙকে বলেন 'প্রাণিবিদ্যার ব্যাকরণ'। কারণ ব্যাঙের বহির্গঠন ও আভ্যন্তরীণ গঠন ভালভাবে আয়ত্ত না করিতে পারিলে বৃহৎ প্রাণিবিদ্যার অনেক কিছুই অজানা থাকিয়া যায়। এ পৃথিবীতে বহুরকমের ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে আমাদের হাতের কাছে যাহা সহজে মিলে তাহা হইল সোনা ব্যাঙ (Rana) ও কুনো ব্যাঙ (Bufo)।

Fig. 5 কুনো ব্যাঙ

**ব্যাঙ উভচর** ( amphibious )—জলে এবং স্থলে উভয় স্থানে বিচরণ করিতে সমান দক্ষ। ব্যাঙের জীবনের সুরু হয় জলে, তখন মাছের মত উহার কিছু বিশেষত্ব থাকে, যেমন শ্বাসকার্য চলে ফুলকার সাহায্যে। পরে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ফুলকা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় ও দেহের মধ্যে ফুসফুসের আবির্ভাব হয়। মাছের চেয়ে ব্যাঙ উচ্চস্তরের মেরুদণ্ডী জীব।

## F3·2 কুনো ব্যাঙের বহির্গঠন (external structures)

(i) ব্যাঙের মাথা ও ধড়ের মধ্যে ঘাড় নাই, মাথা পিঠ ও পেট একসঙ্গে মিশান, লেজ নাই।

(ii) ব্যাঙের আবরণে আছে অমসৃণ ও খসখসে ত্বক, গায়ে আচিলের মত উঁচু উঁচু গ্রন্থি আছে, গায়ের রঙ অনেকটা ছাই রঙের।

(iii) ব্যাঙের চোখ পাতার দ্বারা আবৃত। চোখে তিনপ্রকার পাতা আছে। প্রথম দুই প্রকার অস্বচ্ছ—অনেকটা আমাদের মত। তৃতীয় পাতা স্বচ্ছ তাহা চোখকে ঢাকে, কিন্তু দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটায় না।

(iv) ব্যাঙের নাকের ছিদ্র ঢাকনার সাহায্যে ইচ্ছামত খোলাবন্ধ হয়, বিশেষ ধরনের ঢাকনা (valve) নাকের ফুটোয় নাসারন্ধ্রে দরজার মত প্রয়োজন বোধে খোলে বা বন্ধ হয়।

(v) ব্যাঙের কানের পর্দা মুখের দুই পাশে থাকে, কর্ণপটাহ মুখের কিছু পিছনে দুইপাশে চামড়ার উপরেই দেখিতে পাওয়া যায়। আকৃতিতে গোলাকার।

(vi) ব্যাঙের সমগ্র জিহ্বা মুখবিবর হইতে বাহিরে আসিতে পারে, জিহ্বা সামনের দিকে নীচেকার চোয়ালে লাগান—পিছনের দিক আলগা থাকায়, তাহার সবখানি অংশ কীট-পতঙ্গ শিকারের সময় গায়ে গিয়া পড়ে। জিহ্বায় বিশেষ ধরনের আঠা থাকে।

(vii) ব্যাঙের সামনের পা ৪ আঙ্গুল ও পিছনের পা ৫ আঙ্গুল বিশিষ্ট। আঙ্গুলে নখ নাই। পিছনের পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে চামড়ার পাতা আছে—সাঁতারের উপযোগী।

(viii) ব্যাঙের ব্যাঙাচি হইতে ব্যাঙ হওয়া—পুকুরে বা অন্য কোন জলাধারে ব্যাঙে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে প্রথম ব্যাঙাচি বার হয়—দেখিতে মাছের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে। ব্যাঙাচি পরে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের দশা প্রাপ্ত হইয়া জল ছাড়িয়া স্যাঁতসেঁতে কোন অন্ধকার জায়গায় আশ্রয় লয়।

## F3·3 কুনো ব্যাঙের অন্তর্গঠন (internal structures) :

কুনো ব্যাঙের শারীরস্থান ( anatomy ) পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার দেহের ভিতরে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ বর্তমান আছে। উহার পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চলন, পেশী ও স্নায়ু ( নার্ভ ) তন্ত্রের সব রকম ব্যবস্থা আছে।

(i) **পৌষ্টিক নালী** ( alimentary canal )—বাহিরের খাদ্য মুখ-বিবরের ভিতর দিয়া ফ্যারিংসএ আসে। সেখান হইতে অন্ননালী ( oesophagus ) হইতে পাকস্থলীতে (stoamch) যায়। তাহার পর খাদ্যনালী সরু একটি লম্বা নলের আকার ধারণ করিয়া প্রথমে ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) ও পরে বৃহদন্ত্র ( large intestine ) নাম ধারণ করিয়া বাহিরে যাইবার মুখে ক্লোয়াকায় ( cloaca ) আসে। মুখ হইতে ক্লোয়াকা পর্যন্ত সমগ্র খাদ্যনালীতে খাবার হজম হয়। পাকস্থলীর দুই পাশে মেটে রঙের যকৃৎ আছে। পাকস্থলীর শেষের দিকে আরও একটি খাদ্যহজমের তন্ত্র ( organ ) আছে যাহার নাম অগ্ন্যাশয় (pancreas)

(ii) **রক্ত সংবহনের জন্য হৃৎপিণ্ড, ধমনী ও শিরা** (heart, arteries and veins)—হৃৎপিণ্ডের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে—উপরে দুইটি অলিন্দ (auricle) ও নীচে একটি নিলয় (ventricle)। বড় বড় শিরা ও ধমনীর সহিত হৃৎপিণ্ডের যোগ আছে।

অলিন্দ-নিলয় এবং সাইনাস ভিনোসাস—( হৃৎপিণ্ডের আর একটি অংশ ) ও ফুসফুসীয় শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কপাটিকা ( valve ) আছে।

ঊর্ধ্ব ( superior vena cava ) ও অধঃ ( inferior vena cava ) মহাশিরা দিয়া দেহ হইতে রক্ত সাইনাস ভিনোসাস দিয়া ডান অলিন্দে আসে।

ফুসফুসীয় ধমনী ( pulmonary artery ) দিয়া রক্ত ফুসফুসে শোধিত হইবার জন্য যায়।

ফুসফুসীয় শিরা ( pulmonary vein ) দিয়া সেই রক্ত শোধিত হইয়া বাম অলিন্দে আসে।
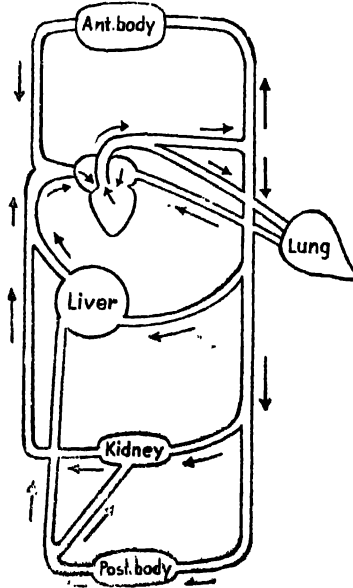
Fig. 6 রক্ত সংবহনের পদ্ধতি

প্রধান মহাধমনী ( conus arteriosus ) শোধিত রক্ত বাম অলিন্দ হইতে এবং ডান অলিন্দ হইতে অশোধিত এই দুইরকম রক্তই নিলয়ে আসে এবং পরে প্রধান মহাধমনীর সাহায্যে দেহের নানান প্রান্তে পৌঁছাইয়া যায়। ধমনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রক্ত সরবরাহ করে খুব সরু সরু পাতলা জালির ( capillaries ) মত সূক্ষ্ম ধমনী দিয়া।

হৃৎপিণ্ড ধমনী ও শিরার মাঝখানে থাকিয়া অহরহ তরল রক্তকে পাম্প করিয়া দেহের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পাঠাইয়া দেয়।

(iii) **শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য শ্বাসতন্ত্র** (respiratory system)
নাক হইতে বায়ু মুখের ভিতর দিয়া ফুসফুসে আসে। বায়ু হইতে রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। দুই পাশের ফুসফুস দেখিতে জালির মত, কিছুটা রক্তাভ।

(iv) **সঙ্কেত বহনের জন্য স্নায়ুতন্ত্র** (nervous system)—শিরস্থানের সঙ্গে দেহের সর্বদিকে সূক্ষ্ম নার্ভের তার আছে। ইহারা নিমেষের মধ্যে দেহের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে উহারা সঙ্কেত বার্তা পৌঁছাইয়া দেয়।

## প্রশ্নাবলী

1. প্রাণপদার্থের সক্রিয়তা সম্বন্ধে লিখ।
2. খাদ্য জীবনধারণের অবশ্য রসদ, এই উক্তির ব্যাখ্যা কর।
3. প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টির মূল প্রভেদ বর্ণনা কর।
4. জল-চাষ পরীক্ষার দ্বারা কি প্রমাণ হয়?
5. মাটির উৎপত্তি কি প্রকারে হয়?
6. মাটি সবকিছুকে ধারণ করে তাই তাহার আর এক নাম ধরিত্রী, এই উক্তির সত্যতা উদ্ভিদের জীবন হইতে বল।
7. মাটির প্রকারভেদ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
8. সারের সার্থকতা কিসে? কয়েক রকমের সারের কথা বল।
9. ব্যাঙের বহির্গঠন বর্ণনা কর।
10. ব্যাঙের পৌষ্টিক নালী অথবা রক্তসংবহন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

# G. Human body—Syllabus

**Course Content**

G1. Main skeleton, bones the frame work for body activities: work of muscles; attachment of arm and leg muscles. (No deta ed knowledge of anatomy is required).

G2. Digestive system of man; mouth, teeth, tongue, gullet, stomach, small intestine, pancreas, liver; action of enzymes in aiding digestion.

G3. Excretory system of man; skin, lungs, kidneys, large intestine and anus.

G4. Nervous system: sensory organs (elementary ideas).

G5. Food, source of energy for man: our food needs, balanced diet (Protein, fat, carbohydrate, salt, water vitamin roughage). Meeting our food needs: eating habits, food misconceptions.

**Demonstration & Experiments**

D. Charts and models of human skeleton, muscles and viscera.

## সারাংশ

**GI ·1 মানুষের দেহরূপী যন্ত্রের কলকব্জা**—জীবকোষের সুবিন্যস্ততার ফল

**·2 ভিতরকার হাড়ের কাঠামো ও শরীরের কার্যকলাপ (frame work & body activity) :**

(*i*) হাড় জীবকোষের কঠিন অবস্থা

(*ii*) দেহকে ধারণ ও বহন করে

(*iii*) অচল ও সচল সন্ধি—দ্রুত সঞ্চালনের পক্ষে উপযোগী

(*iv*) দেহকে সুসম্বদ্ধ রাখে

·3 **অস্থিতন্ত্রের মূল অংশসমূহ (main skeleton)**

মস্তক, দেহকাণ্ড ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল হাড়ের সংখ্যা = 120টি

·4 **পেশীর কার্য (work of muscles)**—নার্ভের সংযুক্তির ফলে পেশীর সংকোচন ক্ষমতা

(*i*) ইচ্ছাধীন (voluntary) পেশী—চিহ্নিত ; হাতের ও পায়ের

(*ii*) অনৈচ্ছিক (involuntary) পেশী—অচিহ্নিত ; পৌষ্টিক নালীর

(*iii*) হৃৎপিণ্ডের (heart) পেশী—অনৈচ্ছিক ও চিহ্নিত

·5 **হাত ও পায়ের পেশী (attachment of arm & leg muscles)—পেশীর দুই সরু দিকের নাম টেণ্ডন (tendon)**

(*i*) হাতের পেশী—বাইসেপ্‌স্ ও ট্রাইসেপ্‌স্

(*ii*) পায়ের পেশী—কাফ

G2 ·1 **পাচন তন্ত্র (digestive system)** —ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি সাধনের যন্ত্র

·2 **মুখগহ্বর (mouth)**—পৌষ্টিক নালীর সুরু, খাদ্যগ্রহণের দরজা

·3 **দাঁত (tooth)**—দেহের সবচেয়ে মজবুত অংশ ; বিভিন্ন রকমের দাঁত—ইনসিজার, কেনাইন, প্রিমোলার, মোলার

·4 **জিহ্বা (tongue)**—টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা আস্বাদনের যন্ত্র—টেস্টবাড ; লালাগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লালারস ও খাদ্যের সঙ্গে সংমিশ্রণ

·5 **খাদ্যনালী (digestive tube)—পাকস্থলীতে** হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, পেপসিন, রেনিন—খাদ্যের তরলীকরণ

·6 **ক্ষুদ্র অন্ত্র—২০ ফিট ;** পিত্তরস ; স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ করায়

·7 **যকৃত (liver)**—অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত হয় ও প্রয়োজনে আবার তাহা গ্লুকোজ হয়

·8 **অগ্ন্যাশয় (pancreas)**—ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ এনজাইমের ক্রিয়া

·9 **বৃহৎ অন্ত্র (large intestine)**—খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ ( গ্লুকোজ ও জল ছাড়া ) নিষ্কাশিত হয়

·10 **জারকের কার্যকারিতা (action of enzymes)—অনুঘটক,** পাচনক্রিয়ার সহায়ক, বিভিন্ন রকমের জারক

G3 ·1 **রেচন তন্ত্র (excretory system)**—দূষিত পদার্থ ( কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় ) নিষ্কাশন

·2 **চর্ম (skin)**—শতসহস্র ঘর্মকূপ ও তাহাদের জলনিষ্কাশন

·3 **ফুসফুস (lungs)**—রক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে ও অক্সিজেন গ্রহণ করে

·4 **স্নায়ুকোষ (nerve cell)**—চেতনা আদান-প্রদানের বাহক,

কোষের বিভিন্ন অংশ—সেলবডি, একসন, ডেনড্রন

·5 **নার্ভের ক্রিয়া**

(*i*) প্রতিবর্ত ক্রিয়া

(*ii*) প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া

·6 **জ্ঞানবহ ইন্দ্রিয়সমূহ (sense organs)**

(*i*) চক্ষু (eye)—দেখিবার জন্য

(*ii*) কর্ণ (ear)—শুনিবার জন্য

(*iii*) নাসিকা (nose)—আঘ্রাণের জন্য

(*iv*) জিহ্বা (tongue)—আস্বাদনের জন্য

(*v*) স্পর্শেন্দ্রিয় (skin)—স্পর্শের জন্য

} এ সব কিছুর বোধ নানা রকমের স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে আসিলে অনুধাবন সম্ভব হয়

G5 ·1 **খাদ্য (food)—তাহার প্রয়োজন**

·2 **খাদ্য জীবনীশক্তির উৎস (source of energy)**

·3 **খাদ্য বিভাগ**

(*i*) প্রোটিন (protein) : নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য—মাছ, মাংস, ছানা

(*ii*) কার্বোহাইড্রেট (carbohydrate) : চিনি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য—চাল, ডাল, গম, আলু

(*iii*) ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় (fat) : স্নেহ জাতীয় খাদ্য—ঘি, চর্বি, উদ্ভিদ তৈল

(*iv*) লবণাদি খনিজ পদার্থ (mineral salts) : লবণ জাতীয় ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, আইওডিন

[illegible]—স্নায়ুসমূহের পুষ্টি—( বাঁধা কপি, পালং শাক )

,, $B_2$—চর্মরোগ ও পেলাগ্রা ( গাজর, পালং শাক )

,, C—দন্ত মাড়ি হইতে রক্তস্খালন নিবারণ ( লেবু, আম, কলা )

,, D—হাড়, দাঁত গঠন ( মুরগীর ডিম, কড মাছের তেল )

,, E—স্ত্রীলোকের প্রজনন ক্ষমতার বৃদ্ধি ( লেটুস শাক, ভুট্টা, ডিম )

**·4 খাদ্যের শক্তি-মূল্য**

১ গ্রাম প্রোটিনে—৪·১ ক্যালোরি

,, ,, কার্বোহাইড্রেটে—৪·১ ক্যালোরি

,, ,, ফ্যাটে —৯·৩ ক্যালোরি

**·5 খাদ্যের প্রয়োজন (food needs)**

**·6 সুষম খাদ্য (balanced food)**—অর্থাৎ ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি ও যথেষ্ট পরিমাণ তাপসৃষ্টির সহায়ক

**·7 অসার খাদ্য (roughage)**—সুষম খাদ্যের সঙ্গে কিছু অসার প্রয়োজন

**·8 খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা (misconceptions)**—খাদ্য বিচারে বৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রয়োজন

# G

## G1 ·1 মানব-দেহরূপী-যন্ত্রের তুলনা নাই

আধুনিক কালে মানুষের সাফল্য দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে মানুষের মত এমন বিচিত্র কারিগর বুঝি এ ত্রিভুবনে আর কেহ নাই। এই পৃথিবীর উপর তাহার বিরাট আধিপত্য সার্থক হইয়াছে তাহার পরিকল্পিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে। তাহার নব নব উদ্ভাবনী শক্তি কালের শাসনের বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি হানিয়াছে। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট যাবতীয় যন্ত্রপাতির মহিমাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার নিজের **দেহরূপী-যন্ত্রটি**। এই সজীব যন্ত্রটির কলকব্জার দক্ষতা এমনই যে মানুষের চোখের-দেখা মনের-দেখার সামিল। তাহার মাথার স্নায়ু-মণ্ডলীর ভিতরকার সব ভাবনা কল্পনাগুলি জাগতিক ব্যাপারে পরিবর্তনের দূত। তাহার নিপুণ হাতের কর্মক্ষমতা শিল্পীর দক্ষতাসম্পন্ন। বিশ্বকর্মা যখন মানুষ যন্ত্রটি তৈরী করিতে বসিয়াছিলেন, তখন জীবজীবনের গঠনের মূল এই জীবকোষগুলিকে এমন নিখুঁত ভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন যে তাহার জীবকোষগুলির **রচনাকৌশল ও কর্মক্ষমতা** অতুলনীয়। অথচ এই জীবন্ত যন্ত্রটির উদ্ভাবনে মানুষের নিজের কোন হাত নাই। নিজের শারীরস্থান সম্বন্ধে স্বভাবত মানুষ তাই এত কৌতূহলী।

Fig. 1 মানবযন্ত্র

## G1 ·2 ভিতরকার হাড়ের কাঠামো ও শরীরের কার্যকলাপ
## (The framework & body activity)

নরদেহের রচনাকৌশল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহার বাহিরের আকৃতি প্রকৃতিতে যতই সৌকুমার্য থাকুক না কেন আভ্যন্তরীণ গঠনের মূলে আছে একটি

হাড়ের কাঠামো। সমস্ত দেহটি এই হাড়ের কাঠামোর উপর ভর করিয়া আছে। যেমন একটি প্রতিমা বাঁশ ও খড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

(i) হাড় কোষ এবং কয়েকটি বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত। কোষ ছাড়া প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ **কোলাজেন** (collagen), ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (calcium carbonate) ও ক্যালসিয়াম ফসফেট (calcium phosphate) থাকে। শিশু অবস্থায় অস্থিতে কোলাজেন বেশী থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ক্যালসিয়াম ফসফেট-এর পরিমাণের আধিক্য ঘটে। বেশী বয়সে হাড় ভাঙ্গিলে অনেক সময় জোড়া লাগিতে সময় লাগে।
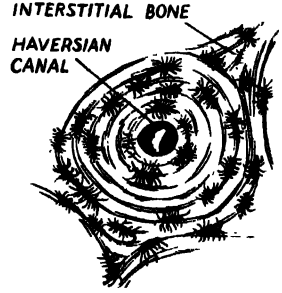
Fig. 2 কোষের অস্থির দশা-প্রাপ্তি

(ii) হাড়ের কাঠামো দেহকে ধারণ এবং বহন করে।

(iii) কঙ্কাল থাকায় দ্রুত গমনাগমনের সুবিধা হয়—যাহাদের কঙ্কাল নাই (কেঁচো) তাহারা দ্রুত চলিতে পারে না।

(iv) কঙ্কাল দেহকে সুসম্বদ্ধ রাখে—অপেক্ষাকৃত কোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (যেমন মগজ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি)-কে আবৃত রাখে।

(v) অস্থির ভিতরের মজ্জা হইতে রক্তের লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়।

(vi) হাড়ের কাঠামো মজবুত হইলেও ইহাকে ইচ্ছামত ক্ষিপ্রতার সহিত নাড়ান দোলান বা হেলান সম্ভব। অস্থি সংযোজনকে সন্ধি বলা হয়; সন্ধি দুইপ্রকার—

1. সচল সন্ধি (movable joints)—হাতের, কনুই, আঙ্গুল ও পায়ের অস্থিতে বর্তমান।

2. অচল সন্ধি (immovable joints)—মাথার খুলির অস্থিতে বর্তমান।
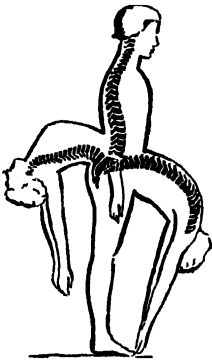
Fig. 3 হাড়ের কাঠামো ইচ্ছামত নাড়ান সম্ভব

## GI·3 অস্থিতন্ত্রের মূল অংশসমূহ (Main skeleton)

মাথা হইতে পায়ের আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত কঙ্কালের যে বনেদটি আছে তাহা সাদা কালো, লম্বা বা খর্ব আকৃতির প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই সমান। কঙ্কালের এই

বনেদটি সৃষ্টি হয় কতকগুলি অস্থির সমষ্টিতে। সুবিধার জন্য অস্থিতন্ত্রকে তিন ভাগ করা হয়:

**(i) মস্তকে হাড়ের সংখ্যা**

| | | |
|---|---|---|
| করোটিতে | 8টি | মাথায় হাড়ের বাক্সে মগজ রক্ষিত |
| মুখমণ্ডলে | 14টি | |
| কর্ণে | 6টি | |
| কণ্ঠমণি | 1টি | |
| | 29টি | |

**(ii) দেহকাণ্ডে হাড়ের সংখ্যা**

| | | |
|---|---|---|
| মেরুদণ্ডে | 26টি | মেরুদণ্ড নির্মিত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কসেরুকা দ্বারা; মাংসপেশী ও সন্ধি-বন্ধনীর মাঝে পাশাপাশি থাকে কসেরুকা; পঞ্জরের মধ্যে কোমল তন্ত্রাদি সুরক্ষিত থাকে। |
| পঞ্জরে | 24টি | |
| উরঃ ফলকে | 1টি | |
| অক্ষকাস্থিতে | 2টি | |
| অংসফলকে | 2টি | |
| শ্রোণীচক্রাস্থিতে | 2টি | |
| | 57টি | |

**(iii) প্রত্যঙ্গে হাড়ের সংখ্যা**

| | | |
|---|---|---|
| বাহুতে | 60টি | বাহু এবং পদ হাড় দ্বারা গঠিত হইলেও সঞ্চালনে সুদক্ষ |
| পদে | 60টি | |
| | 120টি | |

## G1·4 পেশীর কার্য (Work of muscles)

আমাদের দেহ একটি মূর্তিমান যন্ত্র বিশেষ। ইহার পরিচালনার ব্যাপারে পেশীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। চলা ফেরা, শোয়া বসা, কথা বলা, হাত পা কাছে আনা, এ সকল কাজ পেশীর সাহায্যে দেহ করিয়া থাকে। পেশী এক রকমের জীবকোষ, যাহার মধ্যে অদ্ভুত রকমের সঙ্কোচনের ক্ষমতা (contractility) দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি সরু লম্বাকৃতির পেশীকোষ একত্র হইয়া একটি পেশীতন্তু রূপায়িত করে এবং অনেকগুলি পেশীতন্তু মিলিয়া একটি পেশী সৃষ্টি হয়। দেহের

FRONTAL BONE
MANDIBLE
CLAVICLE
ACROMION
CORACOID
STERNUM
HUMERUS
RIBS
ILIUM
ULNA
PUBIS
RADIUS
GREATER
TROCHANTER
METACARPAL
BONES
LESSER
TROCHANTER
PHALANGES
CARPAL BONES
PATELLA
TIBIA
METATARSAL
BONES
FIBULA
TARSAL BONES
PHALANGES
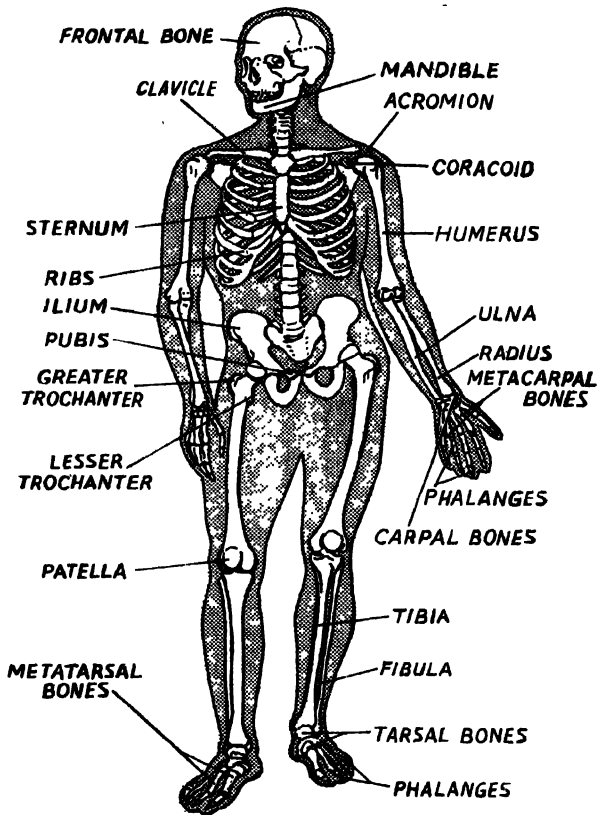
Fig. 4 নরকঙ্কাল

নানা জায়গায় পেশী আছে এবং তাহাদের আকৃতি ও ব্যবহারের তারতম্যে সমস্ত পেশীকে তিন ভাগ করা চলে :

(i) **ইচ্ছাধীন বা ঐচ্ছিক** (Voluntary muscles)

স্বেচ্ছায় এইসব পেশী সঞ্চালন করা যায়। হাত, পা, মুখে এই রকম পেশী আছে। এইসব পেশী সাদা কালো চিহ্নিত বলিয়া ইহাদের চিহ্নিত পেশী (Striated muscles) বলা হয়।

(ii) **স্বাধীন পেশী বা অনৈচ্ছিক পেশী** (Involuntary muscles)

স্বেচ্ছায় এইসব পেশী সঞ্চালন করা যায় না। পৌষ্টিক নালী, হৃৎপিণ্ডে এই রকম পেশী আছে। এইসব পেশী অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ইহাদের গায়ে সাদা কালো ডোরা চিহ্ন থাকে না। ইহারা অচিহ্নিত (Non-striated)।

(iii) **হৃৎপিণ্ডের পেশী** (Heart muscles)

এই পেশীর গঠনবৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহারা ইচ্ছাধীন না হইয়াও চিহ্নিত। ছোট ছোট কোষ দ্বারা ইহারা নির্মিত।
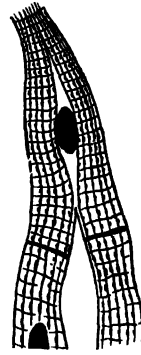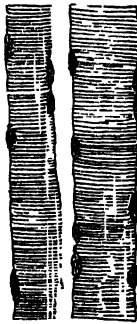
Fig. 5 ঐচ্ছিক পেশী Fig. 6 অনৈচ্ছিক পেশী Fig. 7 হৃৎপিণ্ডের পেশী

## G1·5 হাত ও পায়ের পেশী ( Attachment of arm and leg muscles )

হাত ও পায়ের পেশী মধ্যস্থানে মোটা হইয়া দুই প্রান্তে সরু হইয়া যায়। সরু প্রান্ত ভাগকে টেণ্ডন (tendon) বলা হয়। দুই দিকে সরু টেণ্ডন মাঝখানে হাড়ের উপর পেশীকে ধরিয়া রাখে।

(i) **হাতের প্রধান পেশীর** নাম বাইসেপ্‌স্‌ ও ট্রাইসেপ্‌স্‌। ইহারা যথাক্রমে হাতের উপরে ও নীচে রেডিয়াস ও আলনার সহিত সংযুক্ত। এইসব পেশীর
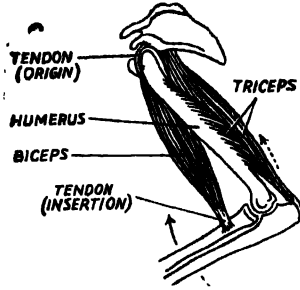
Fig. 8 হাতের পেশী

প্রান্তভাগ টেণ্ডন দ্বারা গঠিত। ট্রাইসেপ্‌স্‌ পেশীর সঙ্কোচন দ্বারা হস্তের প্রসারণ হয় এবং বাইসেপ্‌স্‌এর সঙ্কোচনের দ্বারা ভাঁজ হয়।

Fig. 9 আঙুলের কর্মক্ষমতা ভিতরের পেশী বিন্যাসের জন্য

(ii) **পায়ের প্রধান পেশীর** নাম কাফ-পেশী। ইহা উরুর অস্থি ফিমার ও গোড়ালির অস্থির সহিত টেণ্ডন দ্বারা সংযুক্ত। প্রতি পদক্ষেপে দেহের সমস্ত-ভার এই পেশী বহন করে।

## G2·1 পাচন তন্ত্র (Digestive system)

মানুষের দেহটি প্রতিদিন যে নানান কাজ করিয়া থাকে তাহা সম্ভব হয় দেহের ভিতরের শক্তির সাহায্যে। শক্তি ব্যয়িত হইলে দেহের ক্ষয় হয়। ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি

সাধনের জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। যে রকম খাদ্যই আমরা গ্রহণ করি না কেন তাহাতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি এই তিনটি উপাদান থাকা চাই। খাদ্য গ্রহণ করিলেই দেহ এইসব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের পৌষ্টিক নালীতে খাদ্যের পরিপাকপর্ব ঘটে ও সহজতর অংশে তাহা বিভক্ত হয়; যাহার ফলে খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ শোষিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে চলিয়া যায়। অপ্রয়োজনীয় অংশ নিষ্কাশিত হয়। খাদ্য গ্রহণের সময় পৌষ্টিক নালীতে রাসায়নিক কারখানার মত নানান রূপান্তর ঘটে। যকৃৎ অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি যন্ত্র পরিপাক ব্যাপারে সহযোগিতা করে।

## G2·2 মুখ-গহ্বর (Mouth)

মুখ-গহ্বর হইতে পৌষ্টিক নালীর সুরু। দুই চোয়ালের মধ্যে দাঁত ও জিহ্বা-বিশিষ্ট গহ্বর, যেখানে দুইবেলা আমরা হাতের সাহায্যে খাদ্য তুলিয়া দিয়া থাকি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ু পর্যন্ত একটি প্রায় ৩০ ফুট লম্বা নালী চলিয়া গিয়াছে। ইহা অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা সুরক্ষিত। মুখ-বিবরে খাদ্য আসিলে লালাগ্রন্থি হইতে লালারস নির্গত হয় ও পরিপাক ক্রিয়ার প্রথম পর্ব সুরু হয়।

## G2·3 দাঁত (tooth)

পূর্ণাঙ্গ মানুষের ৩২টি দাঁত থাকিবার কথা। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই মুখের ভিতরে একদম পিছনদিকে কষের দাঁত (আক্কেল-দাঁত) উঠে না। না উঠিলে দাঁতের সংখ্যা ৩২এর কম হয়। ছেলেবেলা মাড়ির উপর ও নীচে ১০টি দাঁত থাকে।
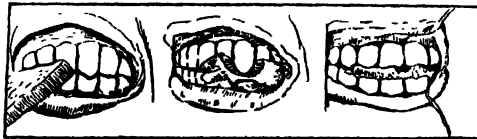
Fig. 10 খাদ্য গ্রহণে দাঁতের কাজ

ইহাদের দুধে-দাঁত (milk tooth) বলে। শৈশবের সময় দুধে-দাঁত পড়িয়া যায় ও স্থায়ী দাঁত (permanent tooth) গজায়। সামনের চারটি কৃন্তক (incisors), উহাদের পাশে একটি করিয়া ছেদক বা শ্বদন্ত (canine), তাহাদের পাশে দুইটি চর্বণ দন্ত (premolar) ও সব শেষে তিনটি করিয়া পেষক দন্ত (molar) থাকে।

উপরের মাড়িতে :

$$\frac{3}{\text{Colars}} \leftarrow \frac{2}{\text{P. molars}} \leftarrow \frac{1}{\text{Canine}} \leftarrow \frac{4}{\text{Incisor}} \rightarrow \frac{1}{\text{Canine}} \cdot \frac{2}{\text{P. molars}} \rightarrow \frac{3}{\text{Molars}} = 16$$

নীচের মাড়িতে : উপরের মত সমান সংখ্যক দাঁত =16

মোট 32টি

দাঁতের সাহায্যে খাদ্যকে গ্রহণের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়। ইনসিজার ও কেনাইন কাটে। প্রিমোলার চর্বণ করে। মোলার পেষণ করে।

## G2 ·4 জিহ্বা (Tongue)

জিহ্বা দ্বারা খাদ্যের টক, ঝাল, মিষ্টি, নোনতা রস আস্বাদন করিতে পারা যায়। জিহ্বার চারিদিকে অসংখ্য টেস্টবাড (taste bud) বসান আছে। খাবারের বিভিন্ন আস্বাদন এই সব টেষ্টবাড সাহায্যে আমাদের মনগোচর হয়। দাঁতের সাহায্যে খাদ্য পিষ্ট হইবার সময় জিহ্বা সর্বদা খাদ্যকে মুখের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে লইয়া যাইতে সাহায্য করে। খাদ্য পিষ্ট হইবার পর লালারসের মিউসিন (mucin) নামক পিচ্ছিল পদার্থ ও টায়ালিন (ptyalin) নামক জারক পদার্থের সহিত যাহাতে সংযোগ ঘটে, জিহ্বা তাহার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ খাবারের সহিত লালারসের মিশ্রণ ঘটায়।
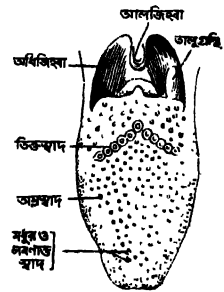
Fig. 11 জিহ্বা, আস্বাদনের যন্ত্র

মুখের ভিতর তিনটি করিয়া ছয়টি লালাগ্রন্থি আছে :

(i) প্যারটিড (parotid) লালাগ্রন্থি—কানের সম্মুখে অবস্থিত দুইটির নাম

(ii) সাবম্যাকসিলারি (submaxillary) লালাগ্রন্থি -নীচের চোয়ালের নীচে দুইটি গ্রন্থির নাম

(iii) সাবলিংগুয়াল (sublingual) লালাগ্রন্থি—জিহ্বার নীচে অবস্থিত দুইটি গ্রন্থির নাম।

লালারস মুখের ভিতর সিক্ত রাখে ও তৃষ্ণাবোধকে পরিহার করে। লালারসের টায়ালিন (ptayalin) খাদ্যের শ্বেতসার (strach) অংশকে মল্টোজে (maltose)এ রূপান্তরিত করে।

**G2 ·5 খাদ্যনালী**—কোনকিছু গিলিবার সময় খাদ্যনালীর প্রবেশ দ্বার খুলিয়া যায় এবং খাদ্যদ্রব্য ভিতরে প্রবেশ করে। খাদ্যনালীর সম্মুখে শ্বাসনালী অবস্থিত বলিয়া উহা অধিজিহ্বা (epiglottis) দ্বারা ঢাকা থাকে। খাওয়া ও নিঃশ্বাস লওয়ার পর্ব একই সময় যখন চলে তখন অধিজিহ্বা কোন কারণবশত ঠিক সময় যদি

বন্ধ না হয়, তাহা হইলে খাদ্যের কণা শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ফলে বিষম লাগে।
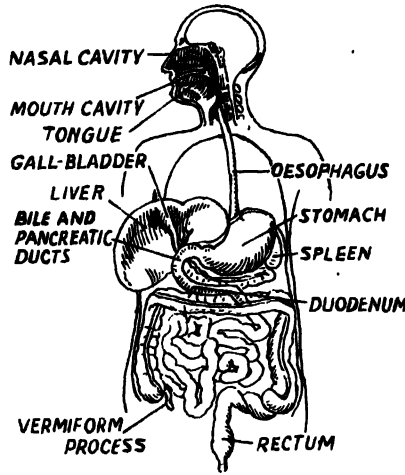
Fig. 12—খাদ্যনালী

**পাকস্থলী**—খাদ্যনালী উদর গহ্বরে অবস্থিত পাকস্থলীর এক অংশের সহিত মিলিত হয়। পাকস্থলীর এই অংশকে আগমদ্বার (cardiac end) বলে। অপর অংশে পাকস্থলী ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত যুক্ত আছে। উহাকে নির্গমদ্বার (pyloric end) বলে। পাকস্থলী দেখিতে অনেকটা থলির মত। সাধারণত ইহা সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে, খাদ্য দ্রব্য ইহার ভিতরে আসিলে উহা সম্প্রসারিত হয়। পাকস্থলীর গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি হইতে পাকস্থলীর জারক রস (gastric juice) নির্গত হয়। শতকরা $\frac{1}{2}$ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydrochloric acid) এবং পেপসিন (pepsin) ও রেনিন (renin) নামক দুইটি এনজাইম (enzyme) এই রসের প্রধান উপাদান। পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন অংশকে জীর্ণ করিয়া পেপটোন-এ পরিণত করে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যের সহিত আগত জীবাণু নষ্ট করে এবং ইহার অম্লগুণ পেপসিন ও রেনিনএর-কাজের সাহায্য করে। রেনিন দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করিলে পেপসিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা জীর্ণ হয়। পাকস্থলীর গাত্রের আন্দোলনের (peristalsis) ফলে খাদ্যদ্রব্য তরল হয়। খাদ্যদ্রব্য 4 ঘণ্টা পাকস্থলীতে থাকে। পাকস্থলীর নির্গমদ্বার চক্রাকার পেশীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পেশীর সম্প্রসারণের ফলে এই দ্বার খুলিলে তরল খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

G2 ·6 **ক্ষুদ্র অন্ত্র**—ইহা অত্যন্ত দীর্ঘ ( ২০ ফুট ) ও সরু নলের মত, ইহা উদর গহ্বরের নিম্নাংশে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিন অংশে বিভক্ত, উপরিভাগ ডুয়োডেনাম, মধ্যের অংশ ইলিয়াম ও শেষ অংশ জেজুনাম। খাদ্য শোষণ করিবার জন্য এই অংশের ভিতরে গায়ে অসংখ্য ভিলাই (villi) থাকে। ডুয়োডেনামে যকৃৎ ও পিত্তথলি হইতে আগত পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় হইতে আগত অগ্ন্যাশয় রস দ্বারা খাদ্যের পরিপাক হয়।

G2 ·7 **যকৃৎ (liver)**— ডায়াফ্রাম (diaphragm) এর নীচে উদরের ডান দিকে অবস্থিত। যকৃৎ আমাদের দেহের একটি প্রধান যন্ত্র। ইহা পিত্তরস উৎপাদন করে। পিত্তরস ছোট নলের দ্বারা ডুয়োডেনামে পৌঁছায়। অধিক পিত্ত পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে। ইহা ছাড়া যকৃৎ দেহের অনেক অন্য প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া থাকে। শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজে পরিণত হইয়া যকৃতে আসিলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে (glycogen) পরিণত হইয়া সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজন হইলে ইহা আবার গ্লুকোজে পরিণত হয়। যকৃৎ প্রোটিনের জীর্ণ অংশ অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acid)-কে গ্লুকোজে পরিণত করে। ইহা ছাড়া রক্তের কয়েকটি প্রোটিন উৎপাদনে ও সংরক্ষণে যকৃৎ অংশ গ্রহণ করে।

G2·8 **অগ্ন্যাশয় (pancreas)**—যকৃতের নলের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। অগ্ন্যাশয়ের রস ছোট ছোট নলের দ্বারা যকৃতের নলের মধ্য দিয়া ডুয়োডেনামে প্রবেশ করে। অগ্ন্যাশয় রসে ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ নামক তিন প্রকার এনজাইম থাকে। ইহা ছাড়া ইহাতে ইনসুলিন (insulin) নামক একটি পদার্থ প্রস্তুত হয় যাহা গ্লুকোজ দহনে সাহায্য করে।

খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া পৌঁছিলে পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রসের সহিত মিশ্রিত হয়। পিত্তরস ক্ষারক প্রকৃতির বলিয়া ইহা পাকস্থলীর রসের অম্লভাব নষ্ট করে এবং ক্ষারক প্রকৃতির অগ্ন্যাশয় রসের ক্রিয়ার সাহায্য করে। পিত্তরস স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাক ও শোষণে অংশ গ্রহণ করে। ট্রিপসিন প্রোটিন খাদ্যকে, লাইপেজ স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ও অ্যামাইলেজ শ্বেতসারকে জীর্ণ করে।

ইহার পর আন্ত্রিক রস (succus entericus) অবশিষ্ট পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এই রস ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে নির্গত হয়। আন্ত্রিক রসের সুক্রেজ (sucrase), ল্যাকটেজ (lactease) এবং ম্যালটেজ (maltase) প্রভৃতি জারক বিভিন্ন শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে এবং ইরেপসিন (erepsin) জারক প্রোটিনের জীর্ণ অংশ পেপটোন (peptone)কে অ্যামিনো অ্যাসিডে (amino acid) পরিণত করে। এইরূপে পরিপাকক্রিয়া সমাপ্ত হইলে খাদ্যের অংশগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অবস্থিত

ভিলাই (villi) দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তস্রোতে চলিয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে একটি ভিলাই (villi) র মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট রক্তনালী ও একটি ল্যাকটিয়েল (lacteal) নামক নালী দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালী মিলিত হইয়া বৃহৎ নালীর সৃষ্টি করে এবং ইহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য শরীরের মূল রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয়। রক্তের সঙ্গে খাদ্যের জীর্ণ অংশ দেহের সমস্ত কোষে আনীত হয়। জীবকোষ এই সমস্ত জীর্ণ অংশ হইতে দেহের অনুরূপ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন তাহার দেহের কারখানায় খাদ্য গ্রহণের ফলে এই রূপান্তর ঘটিয়া থাকে।

**G2 9 বৃহৎ অন্ত্র (large intestine)**—খাদ্যের অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্রে আসিলে অধিক জল ও কিছু গ্লুকোজ বৃহদন্ত্রের গাত্র দ্বারা শোষিত হয় এবং বাকী অংশ মলরূপে পরিত্যক্ত হয়। বৃহদন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ রেচনতন্ত্রে বলা হইয়াছে।

**G2 ·10 জারকের কার্যকারিতা (action of enzymes)**—রসায়ন বিদ্যায় অনুঘটকের (catalyst) কথা বলা হয়। জারক পদার্থ অনুঘটকের ন্যায় নিজে
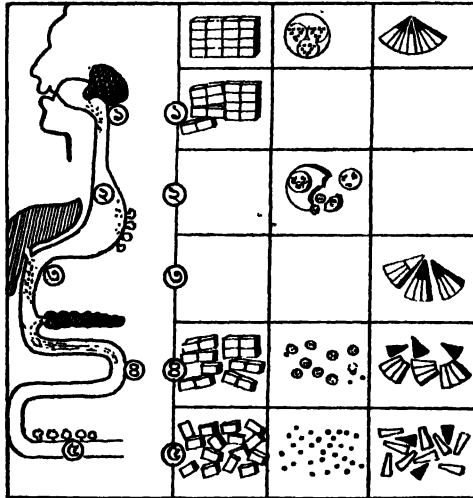
Fig. 13 খাদ্যনালীর ভিতর খাদ্যের বিভিন্ন অংশ জীর্ণ হয়

অপরিবর্তিত থাকিয়া অন্য পদার্থের পরিবর্তন ঘটায়। এই কারণে জারক পদার্থকে 'জৈব অনুঘটক' বলা হয়। একটি এনজাইম (enzyme) কেবল মাত্র এক প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। এইজন্য দেহে বহু প্রকার এনজাইম রহিয়াছে। খাদ্য পরিপাক ছাড়া দেহের অন্যান্য অনেক কাজে এনজাইম প্রয়োজন।

খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী জারকের গুণাগুণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

| উৎস | জারক | জারকের কার্য |
|---|---|---|
| লালা গ্রন্থি | টায়ালিন | শ্বেতসারকে মলটোজে পরিণত করে |
| পাকস্থলী | পেপসিন | প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে |
| | রেনিন | দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে |
| অগ্ন্যাশয় | ট্রিপসিন | প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে |
| | লাইপেজ | স্নেহজাতীয় খাদ্যকে গ্লিসারল ও ফ্যাটি এ্যাসিডে পরিণত করে |
| | অ্যামাইলেজ | শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে |
| ক্ষুদ্র অন্ত্র | সুক্রীয়েজ<br>ল্যাক্‌টিয়েজ<br>মলটেজ | শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে |
| | ইরেপসিন | পেপটোনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে। |

## G3 ·1 রেচন তন্ত্র (Excretory systems)

একজন সুস্থ মানুষের দেহে তাহার অজ্ঞাতসারে প্রতিনিয়ত নানারূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া চলিয়াছে। দেহের প্রয়োজনে যেমন আমরা খাদ্য গ্রহণ করিয়া শক্তি উৎপাদন করিতেছি, তেমনি এইসব প্রক্রিয়ার ফলে দেহে নানারূপ দূষিত পদার্থের উৎপত্তি হয়। এইসব দূষিত পদার্থ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় দেহ হইতে বাহির করিবার জন্য চর্ম, ফুস্‌ফুস, বৃক্ক ও বৃহদন্ত্র নানাভাবে রেচনতন্ত্রে কাজ করিয়া থাকে।

## G3 ·2 চর্ম (Skin)

দেহের উপরের পাতলা আবরণের নাম চর্ম। ইহার কিয়দংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে ইহার বিভিন্ন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দুইটি স্তরে গঠিত।

উপরের স্তর ( epidermis ) খুব পাতলা। এই স্তরের কোষগুলি ক্ষণস্থায়ী ; কিছু সময় পর-পর তাহা নষ্ট হইয়া যায়। চর্মের নিম্নস্তর হইতে নূতন করিয়া কোষ তৈরী হইয়া উপরের স্তর সৃষ্টি করে। এই স্তরে কোন রক্তনালী বা স্নায়ু থাকে না। এই স্তর ঘনীভূত ও শক্ত হইয়া নখ সৃষ্টি করিতে পারে। চর্মের নিম্নস্তর ( dermis ) অপেক্ষাকৃত পুরু। ইহাতে অসংখ্য শিরা, ধমনী, স্নায়ু প্রান্ত, ঘর্মগ্রন্থি থাকে। ঘর্মগ্রন্থি
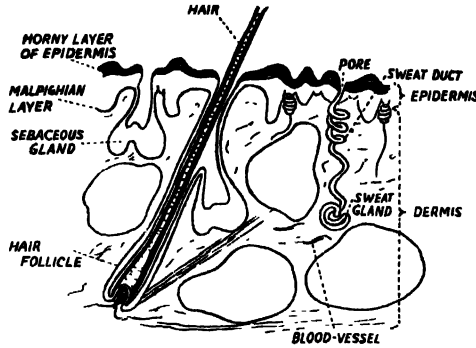
Fig. 14 ত্বকের কোষসমূহ

কুণ্ডলী-পাকান নলের ন্যায়। ইহার এক প্রান্ত উপচর্ম ভেদ করিয়া চর্মের বাহিরে ঘর্মকূপ রূপে উন্মুক্ত হয়। এই স্তরে অবস্থিত ছোট ছোট থলি হইতে কেশ উৎপত্তি হয় এবং লোমকূপের মধ্য দিয়া উপচর্ম ভেদ করিয়া চর্মের বাহিরে প্রসারিত হয়। ইহার সহিত অবস্থিত মেদগ্রন্থি ( sebaceous gland ) হইতে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া চর্ম ও কেশ তৈলাক্ত রাখে।

**দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন**—

ঘর্মগ্রন্থি রক্ত হইতে অধিক জল, লবণাক্ত পদার্থ ও কিছু ইউরিয়া নিষ্কাশন করিয়া ঘর্মরূপে বাহির করিয়া দেয়। চর্মের মধ্য দিয়া সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয় এবং অক্সিজেন গৃহীত হয়।

**চর্মের অন্যান্য কার্য**—

ইহা ছাড়া চর্ম দেহকে আবৃত রাখিয়া আঘাত ও জীবাণু আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

দেহের তাপ-সংরক্ষণও চর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রীষ্মকালে ঘাম হইয়া দেহ ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু শীতকালে ঘাম হয় না। চর্ম অনুভূতিশীল—শীত, তাপ, বেদনা ও স্পর্শ ইত্যাদি চর্মের মধ্যে অবস্থিত স্নায়ু-প্রান্ত দ্বারা গৃহীত হয়। তৈলাক্ত পদার্থ গায়ে মালিশ করিলে চর্ম দ্বারা শোষিত হয়।

## G3·3 ফুসফুস (Lungs)

দেহ পরিচালনার কাজে যে শক্তি ব্যয় হয় তাহার উৎস দেহের উত্তাপ। শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা দেহে অক্সিজেন গৃহীত হয়। এই অক্সিজেন দ্বারা দেহে মৃদু দহনকার্য সাধিত হয় এবং উত্তাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই দহনের ফলে কিছু
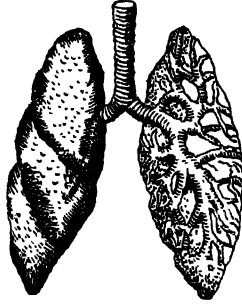
Fig. 15 ফুসফুস

কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক দূষিত গ্যাসীয় পদার্থও সৃষ্টি হয়। ফুসফুসে যাইয়া রক্ত এই কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে ও বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

### ফুসফুসের গঠন—

ফুসফুস সংখ্যায় দুইটি। বক্ষগহ্বরের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের উভয় পাশে তাহারা অবস্থিত। ফুসফুসের উপরে প্লুরা ( pleura ) নামক একটি পাতলা আবরণ থাকে। ডানদিকের ফুসফুস অপেক্ষাকৃত বড়। ডানদিকেরটি তিন খণ্ডে এবং বামদিকেরটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। দুইটি ফুসফুস শ্বাসনলের ( wind pipe ) সহিত যুক্ত। অধিজিহ্বার নিম্নে অবস্থিত ইহার উপরের অংশটির নাম স্বরযন্ত্র ( larynx )। ইহার দ্বারা আমরা কথা বলিতে পারি। ইহার নিম্নাংশ শ্বাসনল ( trachea ) বক্ষপঞ্জরে প্রবেশ করিয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া দুই ফুসফুসে প্রবেশ করিয়াছে। এই শাখার নাম ব্রংকাই ( bronchii )। প্রত্যেক ব্রংকাই ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া ছোট ছোট প্রশাখায় (bronchioles) বিভক্ত হয় এবং ইহারা ক্রমে ছোট হইয়া বায়ুথলি (alveolar sac) সৃষ্টি করে। এইরূপ অসংখ্য বায়ুথলিতে আবার অনেক বায়ুকোষ (alveoli) আছে। ইহাদের গাত্রে অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তনালী থাকে। বাতাস নাসারন্ধ্র ও শ্বাসনলের মধ্য দিয়া ফুসফুসে আসিলে এই বায়ুকোষ বায়ুপূর্ণ হয় এবং রক্তের সহিত গ্যাসের আদানপ্রদান হয়।

**শ্বাসকার্য :** শ্বাসগ্রহণ—বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরের মধ্যস্থিত মধ্যচ্ছদা (diaphragm), সঙ্কুচিত হইলে নিম্নমুখে প্রসারিত হয়। সেই সঙ্গে পাঁজরার পেশী সঙ্কুচিত হইলে উরঃফলক অগ্রসর হয়। ইহার ফলে বক্ষ স্ফীত হয় এবং বক্ষগহ্বরের
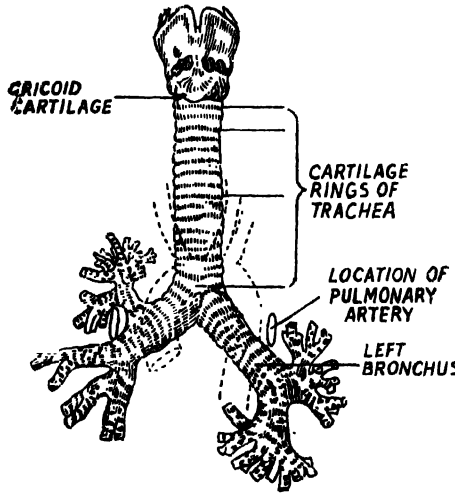
Fig 16. শ্বাসতন্ত্রের গঠন

আয়তন বৃদ্ধি পায়। সম্প্রসারিত অবস্থায় ফুসফুসের ভিতরে বায়ুচাপ হ্রাস পায় এবং বাহির হইতে বায়ু প্রবেশ করে। রক্ত বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

শ্বাসত্যাগ—স্থিতি-স্থাপকতার গুণে পেশীগুলি আবার প্রসারিত হয় এবং মধ্যচ্ছদা ও উরঃফলক পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসে। ইহার ফলে বক্ষগহ্বরের আয়তন ছোট হয় এবং ফুসফুস সঙ্কুচিত হয়। এইরূপে ফুসফুসের ভিতরে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পূর্ণ বায়ু বাহিরে চলিয়া যায়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের উঠানামা হয়। সুস্থ সবল মানুষ প্রতি মিনিটে ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে।

## G3·4 বৃক্ক ( Kidney )

পাচনতন্ত্রের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অধিক অ্যামিনো অ্যাসিড যকৃতে গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিড নামক দূষিত পদার্থের সৃষ্টি হয়। বৃক্ক দেহ হইতে এই দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করে। নিম্ন উদরে

মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুইটি বৃক্ক আছে। দুইটি বৃক্ক হইতে দুইটি নল (ureter বা গবিনী) নিম্নে অবস্থিত মূত্রাশয়ে প্রবেশ করিয়াছে। বৃক্কের মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইবার সময় এইসব দূষিত পদার্থ ও অধিক জল মূত্ররূপে পৃথক হইয়া যায় এবং ক্রমাগত মূত্রাশয়ে আসিয়া জমা হয়। মূত্রাশয় পূর্ণ হইলে মূত্রনালী দ্বারা মূত্র পরিত্যক্ত হয়।

Fig. 17 বৃক্ক ও মূত্রাশয়

## G3·5 বৃহৎ অন্ত্র

খাদ্যের অজীর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় অংশ ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহৎ অন্ত্রে প্রেরিত হয়। বৃহৎ অন্ত্র তিন অংশে বিভক্ত—সিকাম (caecum), কোলোন (colon), ও রেক্টাম (rectum)। সিকাম-এর সঙ্গে এপেনডিক্স (appendix) নামক একটি ছোট সরু নল যুক্ত থাকে। বৃহৎ অন্ত্রে কোনও রূপ পরিপাক ক্রিয়া হয় না। অধিক জল এবং অবশিষ্ট গ্লুকোজ শোষিত হয় এবং কোলন অংশে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ প্রেরিত হইলে জীবাণু (bacteria) দ্বারা মলে পরিণত হয়। মল রেকটামে সঞ্চিত থাকে এবং তাহা পায়ু হইতে পরিত্যক্ত হয়।
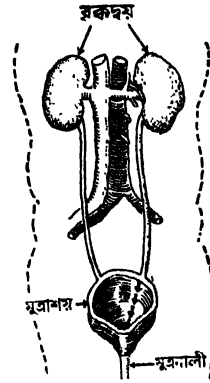
## G4·1 স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

ইহজগতে কেহ মানুষের সমকক্ষ নয়। তাহার জ্ঞান, গরিমা, বুদ্ধি, বিবেচনা এ সমস্ত কিছুই সম্ভব হইয়াছে তাহার মস্তিষ্কের সারবস্তুর প্রভাবে। তাহার সকল শক্তিমত্তার কারণ তাহার উন্নত ধরনের মস্তিষ্কের গঠন ও ক্ষমতার গুণ। এ পৃথিবীতে এমন কার্যকরী মস্তিষ্ক আর কোনও প্রাণীর মধ্যে নাই। স্নায়ুমণ্ডলী স্মৃতিকে বহন করে, বুদ্ধির নানান উন্মেষ ঘটায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে নির্দেশ দেয়। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্রের মত স্নায়ুমণ্ডল দেহের ভিতর কাজ করে, শরীরের দিকে দিকে সূক্ষ্ম তারের মত স্নায়ুমণ্ড অংশ পরিব্যাপ্ত আছে, যাহাদের রকমের খবর শরীরের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চকিতে অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলী দশকর্ম করাইবার মালিক, সমস্ত অ এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতির প্রাণকেন্দ্র।
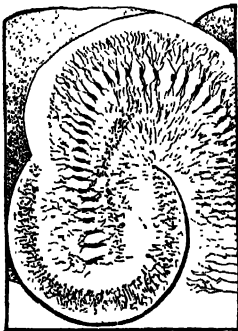
Fig. 18 মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী

## G4·2 স্নায়ুমণ্ডলীর বিভিন্ন অংশ

স্নায়ুমণ্ডলীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

(*i*) কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী (central nervous system)

(a) মস্তিষ্ক (brain) ও উহা হইতে পল্লবিত ১২ জোড়া স্নায়ুসূত্র (cranial nerves)।

(b) সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord) ও উহা হইতে উত্থিত ৩১ জোড়া স্নায়ুসূত্র (spinal nerves)। (ইচ্ছাধীন কার্য এই স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যথা চলাফেরা বসা, হাত পা চালান)

(*ii*) স্বতন্ত্র স্নায়ুমণ্ডলী (autonomic nervous system)

(a) এই স্নায়ুমণ্ডলীর সহিত কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর যোগ থাকিলেও শরীরের যে সকল ক্রিয়া ইচ্ছাধীন নয় (যথা রক্ত চলাচল, পরিপাক· ক্রিয়া ইত্যাদি) সেগুলি এই বিভাগীয় স্নায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

## G4·3 মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কার্য

মাথার খুলির মধ্যে অবস্থিত হইল মস্তিষ্ক বা মগজ। পূর্ণবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের ওজন প্রায় দেড় সের বা তিন পাউণ্ড। বৈজ্ঞানিকেরা মস্তিষ্ককে চারটি ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন—

গুরু মস্তিষ্ক (cerebrum)
লঘু মস্তিষ্ক (cerebellum)
সংযোজক মস্তিষ্ক (pons varolli)
সুষুম্না শীর্ষ (medulla oblongata)

গুরুমস্তিষ্ক মন ও বুদ্ধির কেন্দ্র। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সংজ্ঞার কেন্দ্র। দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভূতির (sensory centre) জন্য মস্তিষ্কের প্রত্যেক দিকে এক একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র নির্দিষ্ট আছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে পরিচালনা করিবার কেন্দ্রও (motor centre) গুরু মস্তিষ্ক। গুরু মস্তিষ্কের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে মস্তিষ্কের নির্দেশক কেন্দ্রগুলি উহার আজ্ঞাধীন অঙ্গের উল্টাদিকে অবস্থিত। অর্থাৎ মানুষের দক্ষিণ অঙ্গের কেন্দ্র থাকে মস্তিষ্কের বাম দিকে এবং বাম অঙ্গের কেন্দ্র থাকে মস্তিষ্কের দক্ষিণ দিকে। মস্তিষ্কের উপরের স্তরে ধূসর পদার্থ (grey matter) ও ভিতরের স্তরে শ্বেত পদার্থ (white matter)

দ্বারা গঠিত। শ্বেত পদার্থ অপেক্ষা ধূসর পদার্থের গুরুত্ব বেশী। পরিসর বিস্তৃতির জন্য ধূসর পদার্থের স্থানে স্থানে কুঞ্চন (convolution) আছে। মানুষের মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের যত বেশী কুঞ্চন থাকে অন্য কোন জীবের তাহা নাই।

লঘু মস্তিষ্ক শরীরের সমতা (balance) রক্ষা করে। এই অংশ রোগগ্রস্ত হইলে মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না এবং দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেও ঢলিয়া পড়িয়া যায়।
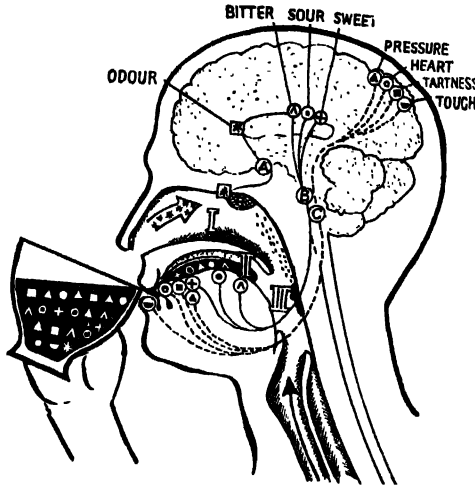
Fig. 19 মস্তিষ্কের অনুধাবন কেন্দ্রসমূহ

সুষুম্না নামক অংশটি রক্ত চলাচল ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াসমূহের মূল কেন্দ্র। এই অংশে আকস্মিক আঘাত লাগিলে শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। সুষুম্না-শীর্ষ হইতে নির্গত হইয়া সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord) মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া শরীরের নীচে নামিয়া গিয়াছে।

## G4 ·4 স্নায়ু (nerve) কোষ

জীবদেহ যেমন অসংখ্য জীবকোষ দ্বারা গঠিত স্নায়ুমণ্ডলীও সেইরূপ অসংখ্য স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। শরীরের অন্যান্য কোষের ন্যায় স্নায়ুকোষে জীবপঙ্ক (protoplasm) ও প্রাণপঙ্ক (nucleus) আছে তবে নার্ভকোষের বিশেষত্ব এই যে উহার জীবপঙ্ক হইতে সরু সূতার মত অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির হয়। ইহাদের মধ্যে যে শাখাটি সবাপেক্ষা দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখাশূন্য তাহার নাম অ্যাক্সন

(axon)। এই অ্যাক্সন হইতে স্নায়ু তন্ত্রী (nerve fibre) প্রস্তুত হয় এবং বহু কোষের তন্ত্রী মিলিয়া এক একটি স্নায়ু তৈরী হয়। কোষের জীবপঙ্ক হইতে উদ্ভূত অপর শাখাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট, ইহাকে ডেনড্রাইট (dendrite) বলে। এক কোষের ডেনড্রাইটগুলি অন্য কোষের ডেনড্রাইটের সহিত জড়ান অবস্থায় থাকে এবং উহাদের দ্বারা কোষ হইতে কোষে চেতনার আদান-প্রদান হয়।
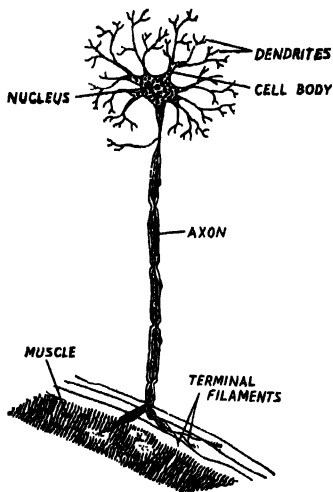
Fig. 2J নার্ভকোষ

অনেকগুলি স্নায়ুতন্ত্রী একত্রিত করিয়া এক একটি গুচ্ছ তৈরী হয়। এইরূপ অনেকগুলি গুচ্ছ লইয়া গড়িয়া ওঠে 'স্নায়ু'। প্রত্যেক স্নায়ুর মধ্যে দুই জাতীয় তন্ত্রী আছে। কতকগুলি তন্ত্রী বাহির হইতে কেন্দ্র অভিমুখে বার্তা বহন করে। এগুলিকে বলা হয় অন্তর্বাহী (afferent) এবং কতকগুলি তন্ত্রী কেন্দ্র হইতে বাহির অভিমুখে বার্তাবহন করে—এগুলিকে বলা হয় বহির্বাহী (efferent)। একটি স্নায়ু তন্ত্রী কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট দিকেই বার্তা প্রবাহ পাঠাইতে পারে—সেই নির্দিষ্ট দিকের বিপরীত দিকে নয়। সেইজন্য বহির্বাহী তন্ত্রীকে চেষ্টাবহ (motor) এবং অন্তর্বাহী তন্ত্রীকে সংজ্ঞাবহ (sensory) স্নায়ু বলা হয়।

স্নায়ু মাত্রই নানা জাতীয় তন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত। ইহার মধ্যে মস্তিষ্কের কোষের তন্ত্রী, মেরুমজ্জার তন্ত্রী এমন কি স্বতন্ত্র স্নায়ুর তন্ত্রীও থাকিতে পারে। আপন আপন কোষ হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন তন্ত্রী একটি স্নায়ুর মধ্যদিয়া যাত্রা সুরু করে এবং গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রত্যেক তন্ত্রীই আপন আপন বিস্তৃতি (endplate) রচনা করিয়া সমাপ্ত হয়।

## G4·5 নার্ভের ক্রিয়া

(i) **প্রতিবর্ত ক্রিয়া**—স্নায়ু দিয়া স্নায়ু প্রবাহ (nerve impulse) সেকেণ্ডে ৪০০ শত ফুট গতিতে প্রবাহিত হয়। এই গতিবেগের তারতম্য ঘটিতে পারে। অনুভূতির আবেশ ডেনড্রাইট বহিয়া স্নায়ুকোষে পৌছায়। কোষ মধ্যে অনুভূতির আবেশ কর্ম প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়। কর্ম প্রেরণা অ্যাক্সনের মধ্য দিয়া পেশীতে পৌছায়। পেশীর সঙ্কোচন এই কর্ম প্রেরণা দ্বারা সাধিত হয়।

স্নায়ু উদ্দীপনের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নাই। বলা হয় যে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের সহিত ইহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে, যদিও ইহা তড়িৎপ্রবাহের মত দ্রুতগামী নয়। আবার কেহ কেহ বলেন স্নায়ু উদ্দীপনের মূলে রহিয়াছে রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

(ii) **প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া**—(reflex action) ইহার অর্থ অজ্ঞাতসারে সাড়া দেওয়া। কোন নিদ্রিত ব্যক্তির পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিলে সে তৎক্ষণাৎ পা টানিয়া লয়। অথচ সে ঘুমন্ত অবস্থায় না জানিয়াই উহা করিতেছে। ইহাই প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। মস্তিষ্কের সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে ইহা সংঘটিত হয়। মস্তিষ্কের নীচে সুষুম্না কাণ্ডে এই ক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র কেন্দ্র আছে।

মস্তিষ্কের সহিত ঐ ক্রিয়ার যোগ সময়ে সময়ে দেখা যায় এবং প্রয়োজন হইলে মস্তিষ্ক ইহাকে নিরস্ত করিতে পারে। জাগ্রত ব্যক্তির পায়ে সুড়সুড়ি দিলে সে না চমকাইয়াও চাঞ্চল্য দমন করিতে পারে। অজ্ঞাতসারে প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, কিন্তু জ্ঞাতসারে ইহাকে দমন করা যায়। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া সাধারণত দুই প্রকারের হইয়া থাকে—আয়ত্তের অধীন নয় (unconditioned) এবং আয়ত্তের অধীন বা অভ্যাস সাপেক্ষ (conditioned)

## G4·6 সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়সমূহ (sense organs)

বহির্জগতের সহিত মানুষের অন্তর্জগতের যোগ নিরবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। নানা উদ্দীপনা ও আবেগ শরীরের ভিতর আসিয়া প্রতিফলিত হয়। যে সব ইন্দ্রিয় এই আবেগকে মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দেয় তাহাদের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক আমাদের শরীরের প্রধান প্রধান বোধেন্দ্রিয়।

(i) **চক্ষু** (eye)—যে সকল অনুভূতির দ্বারা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৩টি দর্শনেন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। অন্তর্বাহী স্নায়ুসমূহের মধ্যে নেত্রস্নায়ু আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। নেত্রস্নায়ু চক্ষু গোলককে মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত করে।

চক্ষু দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। ইহার গঠন সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। চক্ষুর গঠন-কৌশল বুঝাইবার জন্য উহাকে ক্যামেরার (camera) সহিত তুলনা করা হয়। আসলে চক্ষুর আদর্শ লইয়াই ক্যামেরার উদ্ভাবন হইয়াছে।

Fig. 21 দর্শনেন্দ্রিয়

সম্পূর্ণ চক্ষু যন্ত্রটির নাম নেত্র গোলক। নেত্র গোলক করোটির অক্ষি কোটরের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। ইহার বাহিরের অংশটিই কেবল মাত্র দৃশ্যমান।

নেত্র গোলক উপর ও নীচে হইতে উত্থিত দুইটি পর্দা ( eye lid ) দ্বারা আবৃত। নেত্র পল্লব মুহুর্মুহু উঠা নামা করে। নেত্র পল্লবের নীচে থাকে অশ্রুগ্রন্থি। এই অশ্রু-গ্রন্থির জল চক্ষুকে সর্বদা স্নাত রাখে।

সমগ্র নেত্র গোলকটি উপর্যুপরি তিন প্রস্থ পর্দায় নির্মিত :

সর্বাপেক্ষা বাহিরের পর্দাটির নাম শ্বেত মণ্ডল (sclerotic)। শ্বেতবর্ণ ও অস্বচ্ছ এই পর্দাটি মজবুত তন্তু দ্বারা নির্মিত। চক্ষু তারকার সম্মুখে উহার যেটুকু অংশ আছে তাহা কাঁচের মত স্বচ্ছ এবং এই বিশেষ অংশটির নাম কর্নিয়া (cornea) বা অচ্ছোদপটল।

দ্বিতীয় পর্দাটির নাম কৃষ্ণ মণ্ডল ( choroid ), উহার ভিতরের দিক কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। উহার যে অংশটুকু কর্নিয়ার ঠিক পশ্চাতে থাকে, তাহার স্বতন্ত্র নাম আইরিস (iris) বা কনীনিকা। কনীনিকা অসংখ্য বৃত্তাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত। ইহার সামনের দিকে যে ছিদ্রটি আছে তাহাকে বলা হয় মণি (pupil)। কনীনিকার ঠিক পশ্চাতে কাঁচের ন্যায় যে স্বচ্ছ বস্তুটি বন্ধনীর (suspensory ligament) দ্বারা দুই প্রান্ত হইতে আলম্বিত তাহার নাম চক্ষু লেন্স (lens)। ইহা কয়েক স্তর স্বচ্ছ অথচ কঠিন পদার্থের সমাবেশে গঠিত।

সর্বাপেক্ষা ভিতরকার পর্দাটির নাম রেটিনা বা অক্ষিপট। ইহাই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। এই সূক্ষ্মতম পর্দাটি মাত্র তারকার দুই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে অসংখ্য স্নায়ু কোষ (rods cones) পাশাপাশি ভাবে সজ্জিত থাকে।

## কেমন করিয়া দেখা যায়

চোখ একটি সজীব ক্যামেরা বিশেষ। বৃহৎ, ক্ষুদ্র, দূরতম বা নিকটতম বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি রেটিনাতে আসিয়া পড়িলেই তবে উহা দেখা যাইবে। বন্ধনীর (suspensory ligament) সাহায্যে লেন্সটি সময় মত আঁট বা আলগা হইলে উহার কুব্জতা (convexity) বাড়িয়া বা কমিয়া যায়। এই কুব্জতার তারতম্য ঘটাইয়া লেন্সই দৃশ্য বস্তুর প্রতিচ্ছবি রেটিনাতে ফেলে। লেন্সের দ্বারা যে প্রতিবিম্ব প্রস্তুত হয় তাহা রেটিনাতে উল্টা হইয়া প্রতিফলিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক পুনরায় উহাকে সোজা করিয়া দেখিতে সাহায্য করে। ( ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

দুই প্রকার জলীয় পদার্থ চক্ষুর ভিতরে থাকিয়া লেন্সের কাজে সাহায্য করে। নেত্র গোলকের ভিতরটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। এই ফাঁকা স্থানটি লেন্স দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। কর্নিয়া ও লেন্সের মধ্যবর্তী অপরিসর স্থানটিতে যে জলীয় পদার্থ থাকে তাহার নাম (aqueous humour)। লেন্সের পশ্চাত দিকের ফাঁকা জায়গাটি যে

জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে তাহার নাম vitreous humour। দুই প্রকার জলীয় পদার্থই প্রতিবিম্বকে প্রতিফলিত করে ও চক্ষুর ভিতরকার চাপ (tension) রক্ষা করে। চক্ষুর পুষ্টিতে ইহাদের অবদান আছে এ কথাও কেহ কেহ মনে করেন।

(ii) **কর্ণ** ( ear )—কর্ণ শ্রবণ শক্তির ইন্দ্রিয়। কান শব্দ গ্রহণ করিবার যন্ত্র মাত্র; ইহা দ্বারা শব্দ শোনা যায় না। কান দ্বারা গৃহীত সংবাদ স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হইলেই শ্রবণ চেতনার উন্মেষ হয়। মাথা দিয়া আমরা শ্রবণ করি।

কর্ণের তিনটি ভাগ—(১) বহিঃকর্ণ ( external ear )
(২) মধ্য কর্ণ ( middle ear )
(৩) অন্তঃ কর্ণ ( internal car )

(১) **বহিঃকর্ণ**—মাথার দুই পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত এবং চামড়া দ্বারা আবৃত। মোটামুটি ভাবে ইহা পিনা (pinna), কর্ণ রন্ধ্র ( auditory meatus ) ও কর্ণ পটহ ( ear drum ) এই তিন অংশ লইয়া গঠিত। কর্ণ রন্ধ্রের গোড়ার দিকে কিছু লোম থাকে এবং ভিতর অংশে অনেক ছোট ছোট গ্রন্থি ( gland ) থাকে। উহাদের নিঃসরণকে খোল ( wax ) বলে। লোম এবং খোল উভয়েরই উপকারিতা আছে। উহারা ছোট ছোট পোকামাকড় ও রোগ জীবাণুকে নিবারিত করে। বহিঃকর্ণ শব্দ সংগ্রহ করে।
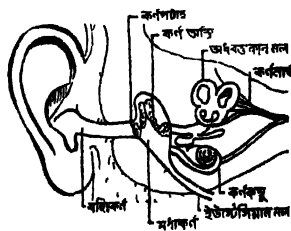
Fig. 22 শ্রবণ-ইন্দ্রিয়

(২) **মধ্যকর্ণ**—ইহা খুলির হাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার বাহিরের দিকে কর্ণ পটহ ও ভিতরের দিকে ঝিল্লী-নির্মিত আর একটি পটহ। এই দুই পটহের অন্তরালবর্তী স্থানে তিনটি পরস্পর সংলগ্ন হাড়ের লাঠি (ossicle) আছে। বাহিরের হাওয়ার সহিত মধ্য কর্ণের যোগ আছে। মধ্য কর্ণ হইতে একটি সরু নালী

(eustachian tube) বাহির হইয়া সরাসরি গলায় গিয়া উন্মুক্ত হইয়াছে। এই পথ দিয়া মধ্য কর্ণে গলার বায়ু প্রবেশ করিতে পারে।

(৩) **অন্তঃকর্ণ**—ইহাও খুলির হাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ভিতরকার গঠন সূক্ষ্ম ও জটিল বলিয়া ইহার অপর নাম গোলক ধাঁধা (labyrinth)। ইহার পশ্চাৎদিকে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রণালী (semi circular canal) তিনটি বিভিন্ন দিক দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া মধ্য স্থলে মিলিত। ইহাদের সমস্তগুলিই জলীয় পদার্থে পূর্ণ। এই প্রণালীগুলি ভিতর কর্ণে অবস্থিত হইলেও এগুলি শ্রবণের যন্ত্র নয়। ইহাদের দ্বারা শরীরের ভারসাম্য (posture) রক্ষিত হয়।

**কেমন করিয়া শোনা যায়**—প্রকৃত শ্রবণ যন্ত্রটির নাম কর্ণকম্বু ( cochlea ), ইহাকে দেখিতে শামুকের মত। এই কর্ণকম্বুর মধ্য দিয়া একটি পর্দা ( basement membrane ) নীচে হইতে উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্দা গোড়ার দিকে সূক্ষ্ম ও হ্রস্ব তন্তু ও শেষের দিকে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর তন্তু দ্বারা গঠিত। এই পর্দার উপর স্নায়ুকোষগুলি স্তরে স্তরে সাজান থাকে। এই কোষগুলি হইতে উদ্ভূত স্নায়ুসমূহ একত্রে মিলিত হইয়া শ্রুতি-স্নায়ু ( auditory nerve ) গঠন করে।

পর্দার বিভিন্ন তন্তুগুলি ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাঁধা এবং উহারা অনেকটা সেতার যন্ত্রের তরফের তারের মত। সেতারে যে কোন সুরই বাজানো যাক, অনুরূপ সুরের তারটি যেমন আপনা আপনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, সেইরূপ কানে যে সুরই আসুক ভিতরের পর্দার ঐ সুরে বাঁধা বিশেষ তন্তুটি তাহার আঘাতে স্পন্দিত হইয়া উঠে। উহার সহিত লাগানো স্নায়ুকোষগুলি ঐ স্পন্দনের চেতনা গ্রহণ করিয়া স্নায়ুতন্ত্রীর দ্বারা উহাকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। শব্দ শুনিবার এই তথ্যটি হেল্‌ম্‌হোল্টজ (Helmholtz)এর আবিষ্কার।

**(iii) নাসিকা (nose)**—মুখ-মণ্ডলের সম্মুখ ভাগের উৎক্ষিপ্ত অংশটির নাম নাসিকা। ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ইহার সম্মুখ ভাগ তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। দুইটি নাসারন্ধ্র ( nostril ) একটি তরুণাস্থি দ্বারা বিভক্ত। নাসারন্ধ্র হইতে মুখ-গহ্বর পর্যন্ত ত্রিকোণাকার গহ্বরটির নাম নাসাপথ ( nasal passage ) নাকের অভ্যন্তর

ভাগ শ্লেষ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। এই শ্লেষ ঝিল্লীর তলায় অসংখ্য স্নায়ুকোষ আছে। এই স্নায়ুকোষ হইতে নির্গত স্নায়ুসমূহদ্বারা ঘ্রাণের অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছায়।

(iv) **জিহ্বা (tongue)**—মুখের অভ্যন্তরে অবস্থিত এই ইন্দ্রিয়টি কেবলমাত্র বাক্য উচ্চারণে সহায়তা করে না। ইহা দ্বারা খাদ্যবস্তুর আস্বাদ অনুভব করা যায়। জিহ্বা অসংখ্য মাংসপেশী দ্বারা গঠিত এবং শ্লেষ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। ইহার উপর অসংখ্য গুটিকা ( papillae ) আছে। ইহাদের সাহায্যেই বিভিন্ন প্রকার স্বাদ গ্রহণ করা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে জিহ্বার সম্মুখের দিকের গুটিকা দ্বারা মধুর ও লবণাক্ত স্বাদ, দুই পাশের গুটিকা দ্বারা অম্লস্বাদ ও পিছনের দিকের গুটিকার দ্বারা তিক্তস্বাদ অনুভব করা যায়।

(v) **স্পর্শেন্দ্রিয় (skin)**—শরীরের স্পর্শেন্দ্রিয় বা স্পর্শকোষ (touch corpuscle)গুলি অধিত্বকের (dermis) শৃঙ্গগুলির উপর অবস্থিত। শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা করতলে অঙ্গুলি প্রান্তে ও ওষ্ঠে অধিক সংখ্যায় স্পর্শকোষ থাকে। সেইজন্য আঙ্গুলের সাহায্যে অতি মৃদু স্পর্শানুভূতি স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। এই সমস্ত স্পর্শকোষ হইতে অন্তর্বাহী স্নায়ুসমূহ দ্বারা সংজ্ঞা পরিবাহিত হয়। নানারূপ অনুভূতি গ্রহণের জন্য অধিত্বকের শৃঙ্গগুলির উপর নানারূপ স্পর্শকোষ আছে। ইহাদের মধ্যে হীট স্পট (heat spot, যাহার দ্বারা তাপ অনুভব করা যায়), কোল্ড স্পট (cold spot, যাহার দ্বারা শীতলতা অনুভব করা যায়) ও পেইন স্পট ( pain spot, যাহার দ্বারা ব্যথা অনুভব করা যায় ) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

## G5 ·1 খাদ্য ( food )

জীবনধারণের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন খাদ্যের। খাদ্যের জন্যই জীবজগতে এত হানাহানি। খাদ্য জীবনীশক্তির উৎস। একটি প্রদীপ যেমন তৈল ছাড়া জ্বলিতে পারে না সেইরূপ খাদ্য ছাড়া জীবনদীপও নিভিয়া যায়। জীবিত প্রাণী মাত্রই প্রতিনিয়ত শক্তিক্ষয় করে। আর এই ক্ষয় পূরণ করে খাদ্য। খাদ্য ও শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে যাহা খাওয়া যায়, তাহাই খাদ্য নহে। যাহা খাইলে জীবন রক্ষা সম্ভব তাহাই খাদ্য।

## G5 ·2 খাদ্য জীবনীশক্তির উৎস

পূর্বে বলা হইয়াছে খাদ্য মানুষের শক্তির উৎস। এই খাদ্যের উপাদান বিভিন্ন এবং ইহাদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়।

## G5 ·3 খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ

সাধারণ ভাবে খাদ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—আমিষ (animal food) ও নিরামিষ ( plant food )। এই শ্রেণী বিভাগ অপেক্ষা খাদ্যকে রাসায়নিক মতে দুই ভাগে ভাগ করাই শ্রেয় ও যুক্তিযুক্ত। রাসায়নিক মতে খাদ্যকে দুই ভাগ করিলে দাঁড়ায়—নাইট্রোজেনযুক্ত ( nitrogenous ) ও নাইট্রোজেনবিহীন ( non-nitrogenous ) খাদ্য।

খাদ্য বিজ্ঞান অনুসারে খাদ্যের ক্রিয়ার প্রাধান্য অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে :

(i) **প্রোটিন** (protein) বা নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্য। মাছ, মাংস, ডিম,

Fig. 23 প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

ছানা ইত্যাদি জান্তব পদার্থ এবং শুঁটি, বরবটি, মটর ইত্যাদি উদ্ভিদ পদার্থ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য।

(ii) **কার্বোহাইড্রেট**—চিনি বা শর্করা জাতীয় খাদ্য (**carbohydrate**)—

| | | | |
|---|---|---|---|
| গুড় | | ডাল | |
| মধু | | চাল | |
| মিছরি | | চিনি | |
| কাঁচা-কলা | | সুজি | |
| মান-কচু | | আটা | |

Fig. 24 কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য

যাবতীয় শস্য ও শস্যবীজ, চাল, যব, গম, সাগু, এরারুট, চিনি, আলু এই পর্যায়ভুক্ত।

(iii) **ফ্যাট বা স্নেহ খাদ্য (fat)**—ঘৃত, চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তৈলসমূহ এই পর্যায়ভুক্ত।

Fig. 25 ফ্যাট জাতীয় খাদ্য

(iv) **লবণাদি খনিজ পদার্থ (salts)**—সাধারণ লবণ ছাড়াও খনিজ নানা প্রকার ধাতু শরীর রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, আইওডিন, লৌহ, ফসফরাস প্রভৃতি খনিজ ধাতু এই শ্রেণীভুক্ত।

| দুধ | | ফল | |
|---|---|---|---|
| শাক-সব্জি | | ডিম | |
| তরকারি | | মাছ | |

Fig. 26 লবণাদি খনিজ খাদ্য

(v) **জল (water)**—জল মানব শরীরের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। শরীরে প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ জল। খাদ্য বস্তুকে তরল করা ছাড়াও শরীরের দূষিত পদার্থকে ইহা বাষ্প গ্যাস ও মূত্র রূপে নিষ্কাশিত করে।

(vi) **ভিটামিন (vitamins)** বা খাদ্যপ্রাণ—পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে কোন প্রাণীকে যদি উপরের উপাদানগুলি ভিটামিন ছাড়া বিশুদ্ধ অবস্থায় খাইতে দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই প্রাণী বাঁচিতে পারে না। সাক্ষাৎ ভাবে শক্তি না জোগাইলেও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভিটামিন নানা প্রকারের। বর্তমানে এই ভিটামিনকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। অদূর ভবিষ্যতে আরও অজানা ভিটামিনের আবিষ্কার হইতে পারে।

ভিটামিনের শ্রেণী বিভাগ :—

(1) **ভিটামিন A**—দৃষ্টি শক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয়। দুধ, মাখন, ডিম, যকৃতের তৈল ( কড মাছের ) প্রভৃতির মধ্যে বিদ্যমান। বাঁধা কপি, পালং শাক, গাজর প্রভৃতির মধ্যেও অল্পাংশে পাওয়া যায়।

| দুধ | | ঘি | |
|---|---|---|---|
| কডলিভার তেল | | গাজর | |
| দই | | পালং শাক | |
| মাখন | | মটর শুঁটি | |

Fig. 27 ভিটামিন A

(2) **ভিটামিন $B_1$**—স্নায়ুসমূহের পুষ্টি সাধন করে। চাল, ডাল ও অন্যান্য শস্যের উপরকার খোসায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

| আটা | | ঢেঁকি-ছাটা চাল | |
|---|---|---|---|
| ডাল | | কাঁচা কলা | |
| ডিম | | আলু | |
| মাছের মাথা | | গাজর | |

Fig. 28 ভিটামিন B

(3) **ভিটামিন $B_2$**—চর্মরোগ ও পেলাগ্রা নামক রোগ নিরোধ করে। পূর্বোক্ত খাদ্যগুলিতে ইহা পাওয়া যায়।

(4) **ভিটামিন C**—অযথা রক্তপাত ( মাড়ি দিয়া ), স্কার্ভি নামক রোগ প্রতিরোধ ও রক্তের ঘনত্ব বাড়াইবার জন্য ইহার প্রয়োজন;

টাটকা শাক সবজি ও ফলে বিশেষ করিয়া টোম্যাটো, লেবু, আম, কলা প্রভৃতিতে এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে।

Fig. 29 ভিটামিন C

(5) **ভিটামিন D**—হাড়, দাঁত গঠন ও ক্যালসিয়াম হজমের জন্য ইহার প্রয়োজন, শিশুদের রিকেটস নামক রোগ প্রতিরোধক। যকৃতের তৈল (কড় মাছের) ও মুরগীর ডিমের হলদে অংশে ইহা পাওয়া যায়। সূর্যরশ্মি দ্বারা এই ভিটামিন আপনাআপনি শরীরের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে।

6) **ভিটামিন E**—স্ত্রীলোকের প্রজনন ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়। লেটুস শাক, ভুট্টা ও ডিমে ইহা পাওয়া যায়।

## G5·4 খাদ্যের শক্তি-মূল্য

খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ হইতে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এক বা দুই প্রকার খাদ্য দ্বারা সুচারুরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে হইলে সকল শ্রেণীর খাদ্যই যথাযথ ভাবে খাওয়া প্রয়োজন।

কোন্ খাদ্যের কতখানি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইলে খাদ্যের শক্তি-মূল্য সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। খাদ্যের শক্তি-মূল্য হিসাব করা হয় উহার তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা দেখিয়া। সকল খাদ্যই শরীরের মধ্যে গিয়া অক্সিজেনের সাহায্যে দহিত (combustion) হয় এবং কোন খাদ্যের দ্বারা কতখানি তাপ উৎপন্ন হয় তাহা যন্ত্রের সাহায্যে মাপা সম্ভব। এই যন্ত্রের নাম ক্যালোরিমিটার (calorimeter) এবং এই তাপের এককের নাম ক্যালোরি (calorie)।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে—

১ গ্রাম প্রোটিনের শক্তি-মূল্য— ৪'১ ক্যালোরি
১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের শক্তি-মূল্য—৪'১ ক্যালোরি
১ গ্রাম ফ্যাটের শক্তি-মূল্য— ৯'৩ ক্যালোরি

## G5 ·5 খাদ্যের প্রয়োজন (food needs)

খাদ্যের পরিমাণ উহার ওজনের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে উহার শক্তি-মূল্যের উপর। কতখানি খাদ্য খাওয়া উচিত তাহা ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ দেখিয়া ঠিক করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের তাপ শক্তির প্রয়োজনীয়তা নিম্নোক্ত রূপ :

| | | |
|---|---|---|
| বসিয়া থাকিলে | প্রয়োজন ২৫০০ | ক্যালোরি |
| সামান্য পরিশ্রম করিলে | „ ৩০০০ | „ |
| সাধারণ „ „ | „ ৩৫০০ | „ |
| কঠিন „ „ | „ ৪০০০ | „ |

**প্রমাণ ব্যক্তির খাদ্য**—হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যহ ২৫০০ হইতে ৩০০০ ক্যালোরি শক্তিদায়ক খাদ্য গ্রহণ করা স্বাস্থ্য-সম্মত। এই খাদ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য নিম্নোক্তরূপ আহার্য বস্তু প্রয়োজন :

(i) প্রোটিন—৬৫ গ্রাম
(ii) চর্বি—৬০ গ্রাম
(iii) কার্বোহাইড্রেট—৩৫০ গ্রাম
(iv) ফসফরাস—১ গ্রাম
(v) ক্যালসিয়াম—০'৬৮ গ্রাম
(vi) লোহা—২০ মিলিগ্রাম
(vii) ভিটামিন
এ—৩০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট
বি—৩০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট
সি—৩০ মিলিগ্রাম
ডি—পরিমাণ মত

## G5 ·6 সুষম খাদ্য (balanced diet)

শরীরের ক্ষয় পূরণ, পুষ্টি ও উপযুক্ত পরিমাণ তাপশক্তির সৃষ্টির জন্য খাদ্যের ছয়টি উপাদান যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা উচিত। যে আহার্যে খাদ্যের ঐ ছয়টি উপাদান উপযুক্ত ভাবে থাকে তাহাকে সুষম খাদ্য বলে। দেশভেদে, ঋতুভেদে ও

বৃত্তিভেদে খাদ্যের পার্থক্য ঘটিলেও একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নীচের তালিকা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

| | |
|---|---|
| খাদ্য শস্য | ১৪ আউন্স |
| ডাল | ৩ ,, |
| শাকসবজি ( পাতা ) | ৪ ,, |
| শাকসবজি ( মূল ) | ৩ ,, |
| অন্যান্য | ৩ ,, |
| ফল | ৩ ,, |
| দুধ | ১০ ,, |
| চিনি ও গুড় | ২ ,, |
| মাছ মাংস | ৩ ,, |
| ডিম | ১টি |

## G5 ·7 অসার খাদ্য

ঠিক খাদ্যরূপে ব্যবহৃত না হইলেও সুষম খাদ্যের সহিত কিছু পরিমাণ অসার অংশ থাকা উচিত। ফলের তন্তু, তরকারির সেলুলোজ ও অন্যান্য খাদ্যশস্যে এই অসার অংশ কিছু পরিমাণে থাকে। প্রচলিত ছড়ায় বলা হয়, 'দুধে বাড়ায় বল আর শাকে বাড়ায় মল'। এই অসার অংশ জীর্ণ না হইলেও এই অসার অংশ পাকস্থলী ও অন্ত্রে উদ্দীপনা জাগায় ও অন্যান্য খাদ্য জীর্ণ করিতে সাহায্য করে। মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ইহা কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ দূর করে।

## G5 ·8 খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা (food misconceptions)

ভারতবর্ষের লোকদের খাদ্য সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও সংস্কার আছে। অনেকে মনে করেন ডিম দুষ্পাচ্য কিন্তু ডাল সহজপাচ্য। অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ডিম হজম হইতে দুই ঘণ্টা ও ডাল হজম হইতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে শাক কেবল মলবৃদ্ধি করে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাকসবজিতে নানারূপ ভিটামিন আছে। ঘৃত অপেক্ষা মাখন শ্রেষ্ঠ, মাংস অপেক্ষা মাছ সহজপাচ্য একথাও অনেকে স্বীকার করেন না। অনেকে আবার পেটভরতি করিয়া খাওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু উহা যে হজমের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা জানেন না। খাদ্য সম্বন্ধে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খাদ্য সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি মানিয়া চলা কর্তব্য।

## প্রশ্নাবলী

1. মানব-দেহরূপী যন্ত্রটির সচল কলকব্জাগুলি সম্বন্ধে যাহা জান তাহা সংক্ষেপে লিখ।
2. শরীরের হাড়ের কাঠামো কেমন করিয়া দেহের বিভিন্ন কার্যকলাপে সাহায্য করে বর্ণনা কর।
3. মানব-দেহে কত রকমের পেশী পাওয়া যায়? পেশীর কাজ কি?
4. আমাদের দেহে যে যন্ত্রটি ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টি সাধন করে সেই যন্ত্রটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ।
5. আমাদের দেহে জারকের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা হইয়াছে তাহা ব্যক্ত কর।
6. দেহের সবচেয়ে শক্ত যে তন্ত্রটি তাহা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য লিখ।
7. জিহ্বার কাজ কি কি?
8. বৃক্ক ছাড়া মানব-দেহে আর কি কি রেচন তন্ত্রের উপকরণ আছে?
9. দেহের কোন্ যন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্র বলা চলে যুক্তি দ্বারা বুঝাও।
10. চেতনা আদান-প্রদানের কাজ স্নায়ুকোষে কেমন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়?
11. আজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় বলিতে কি কি তন্ত্র বুঝ? তাহাদের যে কোন একটির কাজ বর্ণনা কর।
12. কত রকমের খাদ্য মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাহা লিখ?
13. 'খাদ্যপ্রাণ' মানুষের প্রাণ বাঁচাইতে কিভাবে অপরিহার্য তাহা বর্ণনা কর।
14. খাদ্যের শক্তি-মূল্য বলিতে যাহা বুঝ তাহা লিখ।
15. সুষম খাদ্য ও অসার খাদ্য সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য লিখ।

# শুদ্ধিপত্র

1. ১১৩ পৃষ্ঠা, Fig. 2—

   ... অক্সিজেন অণু মিলিয়া...এই জায়গায়

   ... অক্সিজেন পরমাণু মিলিয়া...পড়িতে হইবে।

2. ১১৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় লাইন—

   ...হাইড্রোজেন (H) অণু ... এই জায়গায়

   ...হাইড্রোজেন (H) পরমাণু ... পড়িতে হইবে।

   তৃতীয় লাইন

   অক্সিজেন অণু... ... এই জায়গায়

   অক্সিজেন পরমাণু... ... পড়িতে হইবে।

   চতুর্থ লাইন—

   দুইটি H অণুর ... ... এই জায়গায়

   দুইটি H পরমাণু মিলিত হইয়া একটি H অণুর ... পড়িতে হইবে।